বাঙালীজীবনে বিদ্যাসাগর

সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার

এম. এ. (ডবল), পি-এইচ. ডি.

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৬৭
নভেম্বর ১৯৬০

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬নং শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

শিক্ষাগুরু

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু—

বাঙালীজীবনে বিদ্যাসাগর

নিবেদন

শতবর্ষের অধিক সময় ধ'রে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মসাধনা নিয়ে যতো আলোচনা এবং স্তুতিগান হয়েছে, তার অধিকাংশই বিদ্যাসাগর চরিত্রের অনন্যসুলভ দয়া, মায়া, পরোপকারেচ্ছা প্রভৃতি সদ্‌গুণকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েছে এবং বিদ্যাসাগরকে অলৌকিক এক মায়াবরণে আবৃত ক'রে অনুকরণ ও অনুসরণের অতীত কল্পলোকের অধিবাসী ক'রে তুলেছে।

এই গতানুগতিক বিদ্যাসাগর-বন্দনার বিরুদ্ধতা ক'রে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর জীবন ও কর্মসাধনার যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চারটি প্রবন্ধে ধৃত সেই অসাধারণ মূল্যায়ন কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা বন্দনার রাহুমুক্ত করেনি, উত্তরকালের মানুষদের পক্ষে বিদ্যাসাগর-উপলব্ধির জন্যে অজস্র সহস্রবিধ উপকরণও সঞ্চিত ক'রে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সেই উপকরণ থেকে আহৃত সূত্রাবলীর অনুসরণে বর্তমান গ্রন্থে বাঙালীর সমাজ-জীবনে ও সাহিত্যসাধনায় বিদ্যাসাগরের অনপনেয় প্রভাবের অস্তিত্ব অন্বেষণ ক'রে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ-গ্রন্থে তাই বিদ্যাসাগর যদি উপাস্য হন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্ত্রদ্রষ্টা। সেই মন্ত্র উচ্চারণে যেমন বিদ্যাসাগর-বন্দনা করা হয়েছে, তেমনি মন্ত্র দ্রষ্টার চরণেও পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরকে উপলব্ধির জন্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনা দান করেছেন, সেই চেতনার প্রকাশের উপযোগী ভাষাও দিয়েছেন; আমাদের বিদ্যাসাগর-বন্দনায় তাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও একাকার হ'য়ে গিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার প্রণাম নিবেদন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বিদ্যাসাগর-অধ্যাপনা কালে আমার অন্তরে তিনিই প্রথম বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কৌতূহল ও প্রশ্নচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ এতোকাল পরে এই গ্রন্থের আবির্ভাব। গুরুঋণ অপরিশোধ্য, তাই ঋণ শোধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। একজন অকৃতি ছাত্রের অকিঞ্চিৎকর এই প্রয়াস গুরুর অমেয় করুণা লাভের তুচ্ছ গুরুদক্ষিণামাত্র! তাঁর উপযুক্ত ছাত্র হবার যোগ্যতা আমার নেই জানি, কিন্তু তাঁর অকৃপণ উদার হস্ত থেকে পাওয়া জ্ঞানরাজ্যের রত্নরাজিই আমার জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ, তা যেন কোনদিন বিস্মৃত না হই, আমার এই একমাত্র কামনা।

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে আলোচনা কালে নানা জনের কাছ থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি। তা যেমন অপরিমেয় তেমনি অমূল্যও বটে। এ ব্যাপারে

প্রথমেই আমার অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয় সহকর্মী অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করি। তিনিই আমার পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক, সমালোচক এবং দিকনির্দেশকও বটেন। আমার সর্ববিধ রচনাকর্মের সঙ্গে তাঁর সস্নেহ সতর্কতা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করা যায় না।

অধ্যাপক ভবতোষ রায় নানা প্রসঙ্গে আমাকে নানাভাবে যে সাহায্য করেছেন, তা তুলনাহীন। অধ্যাপক মদনমোহন কুমার, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ সুজিতকুমার সরকারের ঋণও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নির্দেশিকা প্রস্তুতকালে আমার কন্যা কল্যানীয়া শমিতা তার সীমায়িত সামর্থ্য নিয়ে যেভাবে আমার সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, তাতে আমি যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেছি। নানাবিধ বিরূপতা, বিরুদ্ধতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও সর্ববিধ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে যিনি আমার এই গ্রন্থ রচনার অবকাশ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম এখানে অনুল্লেখ্য থাকলেও গ্রন্থের সর্বত্রই তাঁর কল্যাণ হস্তের সৌরভ ছড়িয়ে আছে।

প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষ আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। অতি অল্প সময়ে যে রকম দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে তাঁর গ্রন্থটিকে শোভন ও সুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন, তা অভাবনীয়। যে কয়টি মুদ্রণ প্রমাদ র'য়ে গেল, তা সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিকে সামান্য পীড়া দিলেও বক্তব্য উপলব্ধিতে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কেবলমাত্র ১৭ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রে 'অর্ধশতাধিক'কে 'সার্ধশতাধিক' ব'লে গ্রহণ করলে গ্রন্থকার বাধিত হবে।

বিদ্যাসাগরের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বত্রই 'মণ্ডল বুক হাউস' প্রকাশিত, দেবকুমার বসু সম্পাদিত এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা সম্বলিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'র অনুসরণ করা হয়েছে এবং 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ব'লে গ্রন্থের সর্বত্রই সেই সংস্করণটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বর্তমানে এইটিই 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'র প্রামাণিক সংস্করণ। অলমিতি বিস্তরেণ,

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার

সূচী

বিদ্যাসাগর

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবতীদেবী

স্যার জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বীঠন

এক

'বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক'

১

আধুনিক বাঙালীজাতি তার শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, ধর্মচেতনা ও সাহিত্য-সাধনায়, মননশীলতা ও সর্ববিধ সচেতনতায় গত শতাব্দীর যে-সব মহাপুরুষের উত্তরাধিকার আজও বহন ক'রে চলেছে, বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে প্রধানতম। প্রাচীন সংস্কার আর গতানুগতিকতার ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম ক'রে মৌলিক চিন্তাধারা আর অজ্ঞাতপূর্ব কর্মসাধনার প্রেরণায় বাঙালীজীবনের নবদিগন্তে বিদ্যাসাগর যে নবীন সূর্যোদয়ের সূচনা করেছিলেন, শতাব্দীপাদের কালসীমা অতিক্রম ক'রে আজ তা মধ্যাহ্ন-সূর্যের উজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু সাধারণ বাঙালীজীবনে বিদ্যাসাগরের যে রূপ আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে তা হোল তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন অগাধ পণ্ডিত অশেষ গুণান্বিত বিদ্যাসাগরের এক করুণাঘন রূপ। বিদ্যাসাগর হলেন দয়ার সাগর—করুণাসাগর, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দুঃখে তিনি কাতর, জনজীবনে দারিদ্র্যবেদনার উপস্থিতিমাত্রেই তিনি আকুল, প্রখর আত্মসম্মানবোধের তিনি মূর্ত প্রতীক, মাতৃভক্তির তিনি জলন্ত দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তে সুপ্রচলিত অসংখ্য গল্প-কাহিনী আজ কিংবদন্তীর সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু দয়া, মায়া, পরোপকারেচ্ছা প্রভৃতি মহৎ গুণ নিয়ে যে-বিদ্যাসাগর সেদিনের বাঙালীসমাজের ওপর ছত্রচ্ছায়া মেলে ধরেছিলেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তর্হিত হ'য়ে গেছেন; আর তাঁর সর্ববিধ মহানুভবতাকে কৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে যে-বাঙালীসমাজ বিষামৃতে তাঁর জীবনপাত্রকে পূর্ণ করে তুলেছিল, সেও আজ অতীত ইতিহাসের মূক সাক্ষীমাত্র। কিন্তু বর্তমান বাঙালীজাতির প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই চোখে পড়ে তার সর্ববিধ কর্মচেতনা ও মননসাধনায় বিদ্যাসাগর আজও প্রত্যক্ষ প্রেরণার অনন্ত উৎস হ'য়ে বিরাজিত রয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ব ইতিহাসের প্রাচীন সামগ্রীতে পরিণত হননি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ জীবিত ছিলেন।' জন্ম-মৃত্যুর ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে পরিব্যাপ্ত তাঁর যে জীবন-কাহিনী, তা কেবল পঞ্চভূতাত্মক মানবদেহকে আশ্রয় ক'রেই গড়ে ওঠেনি,

তার মধ্যে তাঁর মননজীবনই ছিল প্রধান আর 'এই মননজীবনই তাঁহার মুখ্য জীবন ছিল।' তাই বিদ্যাসাগরের চিরন্তনত্ব তাঁর মহানুভবত্বে নয়, তাঁর পরোপচিকীর্ষায় নয়, তাঁর দয়া, মায়া, করুণা কোন গুণেই নয়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। এই পৌরুষদীপ্ত অক্ষয় মনুষ্যত্বটিই তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত আধুনিক চেতনারূপে বাঙালীজীবনে দান ক'রে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই আধুনিকতার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তাঁর দেশের লোক যে-যুগে বদ্ধ হ'য়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ, সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে-গঙ্গা ম'রে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে স'রে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।'[১]

আধুনিক ছিলেন ব'লেই সকল যুগের সমকালীনতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ছিল প্রচণ্ড বিরোধ। একটি ক্ষুদ্র কালসীমার বাঁধাধরা চৌহদ্দির মধ্যে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ ঘটিয়েই সমকালীনতা বিশাল কাল সমুদ্রে বিলীন হ'য়ে যায়, ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া পরবর্তিকালে তার আর কোন প্রয়োজনই থাকে না। এই সমকালীনতাকেই রবীন্দ্রনাথ স্রোতহীন মরাগঙ্গার ডোবায় পরিণতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু আধুনিকতা হোল বহমান গঙ্গা, সমুদ্রের সঙ্গে চিরন্তন যোগসূত্র ধ'রে সে অনন্তকাল ব'য়ে চলে। যুগের দাবীকে সে অস্বীকার করে না, কিন্তু সমকালীনতা যেখানে যুগের বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এবং সমাজের বিশেষ অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আধুনিকতা সেখানে যুগের লক্ষণ বহন ক'রেও যুগান্তরের ইঙ্গিতবাহী, বিশেষ যুগের মানসিকতায় গঠিত বিশেষ কতকগুলি দাবী পূরণ ক'রেও তাই তা নিঃশেষ হ'য়ে যায় না, চিরন্তনত্বের অনন্ত প্রবাহধারার অফুরন্ত উৎসের স্বগোত্রীয় হ'য়ে ওঠে। আধুনিকতারূপী চিরবহমান এই কালগঙ্গার সঙ্গে যোগ ছিল ব'লেই বিদ্যাসাগর যুগের দাবী মিটিয়েও যুগাতীত, সমকালীনতার সীমা ডিঙ্গিয়ে চিরকালীন।

---

১ 'বিদ্যাসাগর', চারিত্রপূজা

এই চিরকালীনতার জন্যে বিদ্যাসাগরকে কিন্তু আজীবন খেসারত দিতে হয়েছিল। আধুনিকতাকে রবীন্দ্রনাথ 'বহমান কালগঙ্গা' বলেছেন, এই বহমান কালগঙ্গার একদিকে আছে অফুরন্ত গঙ্গোত্রী আর অপরদিকে আছে অসীম সমুদ্র। সমুদ্রের আহ্বানেই হিমালয়ের সুদুর্গম গুহাগহ্বর থেকে গঙ্গার অভিসার যাত্রা। উৎস তার হিমালয় হ'লেও পরম পরিণতি সমুদ্রে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাংলাদেশের মনীষীরা প্রায় সকলেই যখন জীবনপথের অন্বেষণে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মরূপী গঙ্গোত্রীর দুর্গম হিমশৈলের প্রকৃতি নির্ণয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তখন একমাত্র বিদ্যাসাগরই উৎসমুখের প্রয়োজনীয়তা নত মস্তকে স্বীকার ক'রে নিয়েও ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মানবতাবাদী কাল-সমুদ্রের দিকে আমাদের জীবনপ্রবাহকে প্রবাহিত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। তাই আপনার কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন নিঃসঙ্গ, স্বজনহীন, সম্পূর্ণ একক। কিন্তু এই একাকীত্ব তাঁর কর্মে কোনোদিন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি ; বাধা যে ছিলনা তা নয়, বাধা ছিল পদে পদে, কিন্তু 'এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল,'[১] তাই সে বাধা তিনি মানবসমাজের বিরুদ্ধতাজাত ব'লে স্বীকার করেননি, নিজের নিঃসঙ্গতাজনিত ব'লে গ্রহণ ক'রে তিনি 'সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মতো তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা করিয়া জীবনরণরঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন।'[২] বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় এই চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সে যুগের কয়েকজন কৃতবিদ্য ও মনীষী ব্যক্তির চরিত্র ও কর্ম প্রয়াসের তুলনা করলে তার মহিমা আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে।

২

রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ রায় সে যুগের একজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাপন্ন পুরুষ ছিলেন। রামমোহনের সংস্কার সাধনার উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও কিছু কিছু সংস্কার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এদেশের কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে, ধর্ম ও পরলোকের নামে জঘন্য বহুবিবাহ-প্রথার যে সীমাহীন প্রসার জাতির জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছিল, রমাপ্রসাদ রায় তার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ক'রে সমাজ থেকে এই বিষবৃক্ষের মূল উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর

১ বিদ্যাসাগর-চরিত, চারিত্রপূজা।

২ 'বিদ্যাসাগর-চরিত', চারিত্রপূজা।

তাঁর বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তকে রমাপ্রসাদের সেই প্রয়াসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।[১] কিন্তু সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে রামমোহনের পুত্র হিসেবে তাঁর কাছে যে উদ্যম প্রত্যাশিত ছিল, তিনি তা পূর্ণ করতে পারেননি। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরকে নানাভাবে উৎসাহিত করলেও কর্ম-ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি কোন সহায়তা করতে সাহস করেননি। এ-সম্বন্ধে 'সঞ্জীবনী'-তে প্রকাশিত একটি সংবাদের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে 'তখন কলিকাতার অনেক বড় লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এ বিবাহের পূর্বে তিনি সাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন,—"আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম ?" এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।" এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।'[২]

এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে প্রচলিত ভিন্ন প্রতিবেদনেও রমাপ্রসাদ রায়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অনীহার পরিচয় পাওয়া যায়,

'এতৎসম্পর্কে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রকৃতি' নামক সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়া-ছিলেন,—তিনি (রমাপ্রসাদ) বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, আমার পিতা সমাজসংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতে তো কোন ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা। এই বলিয়া বিধবা-বিবাহের সভায় যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন।'[৩]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রমাপ্রসাদের সাক্ষাৎকারের এই সংবাদের যে-প্রতি-বেদনটিই সত্য হোক না কেন, রামমোহন-পুত্রের পক্ষে তার কোনটিই গৌরব-

১ 'লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে, যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে, অশেষ প্রকারে, যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।'

২ বিহারীলাল সরকার—'বিদ্যাসাগর', চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৪

৩ বিহারীলাল সরকার 'বিদ্যাসাগর,' চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৫

জনক নয়। প্রকৃতপক্ষে, রমাপ্রসাদ রামমোহনের সামাজিক ও বৈষয়িক উত্তরাধিকার লাভ করলেও তাঁর কর্মপ্রেরণা ও সংস্কার সাধনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে পারেননি। সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরই ছিলেন রামমোহনের যথার্থ উত্তরসাধক। তাই তিনি ঘৃণার সঙ্গে রমাপ্রসাদের গোপন সাহায্য ও প্রকাশ্য নিরপেক্ষতার দু'মুখো নীতির প্রতিবাদ ক'রে রামমোহনের প্রতিকৃতি ফেলে দিতে বলেছিলেন। অকুতোভয়, মহাতেজস্বী সেই পুরুষসিংহের প্রতিকৃতির সম্মুখে গোপনে সাহায্য ক'রে প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ থাকার কথা ব'লে রমাপ্রসাদ তাঁর অবমাননাই করেছিলেন। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় মতটিতে দেখি, রমাপ্রসাদ রামমোহনের সর্ববিধ কর্মপ্রয়াসকে আরও খোলাখুলিভাবে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। রামমোহনের সংস্কারপ্রয়াস সেযুগে তাৎক্ষণিক অভ্যর্থনা পায়নি, তাই রমাপ্রসাদ সমাজসংস্কারে আবার নতুন ক'রে প্রয়াস চালানোর যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। কিন্তু সমকালীন যুগ ও সমাজের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানই যে সর্বকালের সর্বদেশের মহামানবচরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, একথা রমাপ্রসাদ না বুঝলেও বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ঈশ্বর যে দুঃসাধ্যসাধনার দৌত্যে নিয়োগ ক'রে মহাপুরুষদের পৃথিবীতে পাঠান, সেই দৌত্য স্বীকার ক'রেই তাঁরা যথার্থ সম্মানের অধিকারী হন। বাইরের অগৌরব ও অসম্মান সেই কাজের গৌরব প্রকাশ ক'রে তাঁদের, অবমাননা নয়, পুরস্কারই দান করে।

রমাপ্রসাদ ওকালতী ক'রে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি স্বোপার্জিত বাইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যান। রামমোহনও দরিদ্র ছিলেন না, কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে যে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উত্তর পুরুষদের জন্যে রেখে যান, অর্থ দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না, তার পারমার্থিক গৌরবে যুগযুগ ধরে জাতি গৌরবান্বিত হ'য়ে থাকবে। পিতাপুত্রের চরিত্রে এই বৈসাদৃশ্য দেখেই সেযুগের জনসমাজে একটা কথা বহুল প্রচার লাভ করেছিল যে, রামমোহনের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় হ'লে ভালো হোতা[১]

বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কিন্তু সব সময় অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনীর সভা'র মুখপাত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে পরিচিতির সূত্রেই বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'পত্রিকা'র সংস্পর্শে এসেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়

প্রকাশিতব্য রচনার গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্যে দেবেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে যে 'পেপার কমিটি' তৈরি করেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তার একজন প্রভাবশালী সদস্য। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ধর্মপ্রচারের মূল উদ্দেশ্যকে গৌণ ক'রে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লোকহিতকর নানা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে সুরু করেছিল। ফলে, শিক্ষাবিস্তার, স্বাজাত্যবোধ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নানা ব্যাপারের ওপর নানাজনের সুচিন্তিত যুক্তি-পূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ ক'রে এই পত্রিকা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে নব জাগরণে একটি প্রধান প্রেরণাস্থল হ'য়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ধর্মীয় দিকটি অপেক্ষা তার এই সামাজিক দিকটির জন্যেই তার প্রতি সে-যুগের শিক্ষিত সমাজ অধিকতর আকর্ষণ বোধ করতে সুরু করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ব্রাহ্ম সদস্যদের মধ্যে তাই নানারকম প্রশ্ন দেখা দিতে লাগলো। ভাববাদী সাধক দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী পণ্ডিত অক্ষয় কুমারের পদে পদে সংঘর্ষ সুরু হলো। দেবেন্দ্রনাথের কাছে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'পত্রিকা' তখনও ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশমাত্র হ'য়ে থাকলেও বহু সদস্য কিন্তু তখন সভার সামাজিক তাৎপর্যের জন্যেই গৌরব বোধ করতেন এবং 'পত্রিকা'তেও সেই তাৎপর্যের প্রতিফলন আশা করতেন। তাই তাঁদের কাছে তখন 'ব্রাহ্মসমাজ' অপেক্ষা 'তত্ত্ববোধিনী সভা' অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র এবং 'পত্রিকা'র পেপার কমিটির সঙ্গে তখন দেবেন্দ্রনাথের প্রায়ই মত-বিরোধ দেখা দিতে লাগলো। দেবেন্দ্রনাথের প্রধান প্রতিপক্ষ অক্ষয়কুমার এবং তাঁর অনুগামীরা ভোটের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে লাগলেন, সংস্কৃতভাষায় রচিত দেবেন্দ্রনাথের উপাসনাপদ্ধতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন সুরু করলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হ'লেও বিদ্যাসাগর এই ধরনের কোন তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে চাননি। তিনি কেবল বহুলপ্রচারিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা প্রচারের ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন। সংস্কারকামী ব্রাহ্মরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজের রীতি-নীতিকে কলুষমুক্ত ক'রে যথার্থ শাস্ত্রীয় বিধির ওপর স্থাপনের জন্যে আন্দোলন করলেও বিদ্যাসাগরের প্রতিপাদ্য বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, তার মানবিক দিকটির দ্বারাও বিচলিত হলেন না। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'য় ধর্মতত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা বিধবা-বিবাহের সপক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াস প্রাধান্য লাভ করায় তাই তাঁরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। দেবেন্দ্রনাথও

তাঁর অসন্তোষ গোপন করলেন না। ভেতরে ভেতরে অসন্তুষ্টির আবহাওয়া যখন এমনিভাবে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, তখন রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতার প্রকাশকে কেন্দ্র ক'রে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটলো। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পেপার কমিটি' রাজনারায়ণের বক্তৃতাটি প্রকাশযোগ্য ব'লে সম্মতি না দেওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। তাঁরই অর্থে পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'পত্রিকা' তাঁরই বিরুদ্ধমতের অনুসরণ করবে, তা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিতেই তাঁর সেই মনোভাব প্রকাশিতই হ'তে দেখি, 'এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এপদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'[১]

দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মগোপনতা' তাঁর অনুগামীদের কাছে উপকথায় পৌঁছে গেলেও এই পত্রাংশে দেখি, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র 'পেপার কমিটি'র ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবে উত্তেজিত হ'য়ে তিনি আপনার কর্তৃত্ববোধকেই যেন প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। এই অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের পক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'পত্রিকাকে' কেন্দ্র ক'রে কাজ করা আর সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগর তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক, তিনি সে-পদ ত্যাগ ক'রে সরে এলেন। দেবেন্দ্রনাথও সেই সভা তুলে দিয়ে তার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধে বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক বক্তব্যের প্রধানতম সমর্থক ছিলেন অক্ষয়কুমার। দেবেন্দ্রনাথের অধীনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করলেও অক্ষয়কুমার নিজের স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবাদী জ্ঞানৈষণাকে কোনদিনই অন্যের আজ্ঞাবহ ক'রে তুলতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধতো তাই পদে পদে। চাকরীর নিরাপত্তার জন্যে তিনি নত মস্তকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের প্রাধান্যকে স্বীকার ক'রে নেননি। তাই বিদ্যাসাগর যখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের, বিশেষ করে, বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করছিলেন, যূথপতি দেবেন্দ্রনাথের বিরূপতাকে অগ্রাহ্য ক'রে সম্পাদক

অক্ষয়কুমার তখন তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন নিঃশঙ্কচিত্তে।

কিন্তু এহেন অক্ষয়কুমারের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের মানসিকতার পার্থক্য ছিল দুস্তর। কারণ, অক্ষয়কুমার মূলত ছিলেন যুক্তিবাদী মননশীল পণ্ডিত আর বিদ্যাসাগর প্রধানত ছিলেন বাস্তববাদী মানবমুখীন সমাজসংস্কারক ও জাতি-সংগঠক। মানবীয় জ্ঞানের চরমোৎকর্ষের স্বরূপ আবিষ্কারই ছিল অক্ষয়কুমারের সাধনা আর সর্ববিধ জ্ঞানচেতনা ও চিন্তার মূল মানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন। অক্ষয়কুমারের আবেদন ছিল তাই প্রধানত বুদ্ধির কাছে, আর বিদ্যাসাগরের আবেদন ছিল হৃদয়ের দ্বারে। তাই অক্ষয়কুমার নির্মোহ যুক্তির পথে অনাবিল সত্যের স্বরূপ আবিষ্কার ক'রেই ক্ষান্ত, কিন্তু মানবজীবনে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নানাবিধ কর্মপ্রণালীর আবিষ্কার প্রয়াসে বিদ্যাসাগর নিরলস। যে-শাস্ত্রে কোন বিশ্বাস নেই, নিজ মত প্রতিষ্ঠায় তার সাহায্য নিতে অক্ষয়কুমারের ছিল তীব্র আপত্তি, কিন্তু শাস্ত্রের ওপর আস্থা না থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে নিজ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার জন্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্বিচারে শাস্ত্র সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতী। তাই অক্ষয়কুমারের রচনায় যেখানে তীক্ষ্ণ মননের যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল, বিদ্যাসাগরের রচনায় সেখানে বিস্তৃত কর্ম-প্রণালীর পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। বালক অক্ষয়কুমার ছোটবেলায় লেখার বায়না ধরেছিলেন, তারই সূত্র ধ'রে সারাজীবন তিনি শুধু লিখেই গেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে লেখাটা এসেছিল প্রয়োজন সিদ্ধির পরোক্ষ উপায় হিসেবে। অন্য কোনভাবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লে তিনি কলম ধরতেন কিনা সন্দেহ।

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের বিচিত্র সম্পর্কটিই বাংলাদেশে লোকমুখে প্রচারিত বিদ্যাসাগর-উপকথার উজ্জ্বলতম অধ্যায়। বিদ্যাসাগরের প্রতি মধুসূদন চিরদিনই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিরূপতায় অন্য অনেকের প্রশংসা তাঁর কাছে ম্লান হ'য়ে গিয়েছিল। 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' বিদ্যাসাগরের ভালো লাগেনি শুনে তিনি দুঃখ ক'রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,

'The new poem is doing well, considering everything. I have heard that V. has been speaking of it with contempt.'

কাব্যটি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা তাঁকে আনন্দ উদ্বেল ক'রে তুলেছিল,

'You will be pleased to hear that the Pandits are coming

round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it.'

মধুসূদন যে কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের মতামতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তা নয়, সমাজক্ষেত্রে লক্ষ বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে অকুতোভয় বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যম দেখে মুক্তবুদ্ধি মধুসূদনের কবিহৃদয় শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে পড়েছিল। রাজনারায়ণকেই লেখা আর একটি চিঠিতে তাঁর সেই মনোভাবের প্রকাশ দেখি,

'I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-Remarriage.'

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে চতুর্দিক থেকে আক্ষিপ্ত সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও নির্ভীক ও উন্নতহৃদয় বিদ্যাসাগরকে সবলে মস্তক উন্নত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মধুসূদন তাঁর মধ্যে পৌরাণিক দেবোপম মহাপুরুষের গগনস্পর্শী মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। বিদ্যাসাগরকে তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' উৎসর্গের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি সেই কথাই লিখেছিলেন রাজনারায়ণকে,

'I have dedicated the work to our great friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you, I look upon him in many respects as the first man among us.'

এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অতল বিশ্বাসের সম্মিলনে মধুকবির মানসে বিদ্যাসাগরের যে রূপ গ'ড়ে উঠেছিল, তা কোন একটি দেশের একটি মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না কোনদিন। চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের কাছে আবেদন ক'রে পাঠানোর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন,

'.. the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.'

কিন্তু মধুসূদনের বেহিসেবী বিলাসিতা এবং অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়িতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের দানশৌণ্ডিকতা প্রমাণ করার অর্থ এবং মন না থাকাতে চরিত্রের এতো গুণ নিয়েও বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে বাঁচাতে পারেননি। তাই আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত মধুসূদনের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে বিদ্যাসাগর তাঁকে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন,

'তোমার আর আশা ভরসা নাই। আর কেহই অথবা আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। তালি দিয়া আর চলিবে না।'

তালি দিয়ে সত্যিই আর চলেনি। অপ্রতিরোধ্য পতনের পূর্বে অবশ্যম্ভাবী বিদ্যাসাগর-বিচ্ছেদকে ভগ্নমনোরথ কবি কোনক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি।

৩

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহপাঠী এবং অভিন্নহৃদয় সুহৃদ। তাঁরা কেবল এক সঙ্গে পড়াশুনাই করেননি, চিন্তা ও কর্মজগতেও প্রায় একইভাবে ভাবিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সর্ববিধ সংস্কার-প্রয়াসে মদনমোহনের কেবল অকুণ্ঠ সমর্থনই ছিল না, ছিল সক্রিয় সহযোগিতাও। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের আন্দোলনে হিন্দু কলেজের ইংরেজীশিক্ষিত ছাত্রদের পাশে দু'জনেই একসঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় দু'জনেই সেই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন,—মদনমোহন দেশবাসীকে 'স্ত্রীশিক্ষা'-র প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন আর বিদ্যাসাগর সেই স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বড়ো বাধা 'বাল্যবিবাহের দোষ'-এর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। দু'জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সম্পূর্ণ আধুনিক চিন্তাধারা-প্রসূত পরম উদার সমাজচেতনা ও শিক্ষাচিন্তার পরিচয় প্রকাশ ক'রে প্রবন্ধ দু'ঠি সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনে যথেষ্ট বেগ সঞ্চারিত করেছিল। বীঠন সাহেবের স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার প্রচেষ্টায় দুই বন্ধুই সেই মহাপ্রাণ বিদেশীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন,—বিদ্যাসাগর তাঁর স্কুলের সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করেছেন আর অবৈতনিক শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহন প্রথম পাঠার্থী বালিকাদের জন্যে শিশুচিত্তের পক্ষে পরম আকর্ষণীয় ক'রে তাঁর বর্ণবোধক গ্রন্থমালা, 'শিশুশিক্ষা'-র তিনটি ভাগ রচনা করেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রী বহনকারী গাড়ির দু'পাশে বিদ্যাসাগর "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" ব'লে মনুসংহিতার শ্লোক উৎকর্ণ ক'রে দিয়েছেন, আর, মদনমোহন সেই শাস্ত্রবাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যেই তাঁর দুই কন্যাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এতো ক'রেও দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদের অকাল পরিণতি ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। এই বিচ্ছেদের কথায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'ক্রমে ক্রমে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে।'[১] কিন্তু কি কারণে তাঁকে এতোবড়ো একটা সিদ্ধান্ত

১ 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস'

গ্রহণ করতে হ'ল, তা তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি। জানা থাকা সত্ত্বেও আচার্য কৃষ্ণকমলও সে-কথা প্রকাশ ক'রতে চাননি,

'মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে ; * * * এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।'[১]

বিদ্যাসাগর-মদনমোহনের মনোমালিন্যের কারণ জানা না গেলেও একথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, তাঁদের চরিত্রের বিরাট বৈপরীত্যের মধ্যেই তার মূল প্রোথিত ছিল। মানবপ্রেম ও সর্বসংস্কারমুক্ত বিপ্লবী প্রতিভায় মদনমোহন বিদ্যাসাগর অপেক্ষা কম ছিলেন না। কিন্তু যে বিরাট পৌরুষ ও বিপুল কর্মোদ্যম সেই মানবাভিমুখী বিপ্লবী-চেতনাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তা পুরোপুরি বর্তমান ছিল এবং মদনমোহনের চরিত্রে তা সামান্যতমও ছিল না। তাঁদের চরিত্রের এই পার্থক্যের সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছিলেন,

'বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান জমিন প্রভেদ। যাহাকে back-bone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কিনা সন্দেহ।'[২]

বিদ্যাসাগরের বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হ'য়ে মদনমোহন শ্যামাচরণ দে-কে লিখেছিলেন, 'আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি।'[৩] এই চিঠিতে, বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত কর্মোদ্দীপনা ও প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে তাল না রাখতে পেরে পিছিয়ে পড়া মদনমোহনের করুণ আর্তনাদই যেন প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো তারানাথ তর্কবাচস্পতিও, প্রাচীন পণ্ডিত হ'য়েও, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তাঁর সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বয়সে বড়ো তারানাথ সংস্কৃত কলেজে তাঁর অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়ন করলেও অসাধারণ মেধার জন্যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট

হন। তারানাথ ছিলেন বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি বিষয়-বুদ্ধিতেও অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারানাথের প্রতি বিদ্যাসাগরের যেমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক পদ গ্রহণের অনুরোধ এলে নিজে সে পদ গ্রহণ না ক'রে বিদ্যাসাগর তারানাথের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কেবলমাত্র তাই নয়। ষাট মাইল পথ পায়ে হেঁটে কালনা গিয়ে তারানাথের প্রশংসাপত্রাদি এনে তাঁর নিয়োগের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কার-আন্দোলনে তারানাথেরও সক্রিয় সহায়তা ছিল। যে-কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তারানাথ ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয় ও উচ্চকণ্ঠ। 'পরাশর-সংহিতা'র বিধবা-বিবাহবিধি তাঁকে এতোদূর প্রভাবিত করেছিল যে, সেই শাস্ত্রীয় বিধিপালনে প্রাচীনপন্থী সমাজের ভ্রূকুটিকে তিনি বিদ্যাসাগরের মতোই সমান দৃপ্ততার সঙ্গে অগ্রাহ্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণের বিধবা-বিবাহকালে বিদ্যাসাগবের আত্মীয়-পরিজন বিবাহানুষ্ঠান বর্জন করলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে এনে নবদম্পতিতে বরণ ক'রে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শাস্ত্রীয় বিধিপালনে যথেষ্ট দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিলেও মুক্তবুদ্ধি আধুনিক চেতনার বিচারে তারানাথ বিদ্যাসাগরের পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেননি। অত্যন্ত তেজস্বী, দৃঢ়চেতা মহাপণ্ডিত হ'লেও তারানাথ প্রাচীন শাস্ত্রের বিধিনিষেধের গণ্ডী কোনদিনই অতিক্রম করতে পারেননি। শাস্ত্রবাক্যকে তিনি মানবতাবোধের বহু ঊর্ধ্বেই স্থান দিতেন। তাই বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হবার পর শাস্ত্রবিধি পালনের জন্যেই তিনি বিদ্যাসাগরের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। সামাজিক প্রয়োজনবোধ বা নারীজাতির প্রতি করুণার দ্বারা তিনি কোনদিনই পরিচালিত হননি, প্রাণহীন শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের স্থানে তাঁর মনে কোনদিন মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি।

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রয়াসে তাঁর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা তারানাথের পক্ষে তাই বেশিদিন সম্ভব হয়নি, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মানসিকতার পার্থক্য পরবর্তী পদক্ষেপেই তাঁদের মধ্যে মতের ও মনেরও পার্থক্য ঘটিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের কাছে শাস্ত্র ছিল উপলক্ষ মাত্র, তিনি শাস্ত্রের প্রভাবে অন্যায়ের বেদনায় বিক্ষুব্ধ হননি, অন্যায়ের মূল উৎপাটনের জন্যে তিনি আকস্মিকভাবে

পাওয়া শাস্ত্রবাক্যের সাহায্য অস্বীকার করেননি মাত্র। কিন্তু তাই বলে তিনি শাস্ত্রকেই প্রধান ব'লে কোনদিনই গ্রহণ করেননি। অথচ তারানাথের কাছে শাস্ত্রের চেয়ে কিছুই বড়ো ছিল না। নিজের তীক্ষ্ণ সচেতন মননের ফলে মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করতে পারলেও শাস্ত্র-প্রাণ তারানাথ শাস্ত্র অপেক্ষা তাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই বহুবিবাহ-প্রথা হিন্দুসমাজকে চরম দুর্গতির আবর্তে নিক্ষেপ করেছে এবং অবিলম্বে এই কদর্য প্রথার অবসান না হ'লে হিন্দুধর্মের চরম দুর্দিন এড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব হবে না ব'লে উপলব্ধি করলেও বহুবিবাহ-ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত নবতর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে স্বীকার করতে পারেননি, উপরন্তু বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তাকেই সপ্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তারানাথের পক্ষে এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না; কারণ অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর হৃদয়ে জীবনবোধের কোন দীপশিখা জ্বালিয়ে দিতে পারেনি, সারাজীবন বিদ্যার কঠিন বোঝা বহন ক'রে গেলেও তিনি জীবনের স্বরূপ কোনদিনই উপলব্ধি করতে পারেননি। বিদ্যা তাঁকে পাণ্ডিত্য দান করলেও জীবন রসের সন্ধান দিতে পারেনি, তাই মানুষের প্রয়োজনের দিক থেকে শাস্ত্রকে বিচার না ক'রে তিনি মানুষকেই শাস্ত্রীয় প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করেছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিত বংশের প্রাচীন ঐতিহ্যলালিত দুই ব্রাহ্মণ সন্তান তারানাথ ও বিদ্যাসাগর, প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রাচীন বিদ্যারই অনুশীলন করেছিলেন। এই প্রাচীন বিদ্যা বিদ্যা-সাগরের সামনে বর্তমান বিদ্যাজগতের সোপানশ্রেণী আলোকিত ক'রে তুললেও তারানাথকে নিক্ষেপ করেছিল প্রাচীনত্বের বদ্ধদ্বার কারাগৃহে। বিদ্যাসাগরকে যে বিদ্যা চলমান কালপ্রবাহের চিরন্তন ধারার সঙ্গে যুক্ত করেছিল, সেই বিদ্যাই আবার তারানাথকে নিস্তরঙ্গ ডোবার মতো বিশেষ স্থানে ও কালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তাই বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সম্বন্ধে বিদ্যা-সাগরের বক্তব্য যেখানে দুর্বার প্রাণের চিরন্তন বন্দনাগীতি হ'য়ে উঠেছে, তারানাথের পাতি সেখানে, অন্ধ কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর মর্মন্তুদ আর্তনাদে পরিণত হয়েছে।

৪

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে সমকালীন সমাজজীবনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বৈবভাবে উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হবার ইচ্ছায়। ধর্মজগতের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কোন ঔৎসুক্য

ছিল না, ধর্মবিষয়ক কোন আলোচনাতেই তিনি কখনও অংশ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসার ও সমাজসংস্কারের মাধ্যমে তিনি যে জীবন-যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, বিশুদ্ধভাবে ধর্মজগতের অধিবাসী হ'লেও, রামকৃষ্ণদেব তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, বিধাতার কৃপা এবং বিধাতায় ভক্তি না থাকলে তাঁর মতো মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয় না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন শুনে রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে ঈশ্বরানুগৃহীত সেই মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বহিঃচিহ্নধারী সন্ন্যাসী নন শুনে বিদ্যাসাগরও তাঁকে তাঁর বাড়িতে আনতে বলেন।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার তাঁদের বাকচাতুর্যের অপূর্ব নিদর্শন হ'য়ে আছে। বিদ্যাসাগরকে দেখে রামকৃষ্ণদেব বললেন,—'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি।' বিদ্যাসাগর সহাস্যে উত্তর দিলেন,—'তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান'। রামকৃষ্ণদেবও কম যান না, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলেন,—'না গো! নোনাজল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর তুমি ক্ষীর সমুদ্র!' এরপর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের ধর্মবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, আলোচনা অর্থে রামকৃষ্ণদেব বক্তা আর বিদ্যাসাগর শ্রোতা। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, সে আলোচনার সূত্রে নিজের ধর্মজীবন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর কোন আভাসই দেননি, এমন-কি কোন প্রশ্নও উত্থাপন করেননি। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু তাতে সামান্যতমও ক্ষুণ্ণ হননি, কারণ বিদ্যাসাগরকে তিনি ধর্মবিষয়ে স্বমতে আনতে আসেননি, অথবা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মচেতনাবিহীন তাঁর কর্মপ্রেরণায় ধর্মজ্ঞান সঞ্চার করতে চাননি; তাঁকে কেন্দ্র ক'রে যে মহান পুরুষের অনন্ত লালা তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলেছে, তিনি তাঁর সান্নিধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করতে এসেছিলেন। প্রসন্নমনেই তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি রাসমণির বাগান দেখতে যাওয়ার জন্যে বিদ্যাসাগরকে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে বেড়াতে যাওয়াও তাঁর আর হ'য়ে ওঠেনি। রামকৃষ্ণদেব তার জন্যে মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেও দুঃখিত হননি। তিনি বুঝেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যক্তিগত কল্যাণ ও মুক্তির

শিক্ষার মাধ্যমে নবীন এক জাতি সৃষ্টির মহান ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে-কথা প্রকাশ ক'রে তিনি বলেওছিলেন 'বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ, আমার মতো কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে পাছে তাঁর বিদ্যাদান কর্ম উচ্ছেদ হয়, তাই আপন কল্যাণমুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন।' নিজের মত ও পথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন ও সাধনার বৈপরীত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েও তাঁর মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে সে-যুগে রামকৃষ্ণদেবের মতো আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ!

৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর রত্নপ্রসবিনী বাংলাদেশের মনীষীমণ্ডলীর সঙ্গে নানা সূত্রে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ ঘটলেও, কারো সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল না ব'লে, নিজের হৃদয় খুলে ধরার মতো সমধর্মা সহৃদয় মিত্র তাঁর কেউ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরচিত্তের এই নিঃসঙ্গতার কারণ বিশ্লেষণ করেই লিখেছিলেন, 'এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।'[১]

এই নির্বাসিত নিঃসঙ্গ মানুষটি গতশতাব্দীর বাঙালীজীবনের উতরোল রঙ্গশালায় জনারণ্যের নির্জনতার মধ্যে ব'সে স্থির প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে যে সত্য দর্শন করেছিলেন এবং বাঙালীজীবনে যে সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছিলেন, আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ তাকেই আধুনিকতা নামে অভিহিত করেছেন। এই আধুনিকতা বহিরঙ্গীয় বেশবাসের উৎকট পরিবর্তনকে আশ্রয় ক'রে আবির্ভূত হয়নি, কারণ বিদ্যাসাগরের পোষাক পরিচ্ছদে 'একটি অটল সরলতা' ছিল। সরলতা আমাদের দেশের মানুষের পোষাক পরিচ্ছদের সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু সেই সাধারণের মধ্যেও বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাই আধুনিকদের সঙ্গে যেমন তাঁর মিল ছিল না, প্রাচীনদের সঙ্গেও তেমনি তাঁর বিরোধ ছিল। এখানেই বিদ্যাসাগরের বিশিষ্টতা, রবীন্দ্রনাথ এই বিশিষ্টতাকেই তাঁর 'অনন্যতন্ত্রতা' বলেছেন। এই 'অনন্যতন্ত্রতা' কেবল পোষাক পরিচ্ছদেই নয়, অন্তরের দিক থেকে বিচারেও এর সমান তীব্রতা, সমান দীপ্তি। বাইরের দিকে এই 'অনন্যতন্ত্রতা' যেমন নিছক প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ডের স্বল্পতাটুকু

গ্রহণ ক'রে অতিরিক্তের আড়ম্বরকে বর্জন করেছিল, অন্তরের দিকেও যে বস্তুকে গ্রহণ ক'রে সর্ববিধ ভাবকল্পনার বিলাসবৈচিত্র্যকে তা দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, তা হ'ল তাঁর সমুন্নত মনুষ্যত্ববোধ। এই মনুষ্যত্ববোধই তাঁর চরিত্রের প্রধান মাহাত্ম্য ছিল এবং এই মাহাত্ম্যগুণেই তিনি চারদিকের ক্ষুদ্রতার মাঝখানে অভ্রভেদী গিরিশিখরের মতো আপন মস্তক অনন্তকালের প্রেক্ষাপটে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর এই ঊর্ধ্বচারী মনুষ্যমহিমার কাছে তাঁর কীর্তিসমূহও ম্লান হ'য়ে গেছে, অথচ সেই কীর্তিকাহিনীর ম্লানিমা তাঁকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করতে পারেনি। তাই মনে হয় সর্ববস্তু ও সর্ববিষয়ের অনিত্যতার মধ্যে কীর্তিমানই জীবিত থাকেন ব'লে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ বিদ্যাসাগরে এসে যেন মিথ্যা হ'য়ে গেছে। কারণ, কীর্তির আলোকে আজ আর বিদ্যাসাগরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাঁর অনন্যতন্ত্র মনুষ্যমহিমাই আজ তার কীর্তিকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এই মনুষ্যত্ববোধের মোহনীয়তাই বিদ্যাসাগরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তাই সেই মনুষ্যত্ববোধের প্রকৃতি ও স্বরূপ সন্ধান কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ই নয়, বাঙালীজীবনের জাতীয় চেতনার আদি প্রবাহের উৎস সন্ধানও বটে।

দুই

'অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য'

১

রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালীর অর্ধশতাধিক বৎসরের জাতীয় ইতিহাসের মনীষিবৃন্দের প্রায় সকলকেই আমরা আজ মনুষ্যজীবন থেকে নির্বাসিত ক'রে দেবত্বে উন্নীত ক'রে ফেলেছি। কিন্তু সেই প্রয়াসে একমাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন বিদ্যাসাগর। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মতো কোন বৈশিষ্ট্যই তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের সুদীর্ঘ কর্ম-তালিকায় সংযোজিত করেননি। তিনি আমাদেরই মতো মানুষ ছিলেন এবং আমাদের মধ্যে সহজলভ্য স্বাভাবিক মানবীয় বৃত্তিগুলিকেই তাঁর সর্ববিধ কর্মের প্রেরণাস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু তবু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাঙালীচরিত্রের দুস্তর পার্থক্য আজ আর গভীর চিন্তাভাবনা বা গবেষণার অপেক্ষা রাখে না; 'বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা'[১] যে, তাঁকে কোনক্রমেই স্বজাতীয় ব'লে মনে হয় না। অধিকন্তু, 'এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়'[২] এবং মনে একটা সবিস্ময় প্রশ্ন জাগে, 'মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দু-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।'[৩]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীচরিত্রের পার্থক্যের প্রধান কারণ হোল যে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনে মানুষ যথার্থ মানুষ হ'য়ে ওঠে, সাধারণ বাঙালীচরিত্রে যেগুলির একান্ত অসদ্ভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে সেগুলির কেবলমাত্র প্রবলতর উপস্থিতিই ছিল না, গভীরতর উপলব্ধি এবং নিবিড়তর পরিচর্যার

১ রামেন্দ্রসুন্দর—'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', চরিত-কথা
২ রামেন্দ্রসুন্দর—'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,' চরিত-কথা
৩ রবীন্দ্রনাথ,—'বিদ্যাসাগর চরিত,' চারিত্র পূজা

মাধ্যমে উজ্জ্বলতর প্রকাশও ঘটেছিল। অষ্টমবর্ষীয় বালক পিতার সঙ্গে কলকাতা আসার হাঁটাপথে মাইল ষ্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখেছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষার পরীক্ষাও হয়েছিল পথ চলতে চলতেই। একটি মাইল ষ্টোন দেখতে না দিয়ে পরবর্তী মাইল ষ্টোনটি দেখিয়ে পিতা ঠাকুরদাস ইংরেজি সংখ্যাটি জানতে চাইলে বালক বিদ্যাসাগর সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন, 'বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।' অতি স্বল্পায়াসে, স্বল্পসময়ে, পথচলার ক্লান্তির মধ্যেও ইংরেজি সংখ্যা শেখা অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটনাটির মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিভার পরিচয় যতোটা প্রকাশিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। পথের পাশের মাইল ষ্টোন, তাতে লেখা ইংরেজি সংখ্যা, সাধারণ গ্রাম্য বালকের একটা ভয় ও বিস্ময় মেশা শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে অতি সহজেই পঙ্গু ক'রে দেয়; সেই মাইল ষ্টোনের লেখা সংখ্যার সত্যাসত্যবিচার তার কল্পনাতেই আসে না। কিন্তু প্রাথমিক পরিচয়ের ভয় ও বিস্ময় বালক বিদ্যাসাগরের আত্মবিশ্বাসকে কখনই ঢেকে দিতে পারেনি, তাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি সংখ্যাটির ভুল নির্দেশ ক'রে বাবাকে উত্তর দিয়েছিলেন, 'এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে'।

এই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থেকেই বিদ্যাসাগরচরিত্রে গভীর আত্মসম্মানবোধের সূচনা হয়েছিল। নিজের ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল ব'লেই নিতান্ত বালক ব'লে গুরু জয়গোপাল যখন তাঁর কাব্যপাঠের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর আত্মসম্মানবোধ আহত হয়েছিল, পরীক্ষা না দিয়ে তিনি কিছুতেই সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ করতে চাইলেন না। এই আত্মসম্মান-বোধের কাছে গুরুকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বাধ্য হয়েই জয়-গোপাল তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন, আশ্চর্য হয়েছিলেন তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে আর ভালোবেসেছিলেন তাঁর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পেয়ে। সংস্কৃত কলেজেই তিনি যখন ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনবছরের ব্যাকরণের পরীক্ষায় প্রতিবারই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, কেবল একবার তাঁর ফল মনের মতো হয়নি। তার জন্যে তিনি নিজে অবশ্য দায়ী ছিলেন না। এক সাহেব পরীক্ষক তাঁর কথা ঠিক মতো বুঝতে না পেরে তাঁকে কম নম্বর দেন। অকারণে কম নম্বর পেয়ে বালক বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানে এমন আঘাত লেগেছিল যে, তিনি সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। অনেকের

অনুরোধে সে চিন্তা থেকে বিরত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তখনই অনেকে এই বালকের চরিত্রের এই প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনের এইসব ঘটনা যাঁদের জানা ছিল তাঁরা তাঁর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকালে হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের টেবিলের ওপর পা তুলে কথা বলার সমুচিত প্রত্যুত্তরে বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য হননি। সেদিন ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে ভারতবাসীমাত্রেই যেখানে ইংরেজের কাছে কৃপার পাত্র ছিল, তখনও কোন ইংরেজই বিদ্যাসাগরকে কৃপা করার সুযোগ পায়নি। কার সাহেবের অসৌজন্যমূলক ব্যবহার তিনি যেমন সহ্য করেননি, তেমনি ব্যালাণ্টাইন সাহেবের অতিপণ্ডিতসুলভ পিঠ চাপড়ানো ব্যবহারেরও তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতবাসী সম্বন্ধে ইংরেজদের যে একটা তুচ্ছতার মনোভাব ছিল, বিদ্যাসাগরও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেও শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁকে কোনদিন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি, তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার মিলনে নতুন যে শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে চালু করেছিলেন, তাই তার সম্বন্ধে মতামত দেবার জন্যেই বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালাণ্টাইনকে শিক্ষাবিভাগ আমন্ত্রণ জানালেন। বিদ্যাসাগরের যোগ্যতা অস্বীকার করতে না পারলেও শিক্ষাবিভাগের মতে ডঃ ব্যালাণ্টাইনই ছিলেন 'the most learned Sanscrit scholar in India'; তাই, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হবার জন্যে তাঁদের কাছে ডঃ ব্যালাণ্টাইনের সার্টিফিকেটের দাম ছিল অনেক বেশি। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাভিজ্ঞ এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সম্মিলন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে সমান্তরালভাবে জ্ঞান আহরণ ক'রে তাদের পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনাকেই তিনি উভয় বিদ্যার মিলন ব'লে মনে করতেন। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার আহরণে মনুষ্যত্বের উজ্জীবনকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে বিদ্যাসাগর মনে করতেন। নিজের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধের তীব্রতায় বিদ্যাসাগর ডঃ ব্যালাণ্টাইনের মত গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধেই তীব্র সন্দেহ প্রকাশ করলেন। জাতীয় অধীনতা বিদ্যাসাগরের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, পাশ্চাত্য মত বা চিন্তা মাত্রেই স্বদেশীয় মত বা চিন্তা অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ

ব'লে মনে করার একটি বিজিত মনোভাব আজও যেখানে ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, শতবর্ষ পূর্বে বিদ্যাসাগর তার আশ্চর্য ব্যতিক্রমরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আত্মসম্মানবোধের তীব্রতায় বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য চিন্তা মাত্রকেই নির্বিচারে শ্রেষ্ঠ ব'লে যেমন গ্রহণ করতে পারেননি, তেমনি সেই পরাজিত মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদরূপে নিজেকে তুলে না ধ'রেও পারেননি। তাঁর অশন-বসনের কৃচ্ছ্রতা দ্বারাই স্বদেশবাসীর অকারণ পাশ্চাত্যানুকরণের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ ক'রে তিনি তাঁর দেশানুরাগেরই পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আত্মবিশ্বাস একদিকে যেমন আত্মসম্মানবোধের তীব্রতায় প্রকাশলাভ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি আত্মাভিমানের প্রচণ্ডতায় বারবার তাঁর চতুষ্পার্শকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এই আত্মাভিমানবোধই নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই তীব্র জেদের রূপে তাঁর চরিত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিল। পরিহাসপ্রিয় পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তাঁর প্রথম পৌত্রটির জন্মকালে একটি এঁড়েবাছুরের জন্ম হয়েছে ব'লে ঠাট্টা করেছিলেন। পুত্রের প্রচণ্ড জেদে বিভ্রান্ত হ'য়ে পিতা ঠাকুরদাস প্রায়ই তাঁর ক্রান্তদর্শী পিতার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করতেন। কিন্তু পুত্রকে কিছুতেই বশে আনতে পারতেন না। শেষে কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হতেন। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তাঁকে জলে ডুব দিতে বারণ করতেন, উদ্দেশ্য ছিল সে যেন জলে ডুব দেয়। তেমনি ময়লা কাপড় ছাড়াতে হ'লে তিনি তাকে ময়লা কাপড় ছাড়তে বারণ করতেন। উত্তর জীবনে এই জেদের সঙ্গে স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি যুক্ত হ'য়ে তাঁর সর্ববিধ কর্মপ্রেরণার মধ্যে যেমন গতি দান করেছিল, তেমনি তাঁকে অভ্রান্ত লক্ষ্য অভিমুখেও পরিচালিত করেছিল। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রচলিত প্রথার তীব্র নিন্দা করায় তাঁকে যতোটা সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বাধার পাহাড় ঠেলতে হয়েছিল বিধবা-বিবাহের মতো একটি অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়কে প্রচলিত প্রথায় পরিণত করতে গিয়ে। বাধা যতো তীব্র হ'য়ে উঠেছিল, তাঁর জেদও ততো বেড়ে উঠেছিল। তীব্র জেদের বশেই বিধবা-বিবাহের জন্যে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ নন ব'লেও ঘোষণা করেছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে লেঃগভর্নর হ্যালিডের ব্যক্তিগত উৎসাহে কাজে নেমে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি অসাধ্যসাধন ক'রে ফেলেছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপনে সংখ্যাগতসাফল্য অপেক্ষা কলকাতা শহরের বাইরে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটা সচেতনতা সৃষ্টি ক'রে তিনি লক্ষ বিদ্যালয় স্থাপনের অপেক্ষা বেশি কাজ করেছিলেন। কিন্তু বিদেশি সরকার যখন তাঁর সর্বাধিক প্রয়াসকে আর্থিক দায়-দায়িত্বের দিক থেকে বিচার ক'রে নস্যাৎ ক'রে দিলেন, তখন সেই সরকারের অধীনে চাকরি ক'রে তিনি নিজের কর্মচেতনার অবমাননা করেননি। প্রচণ্ড আত্মাভিমানী বিদ্যাসাগর কর্মের মধ্যেই আত্মপ্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন ব'লে কর্মের অবমাননাকে আত্মারই অপমান ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় বার এই চাকরি ছাড়ার মতো প্রথমবার চাকরি ছাড়ার কারণও ছিল তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত প্রাপ্তি। গভীর চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি নতুন শিক্ষাবিধি প্রণয়ন করলেও রসময় দত্তের ষড়যন্ত্রে তা যখন অগ্রাহ্য হ'য়ে গেল, কপর্দকহীন বিদ্যাসাগর তখন তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সহকারী সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করলেন। অন্যদের কাছে রসময় দত্ত প্রশ্ন করেছিলেন চাকরি ছাড়লে বিদ্যাসাগরের অন্নসংস্থান কেমন ক'রে হবে! তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর আলু পটল বেচে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করবেন ব'লে উত্তর দিয়েছিলেন।

আত্মাভিমানের তীব্রতা থেকেই বিদ্যাসাগরের চরিত্রে অনন্যসুলভ আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ ঘটেছিল। দেশের লোক সামান্য বিদ্যা অর্জন ক'রেই অপ্রয়োজনেও বিদেশী পোষাকের প্রতি আকৃষ্ট হোত, তারই প্রতিবাদে তিনি একটি বস্ত্রের অর্ধখণ্ড পরিধান ক'রে অপর অর্ধাংশ উত্তরীয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই পোষাকেই গভর্নর জেনারেলের প্রাসাদ থেকে দীন দরিদ্রের কুটিরে পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে গমনাগমন করতেন। প্রাচীনপন্থীদের অবজ্ঞা ও আধুনিকদের ঔদাসীন্যে তাঁর এই আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ বার-বার ক্লিষ্ট হয়েছিল ব'লেই তিনি পথের ধার থেকে কলেরা রোগীকে নিজের স্কন্ধে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন, শ্রমবিমুখ আধুনিক বাবুর মালপত্র কুলির মতো বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই আত্মবিশ্বাস আর আত্মসম্মানবোধ, আত্মাভিমান আর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হ'লেও বিদ্যাসাগর চরিত্রের একটি মূল চেতনা থেকেই তাদের উদ্ভব হয়েছিল। সেই মূল চেতনাটিকেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের 'অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য' ব'লে বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন, এই চারিত্রিক গুণেই তিনি,

'পল্লী-আচারের ক্ষমতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া

একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়েছিলেন।'[১] তাই,

'বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন। তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।'[২]

২

বিদ্যাসাগর যথার্থ মানুষ ছিলেন ব'লে, তাঁর চরিত্রে 'অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য' ঘটেছিল ব'লে এবং নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন ব'লে তাঁর চরিত্রে দৈবনির্ভরতা, ঈশ্বরানুগ্রহ অথবা অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার কোন উকৎট প্রকাশ ছিল না। নিতান্ত বাল্যকাল-থেকেই তাঁর চরিত্রে অতিবাস্তব মনুষ্যচেতনার প্রকাশে তথাকথিত অলৌকিক ধর্ম-চেতনা অবহেলিত হয়েছিল। বাল্যকালে নবীন ব্রাহ্মণত্ব লাভের পর বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ সন্তানের অবশ্য কর্তব্য 'সন্ধ্যা' সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শ্রুতিধর যে বালক একবার দেখেই ইংরেজি সংখ্যা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলেন, কলেজের নিয়মিত শিক্ষালাভের আগেই নিজের মেধাবলে অলঙ্কারশাস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন তার পক্ষে 'সন্ধ্যা' ভুলে যাওয়া অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়। মেধার অভাবে নয়, একটি আকর্ষণহীন ঔদাসীন্যের জন্যেই তিনি 'সন্ধ্যা' ভুলেছিলেন। অথচ প্রথানুযায়ী সন্ধ্যাবন্দনা না করা ছিল অশোভন, তাই ভুলে গেলেও তিনি সন্ধ্যার ভান করতেন।

কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ছাত্রদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন। একবার তেমনি এক সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত ছাত্র বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত শ্লোকে সরস্বতী বন্দনা করতে বলেন। বিদ্যাসাগর একটি অভিনব পদ্ধতিতে সরস্বতী বন্দনা ক'রে লেখেন,

১ 'বিদ্যাসাগর-চরিত,' চারিত্রপূজা

২ তদেব

লুচী কচুরী মোতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরচিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥

সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সরস্বতী-বন্দনা রচনায় গুরু জয়গোপাল অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে সকলকে ডেকে নিজে কবিতাটি পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট উপভোগ্য হ'লেও কবিতাটির মধ্যে ধর্মভাবের লেশ মাত্রও প্রকাশিত হয়নি। অথচ তেরো চৌদ্দ বছর বয়সের বালক ছাত্রের কাছে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর প্রতি একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান যুগেও প্রত্যাশিত। কিন্তু সে-যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান সেই বালকের কাছে সরস্বতীর দৈবমহিমা অপেক্ষা তাঁর পূজাকে উপলক্ষ ক'রে আয়োজিত খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যই পরম আকর্ষণীয় ব'লে বোধ হয়েছিল। তাই মনে হয়, নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই ধর্মসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের একটা সহজাত ঔদাসীন্যবোধ ছিল। যে প্রতিমা পূজাকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালী হিন্দুর ধর্ম সাধনার প্রধান প্রকাশ, সেই প্রতিমা পূজার প্রতি বিদ্যাসাগরের কোন আন্তরিক আকর্ষণ ছিল না। দেবদেবীর প্রতি হিন্দুদের যে ভক্তি, বাল্যকাল থেকেই সেই ভক্তি তিনি মাতা-পিতার প্রতিই সমর্পণ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কাল্পনিক দেবতার মৃন্ময় মূর্তি অপেক্ষা মাতা-পিতাকেই সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্যে একবার কাশী গেলে সেখানকার বাঙালী ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে দেবতার নাম ক'রে প্রচুর অর্থ দাবী করেন। তাঁদের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বনাথ মানেন না?' অম্লানবদনে বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।' হতবাক ব্রাহ্মণের দল তখন পরম বিস্ময়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তবে আপনি কি মানেন?' বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার পিতৃদেব ও জননীদেবীই আমার প্রত্যক্ষ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা।' পিতামাতার পুণ্য সান্নিধ্যধন্য বিদ্যাসাগরকে কেন যে কোন কাল্পনিক দেবদেবীর আরাধনা করতে হয়নি, বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতীদেবীর চিত্রবিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তা যথার্থভাবে নির্ণয় ক'রে বলেছেন,

'উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি

মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।'[১]

দেবী প্রতিমার মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, ক্ষমা প্রভৃতি যে সমস্ত লোকোত্তর গুণের একত্র সমাবেশ কল্পনা করা হয়, বিদ্যাসাগরের সৌভাগ্যক্রমে সেইসব গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মাতৃদেবীর মধ্যে। এইসব চরিত্রগুণ সেই মহীয়সী মানবীর মুখমণ্ডলে যে স্বর্গীয় জ্যোতির আভা এনে দিয়েছিল, চিত্রকরের তুলিকায় বিধৃত চিত্রপটেও তার দীপ্তি সামান্যতমও ম্লান হয়নি।

কেবলমাত্র মাকে দেখেই নয়, মায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশও দেবারাধনা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে উদাসীন ক'রে তুলেছিল। তিনি একবার মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ছয় সাত শো টাকা খরচ ক'রে বছরে একবার পূজা করা ভালো না, ঐ টাকায় গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদের মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য দান করা ভালো। দ্বিধামাত্র না ক'রে ভগবতী দেবী উত্তর করে-ছিলেন, গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোকের প্রত্যেকদিন ভাত জুটলে পূজা করার কোন আবশ্যকতা নাই। এই মনস্বিনী মহীয়সী নারী নারায়ণের পূজার্চনা অপেক্ষা নরের সেবাকেই মহোত্তম কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন। দেবতার প্রতি কোন বিদ্বেষে নয়, কিন্তু নরের প্রতি তীব্র আকর্ষণে তাঁর হৃদয়ে দেবতার আসন অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। অনন্যা এই মাতৃদেবীর কাছ থেকে জন্মসূত্রেই বিদ্যাসাগর এই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন। তাই নারায়ণের সেবার্চনায় বন্ধ্যা সময়ের ক্লান্তিকরতাকে দূরে সরিয়ে রেখে নরের কল্যাণকামনাতেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন।

দেবারাধনার মতো প্রচলিত আচারধর্মের প্রতিও বিদ্যাসাগরের একটা তীব্র অনীহা ছিল। দীক্ষা দান ও দীক্ষা গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেননি, তাই পূজনীয়া পিতামহীর শত অনুরোধেও তিনি কোনদিন দীক্ষা গ্রহণে সম্মত হননি, এ-বিষয়ে তাঁর পিতার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রগ্রহণে আপত্তি করলেও বিদ্যাসাগর প্রাত্যহিক জীবনাচরণে অযথা বিদ্রোহের প্রশ্রয় দেননি। ইয়ংবেঙ্গলদের মতো মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণের দ্বারা তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মকে পরিশ্রুত ক'রে তোলারও চেষ্টা করেননি। বরং

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত' চারিত্র পূজা

সংসার জীবনে বহুপ্রচলিত, সর্বজন-আচরিত নীতিনিয়ম ও সদাচারশৃঙ্খলাকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই মেনে চলতেন। কিন্তু এই মেনে চলা তাঁকে কখনও শুচিবায়ুগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারেনি। জাতপাতের ভেদাভেদও তিনি গ্রাহ্য করতেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে তাঁর বাল্যস্মৃতির একটি বিবরণ দিয়েছেন,

"একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়েমহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে, 'ওমা এমন তো কখনও শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে।' কেউ বলিল,—ঘোর কলি! কেউ বলিল,—সব একাকার হ'য়ে যাবে, কেউ বলিল,—জাতধম্ম আর থাকবে না! আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কে কেড়ে খেয়েছে?' মা বলিলেন,—জানিস নি? বিদ্যেসাগর।"[১]

চিঠিপত্র লেখার সময় বিদ্যাসাগর তৎকালীন প্রথানুযায়ী চিঠির শীর্ষদেশে দেবদেবীর নাম ব্যবহার করতেন। একবার তিনি কোন বন্ধুর বাড়িতে ব'সে একটি চিঠি লিখছিলেন। লেখা শেষ হ'লে বন্ধু যখন চিঠিটি দেখতে চাইলেন তখন হেসে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তুমি যা ভাবছো তা নয়, এই দেখ শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ লিখেছি।' ঘটনাটির উল্লেখ ক'রে জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছেন,

'তিনি যে কারণে চটিজুতা পায়ে দিতেন, থানধুতি, মোটা চাদর পরিতেন, ভট্টাচার্যের মত মাথা কামাইতেন, সেই কারণেই পত্রের শিরোভাগে ঐরূপ লিখিতেন। ইহাকে হয়তো তিনি বাঙালীর জাতীয়ত্বের একটা অঙ্গ মনে করিতেন।'[২]

ধর্মাচার যেখানে জাতীয়ত্বের প্রকাশক, বিদ্যাসাগর সেখানে তার নিষ্ঠাবান অনুগামী; কিন্তু যেখানে তা মনুষ্যধর্মবিরোধী, সেখানে তিনি তার বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহী।

প্রাত্যহিক জীবনাচরণে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অথবা ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে ঐতিহ্যগত বিধিবিধানের প্রতি বিদ্যাসাগরের কোন বিদ্বেষ না থাকলেও ডামা-ডোল সহযোগে ধর্মপ্রচারকে তিনি কোনদিন পছন্দ করেননি। তাঁর অতি প্রিয় পাত্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলে তিনি তাই খুসী হ'তে

১ 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ', হরপ্রসাদ রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার
২ বিদ্যাসাগর, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৪০

পারেননি। ধর্মের প্রচার ব্যবস্থায় যে বণিক মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশিত হয় তা তাঁর কাছে বিভীষিকা ব'লে বোধ হোত। তিনি মনে করতেন প্রচারক বা উপদেষ্টা হ'লে মানুষের স্বাভাবিকতা নষ্ট হ'য়ে যায়। কারণ যে ধর্মের প্রচার বা যে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়, তার প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ স্পষ্ট কোন ধারণা দান করতে পারেননি। পৃথিবীর প্রারম্ভ-কাল থেকে ধর্ম নিয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে তর্ক সুরু হয়েছে এবং তার কবে যে শেষ হবে কোন মহাপুরুষই সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেননি। মহাভারতে বকরূপী ধর্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের মাধ্যমে বেদব্যাস সেই কথাই বলেছিলেন। বিভিন্ন বেদের মত বিভিন্ন, স্মৃতিগুলির বক্তব্যেও কোন মিল নাই, এমন কোন মুনি নাই যিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন-নি। কোন অতল অন্ধ গুহায় যে ধর্মের তত্ত্ব নিহিত আছে, তা' কেউ জানে না। এই অবস্থায় কোনো তত্ত্বালোচনায় প্রবেশ না ক'রে মহাজ্ঞানী মহা-জনদের পথই অনুসরণ করা উচিত। মহাভারতোক্ত এই আর্যবাণী কিন্তু মানুষ কোনদিনই অনুসরণ করেনি। তাই মীমাংসাতীত ধর্মতত্ত্ব নিয়ে মানুষ যুগে যুগে চিন্তা করেছে এবং একটা উপসংহারে পৌছানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু একের পরিণতির সঙ্গে অন্যের পরিণতির পার্থক্য কোনদিন বিদূরিত হয়নি। এই পার্থক্যের ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে নিজের মত ঠিক এবং অন্যের মত ভুল ব'লে মনে ক'রে এসেছে। এই মনোভাব মতান্তরের সৃষ্টি করেছে। মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়েছে, অবশেষে ধর্মচিন্তার পরিণতি ঘটেছে পরমত-বিদ্বেষে ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায়। ধর্মের তত্ত্বপ্রচারকে তাই বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। প্রচারমাত্র সার ধর্মের কোন তত্ত্ব নেই, তা সাম্প্রদায়ি-কতাসৃষ্টির বিষবাষ্প মাত্র। তাই বিদ্যাসাগর বলতেন, 'ধর্মকর্ম ওসব দলবাঁধা কাণ্ড।'

ধর্মপ্রচার বা ধর্মোপদেশ সম্বন্ধে যতোই বিরূপতা থাকুক না কেন, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে যে একটি বিশিষ্ট ধারণা ছিল তা তাঁরই বিভিন্ন উক্তিতে বার-বার প্রকাশিত হয়েছিল। কাশীর এক ভদ্রলোক তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন গঙ্গাস্নানে দেহ পবিত্র বোধ হ'লে বা শিবপূজায় হৃদয় পবিত্র হ'লে তাই ধর্ম ব'লে গৃহীত হওয়া উচিত। আবার ধর্মের ব্যাপারে দেহমনের পবিত্রতার ওপর জোর দিলেও মননধর্মের ক্ষেত্রে তিনি গীতার উপদেশ অনুসারে চলার পক্ষে মত দিতেন। প্রাত্যহিক আচারানুষ্ঠান আর মননের যুগ্ম-চেতনা বা ভাবের মাধ্যমেই মানুষের ধর্মচেতনা বিকশিত হ'য়ে ওঠে। দেহ-

মনের পবিত্রতা আনয়নকারী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতার নিষ্কাম নিস্পৃহ কর্মবাদ অনুসারে জীবনধারণ করাকেই, তাই বিদ্যাসাগরের ধর্মমত ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু ধর্মচেতনার মধ্যে ভাব বা মননের যতোই প্রাধান্য থাকুক না কেন, ধর্মমত যেখানে মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধের বিকাশের বিরোধী, সেখানে বিদ্যাসাগরও সেই ধর্মের সত্যতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদী। তাই বাল্যবিবাহের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভের স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধানকে তিনি কল্পিত মরীচিকার সঙ্গে তুলনা ক'রে তাকে অস্বীকার ক'রে যুক্তি ও বাস্তবতা-বোধের দ্বারা পরিচালিত হবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের জন্যে রচিত দীর্ঘ প্রতিবেদনেও এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। সংস্কৃত কলেজকে তিনি স্মার্ত পুরোহিত সৃষ্টির সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য থেকে তুলে এনে উদার মানবতার সিংহদ্বারে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কর্মজীবনের বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে সাংখ্য ও বেদান্তের অলীকতা সম্বন্ধে মত প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি, 'That the vedanta and sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute.' এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন রামমোহনের উত্তর সাধক। বেদান্তচর্চার প্রাণপুরুষ হ'লেও ছাত্রদের বেদান্ত শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে বিদ্যাসাগরের বহুকাল আগে রামমোহন বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, 'Nor will youths be filled to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as brother, father &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better.'

আর একটি বিশেষ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর রামমোহনকে অনুসরণ করেছিলেন। বিধবা-বিবাহবিষয়ক পুস্তিকা দুটির বাল্যবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটির মতো যুক্তি তর্কের অবতারণা না ক'রে তিনি অনেক বেশি শাস্ত্রীয় সমর্থন খুঁজেছেন। তার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে প্রচুর ব্যঙ্গ করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সে কাজের যথার্থ যুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন,

'অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু

শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল ; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্র বচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ওদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্র বচনের বাহকরূপে দেখেননি।'[১]

প্রকৃতপক্ষে, নিজের শাস্ত্রপ্রাণতা বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্যে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবিধির উল্লেখ করেননি, শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ ছাড়া দেশের লোক তাঁর বক্তব্য গ্রহণে অপারগ ছিল, তাই নিতান্ত- প্রয়োজনবশেই তাঁকে শাস্ত্রবিধি অন্বেষণ করতে হয়েছিল। শাস্ত্রে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন না পেলে কিন্তু তিনি আপন বক্তব্য পরিত্যাগ করতেন না, শাস্ত্রই পরিত্যাগ করতেন, কারণ, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোককে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা। শাস্ত্র বাক্যের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁর কোন বিশ্বাসও ছিল না, চিন্তাও ছিল না, আকস্মিকভাবে তিনি শাস্ত্রবাক্যে আপন বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন এবং দেশের লোকের অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য দেখে সেই আকস্মিক শাস্ত্র-সমর্থন কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন মাত্র।

শাস্ত্রবিধির সাহায্য নিয়েই শাস্ত্রের বেনামীতে প্রচলিত দেশাচারের প্রাণহীন জড়ত্বের দুর্গ আক্রমণ করার পেছনে বিদ্যাসাগরের আর একটি গভীর উদ্দেশ্য ছিল ব'লে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। নির্মোহ জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে আধুনিক মানুষ গড়ার উপযুক্ত শিক্ষাবিধি রচনা করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন প্রাচীনের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ না করলে বাঙালীজীবনে এই আধুনিকতার আবির্ভাব ঘটবে না। কারণ ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, বহুদিন পূর্বেকার এক বা একাধিক ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর অসহায়ভাবে একটা জাতিকে সমর্পণ ক'রে কখনও তাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করা যায় না। প্রাচীনের মহৎ ঐতিহ্যকে শৃঙ্খলরূপে গ্রহণ না ক'রে অগ্রগতির সহায়ক হিসেবে উপলব্ধি করতে হ'লে শাস্ত্রবাক্যকে যুক্তিহীন দৈববিধানের প্রাণহীন জড়ত্বের স্তর থেকে তুলে এনে বহমান কালগঙ্গার প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সমাজের নানা কুসংস্কারের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ ক'রে তিনি তাই দেশাচারকে অস্বীকার করার প্রেরণা জাগাতে চেয়েছিলেন। কারণ, দেশাচারকে অস্বীকার করতে পারলে যে শাস্ত্রের ছদ্মবেশে দেশাচার তার বিভীষিকার জাল বিস্তার করেছে তার প্রতি দেশের লোকের একটা নিরপেক্ষতাবোধ গ'ড়ে উঠবে। কেবলমাত্র তখনই মানুষ অতীতের শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়ে অতীতের সহজ উত্তরাধি-

১ 'বিদ্যাসাগর,' চারিত্রপূজা

কারলাভের যোগ্যতা অর্জন করবে, বুঝতে পারবে, 'অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্যে।'[১]

৩

আমাদের দেশে দেশাচার, ধর্মচেতনা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি ব'লে এগুলির মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না। দেশাচারই শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মবুদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতির বিকল্প হিসেবে একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন ক'রে মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর একটা জড়ত্বের আবরণ টেনে দিয়েছিল। বাঙালীহিন্দুর বিকৃত বিবাহ পদ্ধতিকে সংস্কার ক'রে তাই বিদ্যাসাগর যখন নারীকে যুগযুগান্তের অন্যায় বন্ধন থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে আচারের জড়দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর বিদ্রোহ শাস্ত্র ধর্ম ঈশ্বর সকল কিছুরই বিরুদ্ধতা ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল। অনেক মননশীল ব্যক্তিও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই মনোভাব থেকে বাদ পড়েননি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে বলেছিলেন,

'ঐ একরকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী। এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পার; কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন? যেটা আমার অনুভূতির সামগ্রী, সেটাকে হয়তো আমি বাহিরে present করিতে পারি না; খানিকটা represent করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। সব জিনিষই কি বাহিরে আমরা present করিতে পারি? Represent করা ছাড়া আমাদের উপায় কি আছে? তোমার বেদনা হইয়াছে, সেটা তুমি কেমন করিয়া আমার কাছে present করিবে বল দেখি? তোমার অশ্রু তাহা represent করে মাত্র। কিন্তু তোমার বেদনা তোমারই অনুভূতির সামগ্রী হইয়া রহিল; তাহার presentation হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার বেদনাকে অজ্ঞেয় বলিব?'[২]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরম আস্তিক্যবাদী ধর্মবিশ্বাসের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্মবিষয়ে বিদ্যাসাগরের তূষ্ণীভাব সহ্য করতে পারেননি, তাই পরমজ্ঞানী ও উদার প্রকৃতির আত্মভোলা মানুষটি কিছুটা যেন অধৈর্যভাবে পিতৃবয়সী ও পিতার সহকর্মী বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে কিছুটা তাচ্ছিল্য ও কিছুটা ভর্ৎসনা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন।

---

১ রবীন্দ্রনাথ—'বিদ্যাসাগর,' চারিত্রপূজা

আচার্য কৃষ্ণকমল আরও এগিয়ে গেছেন। সব জল্পনা-কল্পনার নিরসন ঘটিয়ে তিনি খুব নিশ্চিন্তভাবেই যেন বিদ্যাসাগরের ধর্ম-বিশ্বাস নির্ণয় ক'রে ফেলেছেন,

'বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয়ে লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; ***উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল; *** পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?'[১]

বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতায় কোন বৈচিত্র্য না থাকলেও সে-যুগের এই বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতা তিনি বিদ্যাসাগরের চরিত্রে কেমন ক'রে আবিষ্কার করেছেন, আচার্য কৃষ্ণকমল তাঁর মন্তব্যে সে কথা কিন্তু প্রকাশ করেননি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশজোড়া শিক্ষিতের দল যখন নাস্তিকতার ধ্বজা ব'য়ে বেড়াচ্ছেন তখন বিদ্যাসাগরও স্বাভাবিকভাবেই নাস্তিক হবেন, এই সাধারণীকরণ অতিসরলীকরণ ব'লেই লঘু এবং অবিশ্বাস্য। কারণ, সে-যুগের এমন অনেক যুগ-বৈশিষ্ট্য ছিল, যা বিদ্যাসাগরকে স্পর্শ করতে পারেনি, আবার বিদ্যাসাগরেরও এমন অনেক ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সে-যুগে কেন বর্তমান-কালেও আমরা কল্পনা করতে পারি না।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ বা কৃষ্ণকমল যাই বলুন না কেন, বিদ্যাসাগর নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কিছুই ছিলেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর মনে যে একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল তার নানা প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থের প্রথম যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য সঙ্কলিত হ'লেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা ছিল না। তাঁর অন্যতম প্রিয়পাত্র পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এর জন্যে তাঁকে অনুযোগ করলে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে'র পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বরবিষয়ক কথা থাকবে ব'লে উত্তর দিয়েছিলেন। তারই সূত্র ধ'রে পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়েছিল। এর থেকে অনেকে অনুমান করেছিলেন বিজয়-কৃষ্ণের অনুরোধেই বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সংযোজিত করেছিলেন।

১ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—পৃ. ১৩১-৩২

কিন্তু, বিজয়কৃষ্ণের অনুযোগের উত্তরে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন এবং 'বোধোদয়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি যেমনভাবে ঈশ্বর প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করেছিলেন, তা বিচার করলে বোঝা যায় সেই অনুমান যথার্থ নয়। প্রকৃত-পক্ষে, বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনের পূর্বেই 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর প্রসঙ্গ সংযোজনার ব্যাপারে তিনি মনস্থির ক'রে ফেলেছিলেন। তা না হ'লে বিজয়কৃষ্ণের অনুযোগের উত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে তাঁর মনোভাব জানাতে পারতেন না। কোন পূর্বচিন্তা না ক'রেই ঈশ্বর প্রসঙ্গের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেবলমাত্র একজন প্রিয়পাত্রের অনুরোধে শিশুপাঠ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার মতো মানুষ বিদ্যাসাগর ছিলেন না। পাঠ্য-পুস্তকগুলির নতুন নতুন সংস্করণে বিস্তারিত পাঠ-সংস্কার দেখে মনে হয় তিনি পাঠ্য-পুস্তকগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিশুপাঠোপযোগী ক'রে তোলার জন্যে সর্বদাই সচেতন ও সচেষ্ট থাকতেন। তাই 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর প্রসঙ্গ সংযোজনের অনিবার্যতা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন 'বোধোদয়ে' শিশুর যে প্রশ্নচেতনা জাগিয়ে তুলে তিনি শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন সেই প্রশ্নচেতনার অনুরোধেই 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরচেতনার অবতারণা অনিবার্য। পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের সর্ববিধ বস্তু ও বিষয়ের একটা যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর সর্বদা সমানভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। সহজবোধ্য কার্যকারণ-তত্ত্বের দ্বারা সব সময় সর্ববিধ বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না। সত্য বটে, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণতত্ত্বের উপস্থিতি বোঝা যায় না, সেখানে কার্যকারণতত্ত্বের অভাব প্রমাণিত হয় না, কার্যকারণতত্ত্বের উপস্থিতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের বা উপলব্ধির সীমাবদ্ধতাই প্রকাশিত হয়। শিশুচিত্ত কিন্তু সেই উত্তরে পরিতৃপ্ত হয় না, একটা সুনিশ্চিত বক্তব্য ছাড়া তার কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। তা-ছাড়া, বিজ্ঞানকেও মূল অন্বেষণ করতে করতে একস্থানে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়, কার্যকারণতত্ত্ব দিয়ে তারপর তার কোন পথের সন্ধান মেলে না। তখন অনুমানই তার একমাত্র আশ্রয় হয়। সেই অবস্থাতেই আপাত অজ্ঞেয়, কারণ ও যুক্তির অতীত বিষয়গুলিকেই তিনি ঈশ্বরতত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরবিষয় সন্নিবিষ্ট না হওয়াতে কয়েকটি বিষয়ে শিশুর প্রশ্নচেতনা পরিতৃপ্তির কোন উপায় ছিল না। পরবর্তী সংস্করণে সেই অভাবপূরণের পন্থা নির্ণয়ের জন্যে তিনি যখন চিন্তিত ছিলেন, তখন বিজয়কৃষ্ণের অনুযোগ তাঁর সেই চিন্তার ফল প্রকাশে সাহায্য করেছিল মাত্র, তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সংযোজনার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু 'বোধোদয়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ঈশ্বরপ্রসঙ্গ কেবলমাত্র শিশুর প্রশ্ন-চেতনার নিবৃত্তি ঘটিয়েই শেষ হ'য়ে যায়নি, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের নিজের ঈশ্বর-চেতনারও স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। কারণ, নিজে যা বিশ্বাস করতেন না, তরলমতি শিশুচিত্তে তা' দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত ক'রে দেবার মানুষ বিদ্যাসাগর ছিলেন না। 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর প্রসঙ্গের সংযোজনার বিচারে গ্রন্থে সে-বিষয়ের সন্নিবেশের অনিবার্যতা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-চেতনার প্রকৃত স্বরূপও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ওপথে না চলে এপথে চললে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হবার বা স্বর্গরাজ্য অধিকার করার অলীক বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত না হ'লেও বিদ্যাসাগর এই দুনিয়ার একজন মালিকের উপস্থিতি গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন। অবশ্য, সে বিশ্বাসের মধ্যে যেমন ধর্মতত্ত্বের জটিলতা ছিল না, তেমনি অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির অনাবশ্যক উন্মত্ততাও ছিল না। তাঁর সহজ বিশ্বাসের মতো তাঁর ঈশ্বরচেতনাও ছিল অতি স্বচ্ছ, তাই তা শিশুচিত্তের পক্ষেও ছিল অতি সহজবোধ্য। 'বোধোদয়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত ঈশ্বর প্রসঙ্গের মধ্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বোধোদয়ে'র বিভিন্ন সংস্করণে সংশোধিত হ'তে হ'তে ঈশ্বরবিষয়ক যে পাঠটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হ'য়েছে ব'লে মনে হয়,

'ঈশ্বর কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না ; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান ; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু ; তিনি সমস্ত জীবের আহার দাতা ও রক্ষাকর্তা।'[১]

নিজের কাছে অবিশ্বাস্য বা অলীক বোধ হ'লে বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এই পাঠ যে 'বোধোদয়ে' সন্নিবিষ্ট করতেন না, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাই একথা সহজেই বোঝা যায় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে নিজে বিশ্বাস করতেন ব'লেই পাঠ্যগ্রন্থের সর্বত্র তিনি ঈশ্বর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। কেবল-মাত্র তাই নয়, নবপাঠার্থী শিশুহৃদয়ে ঈশ্বর প্রীতি বা ঈশ্বরভীতি সঞ্চারের জন্য তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না,

'যদিই আমি চুরি করিয়া মানুষের হাত এড়াইতে পারি ঈশ্বরের নিকট

১ 'ঈশ্বর', বোধোদয়, ৯৬তম সংস্করণ

কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ** আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে ; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।'

['লোভসংবরণ', আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ]

ঈশ্বরের এই সর্বব্যাপ্ত অবস্থিতিই মানুষের মধ্যে সমতাবোধ বা সাম্য-চেতনার দ্যোতক হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে,

'ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে কোন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি ; এজন্য কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

['চেতনপদার্থ', বোধোদয়]

মানুষের সর্ববিধ কর্ম-প্রয়াসের পশ্চাতে ঈশ্বরের কল্যাণকামী চেতনার প্রভাব উপলব্ধির জন্যেও তাঁর উপদেশ স্মরণীয়,

'দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও।'

['মাতৃভক্তির পুরস্কার', আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ]

ঈশ্বরই যে সর্ববিধ চিন্তা ও কর্মচেতনার মূল উৎস, সে-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কোন সন্দেহ ছিল না। শিশুপাঠার্থীদেরও তিনি সেই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন,

'ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই।'

['চেতন পদার্থ' বোধোদয়]

ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা মানুষের জীবনে যে সর্বদাই একটা কল্যাণ ও মঙ্গলময় পরিণতি দান করে, 'আখ্যান মঞ্জরী'র দ্বিতীয় ভাগে 'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস' নামে একটি গল্পে বিদ্যাসাগর সেই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসের জোরে একটি অনাথ বালকের সংসারসমুদ্র উত্তরণের কাহিনীই গল্পটির বর্ণিত বিষয়বস্তু। গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় না থাকলেও বালকটির বুদ্ধিবিবেচনার অভাব ছিল না। যথাসাধ্য পরিশ্রমের মাধ্যমে সে নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে

চেষ্টা করেছিল, ঈশ্বরও তাই তাকে অনুকম্পা করেছিলেন। ব্যর্থতা তার বিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করতে পারেনি,

'এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ-বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।'

'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস' গল্পের ছেলেটির বক্তব্যেই কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরচেতনা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গৃহকোণে ব'সে ভজনপূজন সাধন আরাধনার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাননি। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে তিনি যে ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্বজগতের অজস্র সহস্রবিধ কর্মধারাতেই তাঁর অস্তিত্ব তিনি উপলব্ধি করতে চাইতেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্বজগতে মানুষই হোল সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। বিশ্ব-জীবনের কর্ম-ধারায় তাই মানুষের দায়িত্বই সর্বাধিক। ঈশ্বর মানুষকে সেই কর্মচেতনার উপযুক্ত ক'রেই সৃষ্টি করেছেন। সেই কর্ম-ধারার রূপায়ণই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অরূপ অনির্দেশ্য ঈশ্বর সেই কর্মরূপেই মানব-জীবনে প্রকাশিত হ'তে চান। তাই কর্ম ই ঈশ্বর।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের কর্মরূপী এই ঈশ্বরচেতনা কর্মবিমুখ বাক্যবিলাসী বাঙালী জাতির জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তাই তাঁর ঈশ্বরচেতনা বাঙালী-জীবনে চিরদিনই অনুপলব্ধই র'য়ে গিয়েছে; উপলব্ধির সামান্যতম প্রয়াসও লক্ষিত হয়নি। কারণ সে চেতনা উপলব্ধি করতে হ'লে যে পৌরুষ, যে চরিত্রবল ও যে দৃঢ়তার প্রয়োজন, বাঙালী জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারো মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটেনি; অথচ সহস্র প্রয়াসেও বিদ্যাসাগরের সেই কর্মচেতনাকে অস্বীকার করা যায়নি। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব তাই বাঙালীজীবনে কেবল বিরাট একটা বিস্ময়েরই সৃষ্টি করেনি, জাতীয় জীবনে বিরাট এক সঙ্কটেরও সৃষ্টি করেছিল। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারলাভের প্রয়াসে, বিদ্যাসাগরের কর্মচৈতন্য এবং আমাদের অকর্মণ্যতা ও কর্মবিমুখতার মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার ইচ্ছায় আমরা সামগ্রিকভাবে বিদ্যাসাগর-জীবনটিকেই অলৌকিকতা দিয়ে ঢেকে দিতে চেয়েছি। কারণ, বিদ্যাসাগরকে আমাদের মতো মানুষ হিসেবে গ্রহণ করলে তাঁর কর্মপ্রয়াসও আমাদের কাছে অনুসরণীয় হ'য়ে ওঠে, অথচ তা অনুসরণ করা আমাদের যোগ্যতার অতীত। তাই বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস আমাদের অননুসরণীয় ব'লে প্রমাণ করার জন্যেই তাঁর জীবনটিকে অলৌকিক ক'রে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস বিদ্যাসাগরকেও যেমন তাঁর প্রাপ্য

সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে, তেমনি আমাদের মনুষ্যত্ববিকাশের সম্ভাবনাটিও বিনষ্ট করেছে।

বিদ্যাসাগর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' গ্রন্থে, বিদ্যাসাগরের জন্মের পিছনে এক অলৌকিক ও ঐশ্বরিক ক্রিয়ার প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা ক'রে লিখেছিলেন,

'ইতিপূর্বে রামজয়, (পুত্র ঠাকুরদাস লেখাপড়া ভালরূপ শিখিয়াছেন, বিষয়কর্মে লিপ্ত হইয়া পরিবারবর্গের কষ্ট নিবারণ ও ভরণ-পোষণাদি কার্যনির্বাহ করিতে পারিবেন দেখিয়া) জন্মের মত ঈশ্বরারাধনায় তীর্থক্ষেত্র-পর্যটনে প্রস্থান করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার পরিবারগণের কোন সংবাদ পান নাই। রামজয় একদিবস (কেদার পাহাড়ে) নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, "রামজয়! তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করিতেছ? স্বদেশে যাও। তোমার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া, নিরন্তর বিদ্যাদান ও নিরুপায় লোকদিগের ভরণপোষণাদির ব্যয়-নির্বাহ দ্বারা তোমার বংশের অনন্ত-কালস্থায়িনী কীর্তি স্থাপন করিবেন।" রামজয়, পাহাড়ের মধ্যে নিশীথ সময়ে এরূপ অসম্ভব স্বপ্নদর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুদিন অতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, নিভৃতস্থানে ঈশ্বরারাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহারা কি করিতেছে ও কে আছে না আছে, তাহাও জানি না। এবম্বিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্বার নিদ্রাভিভূত হইলে, কে যেন বলিয়া দিল, "তুমি পরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না; তোমার প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া, রামজয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।'[১]

ঈশ্বরচন্দ্রের গর্ভবাসকালে জননী ভগবতী দেবীর অবস্থা বর্ণনাকালেও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর-চরিত্রের দৈবী মহিমার পূর্বাভাস দানের চেষ্টা করেছেন,

'ঈশ্বরচন্দ্র যৎকালে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেবী দশমাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন। পিতামহী দুর্গাদেবী, বধূর রোগোপশমের জন্য কতই প্রতিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। তৎকালে কোন কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, পিতামহী ও মাতামহীকে বলিতেন, ভূতে পাইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলিতেন, ডাইনী পাইয়াছে। এই সকলের রোজা

১ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১২

আনাইয়া দেখান হয়, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি এ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; রোগের তথ্যানুসন্ধানবিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল। ইনি রোগনির্ণয়ের পূর্বে রোগীর কোষ্ঠীগণনা করিতেন। ইনি পিতামহীকে বলেন, আমি তোমার বধূমাতার রোগ নির্ণয় করিলাম, এক্ষণে ইহার কোষ্ঠী দেখিতে ইচ্ছা করি। চিকিৎসক ভট্টাচার্য মহাশয় উক্তরূপ কথা বলিলে, দুর্গাদেবী তাঁহার কোষ্ঠী দেখিতে দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভবানন্দ গণনা করিয়া বলিলেন, ইঁহার কোন রোগ নাই; ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে। কোনরূপ ঔষধ সেবন করিবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ট হইলেই ইনি রোগমুক্তা হইবেন।'[১]

এখানেই শেষ নয়, নবজাত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মক্ষণকে ঘিরেও শম্ভুচন্দ্র আরো কিছু অতিলৌকিকতার আবরণ সৃষ্টি করেছেন,

'তীর্থক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে আলতায় এই ভূমিষ্ঠ বালকের জিহ্বার নিম্নে কয়েকটি কথা লিখিয়া, তাঁহার পত্নী দুর্গাদেবীকে বলেন, লেখার নিমিত্ত শিশুটি কিয়ৎক্ষণ মাতৃ-দুগ্ধ পান করিতে পায় নাই; বিশেষতঃ কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায়, এই বালক কিছুদিন তোতলা হইবে। এই বালক ক্ষণজন্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্তি দিগন্তব্যাপিনী হইবে। এই বালক জন্ম গ্রহণ করায়, আমার বংশের চিরস্থায়ী কীর্তি থাকিবে। ইহাকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। এই বালককে অপর কেহ যেন মন্ত্র না দেয়; অদ্য হইতে আমিই ইহার অভিষ্টদেব হইলাম। এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বরচন্দ্র রাখিলাম।'[২]

ঈশ্বরের ওপর বরাত না দিয়ে যিনি আপন পৌরুষ ও কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর ক'রে নির্ভয়ে একাকী আজীবন সহস্রবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে গেছেন, তাঁরই 'ঈশ্বর' নামের যে আপাতবৈপরীত্য, শম্ভুচন্দ্রের লেখায় যেন তারই আপাতগ্রাহ্য একটা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। তাঁর বাল্যবয়সের তোতলামী এবং পরিণতবয়সের কারুণ্য ও দয়াধর্মের

---

১ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৪

২ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৩

মধ্যেও তিনি একটা অলৌকিকতার প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা ক'রে বিদ্যাসাগরকে দেবত্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনীগ্রন্থে শম্ভুচন্দ্রের এই বক্তব্যের প্রায় হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে গেছেন। বিহারীলাল সরকার তাঁর জীবনীগ্রন্থে আরো কিছুটা অগ্রসর হ'য়ে বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের শিশুসুলভ দৌরাত্ম্যের মধ্যেও প্রতিবেশীদের মাহাত্ম্যদর্শন বর্ণনা করেছেন,

'মথুর মণ্ডল নামে একজন প্রতিবেশী ছিল। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রী, বালক বিদ্যাসাগরকে বড় ভালবাসিতেন। বালক বিদ্যাসাগর কিন্তু প্রায় প্রত্যহ পাঠশালায় যাইবার সময় মথুরের বাড়ীর দ্বারদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। মথুরের মাতা ও স্ত্রী দুই হস্তে তাহা মুক্ত করিতেন। বধূ কোনদিন বিরক্ত হইলে, শাশুড়ী বলিতেন,—"ইহাকে কিছু বলিও না। ইহার ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছি, এছেলে একজন বড়লোক হইবে"।'[১]

বিদ্যাসাগরের চতুর্দিকে এই ধরণের অলৌকিকতার মায়াবরণ গ'ড়ে তোলার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর সাধ্যমত প্রতিবাদ করেছিলেন। বিহারীলাল লিখেছেন,

'বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে কিন্তু একথার উল্লেখ করেন নাই; অধিকন্তু আমাদের বন্ধু 'বিশ্বকোষ' নামক বিবিধবিষয়ক পুস্তক সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় একথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বন্ধু তাঁহার জীবনীর তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া 'বিশ্বকোষে' মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি একথার উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"ওসব কথা শুনিও না; ও সব অমূলক"।'[২]

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত প্রতিবাদে তাঁর জীবদ্দশায় এই ধরণের অমূলক কাহিনী বিশেষ প্রচার লাভ না করলেও তাঁর মৃত্যুর পর এইরকম কল্পিত কাহিনীর বন্যায় বিদ্যাসাগরের চরিত্র পরিপ্লাবিত হ'য়ে গিয়েছিল। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন'।[৩]

১ 'বিদ্যাসাগর' চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৯

২ বিদ্যাসাগর, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩০-৩১

৩ 'বিদ্যাসাগর', চারিত্রপূজা

বাঙালীচরিত্রের এই ধৃষ্টতার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মূল প্রবণতা, তাঁর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের প্রধানতম সূত্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন,

'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব—এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।'[১]

বিদ্যাসাগরের চরিত্র উপলব্ধির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে আশা, তা পূরণের জন্যে বিদ্যাসাগর নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে বাঙালীজীবনে শিক্ষার আলোক আনয়নে সচেষ্টভাবে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের মূল উৎস ছিল শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা প্রচারের ঐকান্তিক আগ্রহ। তাঁর অন্যান্য কর্মধারা এই মূল উৎস থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল। শিক্ষাশাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাদর্শনের মধ্যেই তাই তাঁর চরিত্রের মূল প্রবণতা ও প্রধান বৈশিষ্ট্যটির পরিচয় আবিষ্কার করতে পারা যায়।

বিদ্যাসাগর চরিত', চারিত্রপূজা

তিন

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার মধ্যে সম্মেলনের সেতুস্বরূপ'

১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্মজগতের সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের পশ্চাতে যদি একটিমাত্র কোনও বৈশিষ্ট্যের কার্যকরী প্রভাবের প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা হোল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের সচেতন প্রয়াস। এদেশে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই প্রয়াসের সূত্রপাত ঘটেনি, এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গের মনে এ-বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতার বা উৎসাহ প্রদানের কল্পনাও উদিত হয়নি। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হ'লেও তার পিছনে শিক্ষা বিস্তারের বিশুদ্ধ কোন প্রেরণা ছিল না, ইংরেজ বিচারকদের সুবিধার্থে হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ সরবরাহ করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষা বিষয়ে কোম্পানীর 'পরিচালক সমিতি'র বণিকমনোবৃত্তিজাত ঔদাসীন্য কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। নবজাগরণোত্তর ইউরোপের উদার মানবিক শিক্ষাধারায় লালিত হওয়ার দরুণ তাঁদের মধ্যে যে মানবিক মূল্যবোধ গ'ড়ে উঠেছিল, তারই কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছিল এদেশের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারায়। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে গভর্ণর স্যার জন শোরকেই সর্বপ্রথম এ-বিষয়ে চিন্তা করতে দেখা যায়। তাঁর বিখ্যাত 'Notes on Indian Affair'-এ তিনিই প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন,

'এই বিশাল দেশের অধিবাসীদের বর্তমান অজ্ঞানাবস্থাতেই নিমজ্জিত হ'য়ে থাকতে দেওয়া হবে, না, তাদের ইংরেজপ্রভুদের সাহায্যকারী ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে?'

এ-বিষয়ে নিজস্ব মতামত জানাতে গিয়ে তিনি কয়েকটি সুচিন্তিত মন্তব্য দান ক'রে বলেছিলেন যে, শিক্ষাবিষয়ে যদি ইংরেজদের কিছু করার থাকে তো তার জন্যে পূর্বাহ্ণেই কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে নিতে হবে। প্রথমতঃ, আদালতের ভাষা কি হবে তা আগে ভাগে স্থির করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কিছু নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে; নিদেন পক্ষে, এদেশের মনুষকে তাদের

নিজস্ব রীতিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্যে দেশীয় পাঠশালাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহ দান করতে হবে। তৃতীয়তঃ, এদেশের ভাষাগুলিতে দেশবিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদের জন্যে উৎসাহ দিতে হবে। চতুর্থতঃ, যাদের সুযোগ ও উৎসাহ আছে, জানবিজ্ঞানের সর্ববিধ তথ্যানুসন্ধানের সুবিধার জন্যে তাদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে।

প্রস্তাবগুলি কিন্তু প্রস্তাবাকারেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেগুলি বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে বিশেষ কিছু করা হয়েছিল কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এর প্রায় কুড়ি বছর পরে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ময়রা এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর 'মিনিটে' লিখেছিলেন,

'আমাদের সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তার এবং সংরক্ষণের জন্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাতে গিয়ে, অধিকারভুক্ত অঞ্চলের জনগণের অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে আমরা খুবই কম সময় পেয়েছি। তাদের অবস্থা এখন খুবই দুর্বিষহ হ'য়ে উঠেছে। ক্রমাগত যুদ্ধে ভারতের চতুর্দিকে যে অনিশ্চিত অবস্থা ঘনিয়ে উঠেছে, তার ফলে, নৈতিক চরিত্র গঠনের পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছে এবং অসৎ প্রবৃত্তির প্রাধান্য উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে।'[১]

শিক্ষাই একমাত্র এই চরিত্রভ্রষ্টতা সংশোধন করতে পারলেও, লর্ড ময়রা উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলাদেশের গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকদের কাছে সে রকম শিক্ষা প্রণালী আশা করা বৃথা। অথচ জনশিক্ষার জন্যে সেই গ্রাম্য শিক্ষককুলের ওপর নির্ভর করা ছাড়া সে-যুগে অন্য কোন উপায় ছিল না। তাই তিনি সেই শিক্ষককুলকে ধর্মজ্ঞান ও নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি জাগিয়ে তুললে যৎসামান্য দক্ষিণার পরিবর্তে সেই গ্রাম্য শিক্ষককুলই প্রয়োজনীয় জনশিক্ষার প্রধান মাধ্যম হ'য়ে উঠবে ব'লেও তাঁর ধারণা জন্মেছিল। তাই খুব জোর দিয়েই তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

'এইসব লোকেরা যে অকিঞ্চিৎকর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লেখাপড়া ও আঁক কষার প্রাথমিক জ্ঞান দান করে, তা যে কোন লোকের পক্ষেই বহন করা সম্ভব। যে ধরণের শিক্ষাদানে তাদের যোগ্যতা আছে, গ্রাম্য জমিদার, গ্রাম্য হিসাবনবীশ, আর গ্রাম্য দোকানদারদের পক্ষে তাই যথেষ্ট ব'লে মনে হয়।'

১ H. A. Stark—Vernacular Education in Bengal; Calcutta, 1916

লর্ড ময়রার 'মিনিট' পেশের একমাসের মধ্যেই স্যার চার্লস্ নেপিয়ারও এদেশে শিক্ষাবিস্তারের আশু প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, 'কোন সাম্রাজ্য লাভ বা হারানোতে সাধারণভাবে মানুষের কিছুই দায়িত্ব থাকে না, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অমোঘ বিধানই সেই লাভে বা বঞ্চনায় কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। সীমাবদ্ধ অধিকারকালের মধ্যে বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মের রূপায়ণেই মানুষের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। তাই অধীনস্থ দেশের সুখসমৃদ্ধির সর্ববিধ ব্যবস্থাতেই শাসকজাতির সাম্রাজ্যলাভের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ইংরেজদের ক্ষেত্রেও তাই ভারতীয় জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানেই ইংরেজ অধিকারের সার্থকতা। তাই, আমরা যদি আমাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারি, তাহলে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা আর বিশ্ববাসীর প্রশংসায় আমাদের নাম চিরদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, ভবিষ্যৎকালে কোন পরিবর্তনই তাকে সামান্যতমও প্রভাবিত করতে পারবে না।[১]

এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি শাসক কর্মচারীর দল যখন আধুনিক শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এমনিভাবে চিন্তা করছিলেন, ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্মকর্তা এবং পার্লামেণ্ট-সদস্যদের মধ্যেও তখন সে-বিষয়ে নানারকম তর্কবিতর্ক সুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অবাধ অধিকার দেওয়ার জন্যে, পার্লামেণ্টে বিতর্ক উত্থাপনের উদ্দেশ্যে উইলিয়াম উইলবারফোর্সকে, কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মচারী চার্লস গ্র্যাণ্ট নানাভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলে, উইলবারফোর্স ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষক প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর পার্লামেণ্টে একটি প্রস্তাব আনেন। সেটা হোল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেবার উইলবারফোর্সের প্রয়াস ব্যর্থ হ'লেও পরের বার, অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ পুনর্বিবেচনাকালে তিনি আবার সচেষ্ট হ'য়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে গ্র্যাণ্টের বক্তব্য 'Observation on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়ে পার্লামেণ্টের ভারতীয় নীতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গ্র্যাণ্ট তাঁর এই বিখ্যাত মিনিট ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর 'পরিচালক সমিতি'তে পেশ করেন, পার্লামেণ্টের আদেশে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের বিরোধীদের সর্ববিধ যুক্তি খণ্ডন ক'রে গ্র্যাণ্ট এই 'মিনিটে' খ্রীষ্টধর্ম ও ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের সপক্ষে নানাবিধ যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেন। তাঁরই বক্তব্যের

---

১ H. A. Stark—Vernacular Education in Bengal.

অনুসরণে উইলবারফোর্স ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের সপক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে পার্লামেণ্টে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস, মনরো প্রভৃতি সদস্যেরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত উইলবার-ফোর্সেরই জয় হয়। তাঁর প্রস্তাবটিই পার্লামেণ্ট আইন হিসেবে প্রচার করেন। তবে এই আইনে কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের অবাধ সুযোগই দেওয়া হোল না, এদেশে শিক্ষাবিস্তার এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার জন্যে এক লক্ষ টাকার অনুদান দেবারও ব্যবস্থা করা হোল। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে এক লক্ষ টাকার অনুদান অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হ'লেও শাসকশ্রেণীর মানসিকতার দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিধান যুগান্তরের ইঙ্গিত বহন ক'রে এনেছিল।

সরকারী পর্যায়ে যখন এমনিভাবে নানারকম চিন্তা ও পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, তখন দেশি-বিদেশি নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, তাঁদের সীমায়িত ক্ষমতা নিয়েই নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে ইংরেজি শিক্ষা দেবার কাজে নেমে পড়েছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন বসু ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্যে ভবানীপুরে একটি স্কুল খোলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী রবার্ট মে চুঁচুড়ায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের জন্যে এই এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রয়াস অপেক্ষা অনেক বেশি সাহায্য করেছিল দেশি বিদেশি যৌথ প্রয়াসে গঠিত হিন্দু কলেজ, কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এবং কলকাতা স্কুল সোসাইটি। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশি বিদেশি বিদ্যোৎসাহীদের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ওই বছরই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও সুলভমূল্যে অথবা বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে স্থাপিত হয় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। আর আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন এবং একটি আদর্শ শিক্ষাধারা প্রবর্তনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে পরের বছর স্থাপিত হয় কলকাতা স্কুল সোসাইটি। ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন তাঁর এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের এই সমস্ত বেসরকারী উদ্যোগে সরকার পক্ষ থেকে প্রায় কিছুই করা হয়নি। এমনকি, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এ দেশে শিক্ষা প্রচারের জন্যে বার্ষিক একলক্ষ টাকার যে অনুদান দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার সুষ্ঠু বণ্টনের জন্যেও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। দশ বছর পরে অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল এ্যাডামের এই দিকে চোখ পড়ে এবং পার্লামেণ্টের বরাদ্দ করা টাকার বিলিবন্দোবস্ত করার জন্যে তিনি একটি সমিতি

গঠন করেন এবং তার নাম দেন 'General committee of public Instruction'. 'জনশিক্ষার্থে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন ক'রে জনশিক্ষার বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা, জনসাধারণকে উচ্চতর শিক্ষার সুবিধাদানের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শাখা প্রশাখার অন্তর্ভুক্তি এবং সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির মহান আদর্শ প্রচার ক'রে কাজে নামলেও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 'জেনারেল কমিটি' আর বিশেষ কিছু করতে পারেনি। কলকাতা মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহদান এবং কলকাতায় একটি নতুন সংস্কৃত কলেজে স্থাপনই 'জেনারেল কমিটি'র সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'জেনারেল কমিটি'র এই গতানুগতিক শিক্ষাধারার পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানান রাজা রামমোহন রায়। সরকারী অর্থে আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা জাতীয় রাজস্বের অপচয়মাত্র মনে ক'রে তিনি গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন,

'দেশীয় জনসাধারণের উন্নতিবিধানই যেখানে সরকারের উদ্দেশ্য, সেখানে গণিত, দর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়সমূহের মতো উদার ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতাই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত একটি কলেজ এবং ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন প্রতিভাবান ও পণ্ডিত মানুষকে নিয়ে মঞ্জুরীকৃত অর্থের দ্বারাই সেই পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্ভব।'[১]

রামমোহনের এই প্রস্তাব 'জেনারেল কমিটি'র কাছে গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়নি।

যে সরকারী আদেশে 'জেনারেল কমিটি' গঠিত হয়েছিল, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে সেখানে বলা হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনসহ প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যেই নবগঠিত শিক্ষাসমিতি কাজ করে যাবে। কিন্তু শিক্ষাখাতে প্রথম অর্থ বরাদ্দ ক'রে 'পরিচালক সমিতি' বিলেত থেকে যে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন সেখানে সুস্পষ্টভাবে ব'লে দেওয়া হয়েছিল যে, 'যে

১ Charles E. Trevelyan—On the Education of the People of India, London, 1838

বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে, তা হবে প্রাচ্য বিজ্ঞান, সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত নীতি-শিক্ষার পদ্ধতি।'

এই দু'টি ভিন্ন আদেশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমিটির সদস্যদের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ দেখা দিল। পরবর্তীকালে 'ওরিয়েন্টালিষ্ট' নামে পরিচিত কমিটির অর্ধেক সদস্য প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণের ওপরই জোর দিলেন। সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের বারো থেকে পনেরো বছর ধ'রে বৃত্তিপ্রদান এবং ওই দুটি ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে উদার হস্তে অর্থ সাহায্যের জন্যে তাঁরা জোর সুপারিশ করলেন। অপরদিকে, পরবর্তীকালে 'এ্যাংলিশিষ্ট' আখ্যায় পরিচিত কমিটির অপরার্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের নির্বোধ ও অলস ছাত্রদের বৃত্তিদানের তীব্র বিরোধিতা করলেন। সংস্কৃত ও আরবি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ অপ্রয়োজনে ছাপারও তাঁরা বিরুদ্ধতা করলেন। বিলেতের 'পরিচালক সমিতি' পাশ্চাত্যবাদীদের সমর্থন করলেও সমস্যার কোন মীমাংসা হোল না, বারোজন সদস্যের এই কমিটি ছয়জন ক'রে সমান সংখ্যায় দুটি বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হ'য়ে গেল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি এই বিরোধ এমন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছলো যে কমিটির স্বাভাবিক কাজকর্ম চলাও দুষ্কর হ'য়ে পড়লো। দুই পক্ষই তখন নিজেদের বক্তব্য যথাসাধ্য যুক্তিসহকারে সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্যে প্রেরণ করলেন। সেই বক্তব্য বিচারের ভার পড়লো গভর্ণর জেনারেলের সুপ্রীম কাউন্সিলের আইন সদস্য লর্ড ব্যাবিংটন মেকলের ওপর। সুস্পষ্ট অভিমতসহ মেকলে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' পেশ করলেন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী,

'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগবঞ্চিত এক জাতিকে আমাদের শিক্ষা দিতে হবে। তাদের একটি বিদেশী ভাষা শেখাতেই হবে। এ-বিষয়ে আমাদের নিজেদের ভাষার দাবী পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখে না। পাশ্চাত্য ভাষাগুলির মধ্যেও তার স্থান সর্বাগ্রে। এই ভাষায় বাগ্মিতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, ঐতিহাসিক রচনার সৌন্দর্য আজও অনতিক্রান্ত ; নীতিশিক্ষা ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশ যেমন অতুলনীয় তেমনি মানুষের জীবন ও প্রকৃতির যথাযথ ও জীবন্ত উপস্থাপনাও আশ্চর্যজনক ; দর্শন, ন্যায়নীতি, রাষ্ট্রচালনা, ব্যবহারবিদ্যা ও বাণিজ্যচিন্তার সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞানের যেমন পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে ফলিত বিজ্ঞানের যে শাখাগুলিকে অবলম্বন ক'রে মানুষের স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি আজ চরম উন্নতি লাভ করেছে তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ ও নির্ভুল তথ্যও তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক ; পৃথিবীর প্রাজ্ঞতম জাতিগুলি যুগ যুগ ধ'রে জ্ঞানের

যে সম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ ক'রে গেছে, এ ভাষায় জ্ঞান থাকলে তার মধ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করা যাবে। তিনশো বছর আগেকার সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্য একত্রেও এই ভাষায় বর্তমান যুগে রচিত সাহিত্যসম্পদ অপেক্ষা যে বহুলাংশে নিকৃষ্ট সে কথা আজ নিশ্চিন্তভাবেই বলা চলে। কেবলমাত্র তাই নয়। ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর ভাষা হোল ইংরেজি। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়রাও সরকারী দপ্তরখানায় ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার ক'রে থাকেন। সমগ্র পূর্বসাগরীয় অঞ্চলে এ ভাষা আবার ব্যবসা বাণিজ্যেরও ভাষা হ'তে চলেছে।

মেকলের এই মন্তব্যকে সমর্থন ক'রে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাব প্রকাশ করলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের আদেশ জারি করলেন,

'সপারিষদ বড়োলাট বাহাদুর মনে করেন ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চাকেই পৃষ্ঠপোষকতা করা ব্রিটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষাখাতে নির্দিষ্ট সমস্ত অর্থই ইংরেজি শিক্ষার জন্যে ব্যয়িত হওয়া উচিত।'[১]

প্রাচ্য শিক্ষাবিধির প্রতি সরকারী আনুকূল্য এই আদেশের বলে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হোল এবং চালু বিদ্যালয়গুলি তুলে না দিলেও ছাত্রবৃত্তির নিয়ম রদ ক'রে দেওয়া হোল। পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব এবং পাঠার্থী ছাত্রদের সংখ্যা বিচার ক'রে, সরকারকে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ঔচিত্য বিচারের সুযোগ দেবার জন্যে, কোন শিক্ষকপদ খালি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হোল। প্রাচ্য ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী মুদ্রণের প্রচলিত ব্যবস্থাও ওই আদেশ বলেই রদ হ'য়ে গেল। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অনুমেয় উদ্বৃত্ত অর্থের সমস্তটাই পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্যে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে বড়োলাটের আদেশে বলা হোল,

'এই সমস্ত সংস্কারের ফলে কমিটির যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে, এর পর থেকে দেশীয় জনসাধারণকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেই তা ব্যয় করতে হবে ব'লে সপারিষদ বড়োলাট বাহাদুর নির্দেশ দিচ্ছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি পরিকল্পনা

১ Stark—Vernacular Education in Bengal

সরকারের কাছে পেশ করার জন্যে সপারিষদ বড়োলাট বাহাদুর কমিটিকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।'[১]

সরকারের শিক্ষানীতির এই সুস্পষ্ট পরিবর্তন 'জেনারেল কমিটি'র গঠন ও কর্মপদ্ধতির মধ্যেও নানা পরিবর্তন সূচিত করলো। নতুন শিক্ষানীতির সমর্থক কোন ব্যক্তির অনুকূলে পূর্বতন সভাপতি পদত্যাগ করলেন এবং সেইস্থানে লর্ড মেকলে নতুন সভাপতি মনোনীত হলেন। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষমণ্ডলীর দু'জন সদস্যকে কমিটির সদস্যপদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোল এবং মুসলমানদেরও একজন সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হোল। অর্থাৎ, এদেশের মানুষ সর্ব প্রথম কমিটির কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করলো।

কমিটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা স্তরের বিদ্যালয়গুলির কর্মপদ্ধতি ও পরিচালন ব্যবস্থাতেও নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হোল। মেধাবী ও উৎসাহী ছাত্রদের নানারকমে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোল। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য থেকে সভ্য নির্বাচন ক'রে স্থানীয় কমিটি গঠনের নিয়ম প্রবর্তিত হোল। শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-দানের জন্যেই সরকারী অর্থসাহায্য ব্যয় করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোল। সামান্য পরিমাণে হ'লেও একটা যা হোক কিছু মাসিক বেতন ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করার নিয়ম গ্রহণ করা হোল এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের ভার তাদেরই ওপর ন্যস্ত হোল। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের যেমন বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হোল, তেমনি নির্বোধ ও অমনোযোগী ছাত্রদের কাছে বিদ্যালয়ের সব আকর্ষণ লুপ্ত হোল এবং প্রকৃত পাঠার্থী বালকেরাই বিদ্যালয়ে এসে একত্রিত হবার সুযোগ লাভ করলো। বিদ্যালয় থেকে দূর-দূরাঞ্চলের এই ধরণের ছাত্রদের সুবিধার জন্যে বিদ্যালয় সন্নিকটে ছাত্রাবাস স্থাপিত হোল। ছাত্রভর্তির ব্যাপারেও সম্পূর্ণ নতুন এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া হোল। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ সন্তান ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মাদ্রাসাতেও অমুসলমান ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ ছিল না। এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজেও উচ্চবর্ণের হিন্দুসন্তান ছাড়া অন্য কেউই পাঠের সুযোগ পেতো না। জেনারেল কমিটির কর্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়গুলিতেই সর্ব প্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর ছাত্রদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হোল। সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সর্বধর্মের বালকেরাই পাশাপাশি

১ Stark—Vernacular Education in Bengal

বসে পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ পেলো এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণের কৃত্রিম আবরণের বাইরে একমাত্র মেধাই একজন ছাত্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ব'লে স্বীকৃত হোল। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী মনোভাবের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র নির্মিত হোল। এই নব-সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালী এদেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীচেতনার পরিবর্তে একটি সার্বিক জাতীয়চেতনার ভিত্তি স্থাপন করলো।।

'জেনারেল কমিটি'র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে অন্যান্য নানাবিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন যে, একমাত্র মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই প্রকৃত অর্থে সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু এদেশের কোন ভাষাই তখন পর্যন্ত আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রকাশ করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তাই, এদেশের ভাষাগুলিকে সে কাজে যোগ্য ক'রে তোলার জন্যেও 'জেনারেল কমিটি'কে চিন্তা করতে হয়েছিল,

'এদেশের জনসাধারণকে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই সর্ববাদী-সম্মত উদ্দেশ্য হ'লেও, ইতিমধ্যে, শিক্ষকদের উপযুক্ত ক'রে তুলতে হবে, উপযুক্ত ভাষা সৃষ্টি করতে হবে এবং দেশীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।'[১]

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই চরম উদ্দেশ্য নিয়ে কোন মত-বিরোধ ছিল না ব'লে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চের প্রস্তাবে এ-বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়নি। এদেশের জনসাধারণের মনে তাই নানা সন্দেহ দেখা দিতে পারে চিন্তা ক'রে নবগঠিত কমিটির প্রথম প্রতিবেদনেই বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছিল,

' "পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান", "কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষা" এবং "দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিতরণ"—এই বাক্যাংশগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ।'[২]

মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল,

১ Trevelyan—On the Education of the People of India.
২ Trevelyan—On the Education of the People of India.

'একটি স্বদেশী সাহিত্য সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকেই আমাদের সর্ববিধ কর্মপ্রয়াস পরিচালিত হবে ব'লে ঘোষণা করছি'।[১]

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই মূল উদ্দেশ্য নিয়েই সাময়িকভাবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষাদানের কারণ হিসেবে বলা হোল,

'শিক্ষা দেবার আগে এদেশীয়দের শিক্ষা লাভ করা দরকার। তাদের মধ্যে যারা সুশিক্ষিত, নিজেদের ভাষায় রূপান্তরের আগে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের আহরণ করা কর্তব্য।'[২]

এইভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে, দেশীয় ভাষাগুলির উপযুক্ততা গ'ড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত সাময়িকভাবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যম গ্রহণ করার যে ব্যবস্থা, সমাজের সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে দেবার কোন কার্যকরী পরিকল্পনা কিন্তু 'জেনারেল কমিটি'র ছিল না। 'জেনারেল কমিটি' তার এ্যাকাডেমিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যার মধ্যেই আপন কর্তব্য সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছিল। তত্ত্ব-নির্দেশেই কর্তব্য সমাপ্তি ক'রে কমিটি আশা করেছিল এদেশের মানুষ আর্থিক অথবা অন্য যে কোন রকম সরকারী পৃষ্ঠপোষতার আশা না ক'রে নিজেদের উদ্যোগেই সেই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত করবে,

'আমাদের উদ্দেশ্য এমন একটি শিক্ষিতশ্রেণী গ'ড়ে তোলা, যাঁরা, এরপর আমাদের আশা অনুযায়ী আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অন্ততঃ তাঁদের স্বদেশবাসীকে দান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'[৩]

সেই উদ্দেশ্যেই, 'জেনারেল কমিটি' পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ শিক্ষক গড়ার নার্সারী ব'লে বর্ণনা ক'রে মেকলে মন্তব্য করেছিলেন,

প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন বর্তমান শিক্ষকদের কেমন ক'রে আরও দক্ষ ক'রে তোলা যায় অথবা তাদের জায়গায় আরও যোগ্য লোক কেমন ক'রে নিয়োগ করা যায় আমি বুঝতে পারছি না। এই দোষ-ত্রুটির সংশোধন সময় সাপেক্ষ। আমাদের (ইংরেজি) বিদ্যালয়গুলি আগামী প্রজন্মের পক্ষে স্কুল-শিক্ষক গড়ার নার্সারী বিশেষ। আমরা যদি একটি সুশিক্ষিত বাঙালীগোষ্ঠী গ'ড়ে তুলতে পারি, অতি স্বাভাবিকভাবেই, তারা কোন উগ্র রূপান্তর ছাড়াই, ধীরে ধীরে বর্তমান অপদার্থ শিক্ষকদের স্থান গ্রহণ করবে।'[৪]

১ Trevelyan—On the Education of the People of India.
২ Trevelyan—On the Education of the People of India.
৩ Trevelyan—On the Education of People of India.
৪ Stark—Vernacular Education in Bengal.

এরপর, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ায় এবং শিক্ষাখাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় সরকার আরও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষানীতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে মনস্থ করলেন। সেই উদ্দেশ্যেই, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হোল 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'; ভারতীয় আইন কমিশনের সভাপতি, ভারতের আইন কমিশনার, বাংলা সরকারের সেক্রেটারী, আইন কমিশনের সেক্রেটারী, চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক এবং দু'জন হিন্দু ভদ্রলোক এই কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হলেন এবং সম্পাদক পদে নিযুক্ত হলেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন সম্পাদক ডঃ এফ. জে. ময়েট। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পাদক মার্শাল সাহেবের মাধ্যমে এই ময়েট সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ ঘটেছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই তিনিও, মার্শাল সাহেবের মতোই, বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী হ'য়ে উঠেছিলেন। চার বছর পরে, এই ময়েট সাহেবের অনুরোধেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষানীতির চূড়ান্ত সংস্কার কামনায় বিদ্যাসাগর সেখানকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন।

২

সংস্কৃত কলেজে দুই দফায় বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আয়ুষ্কাল প্রায় ন'বছরের মতো। প্রথমবার সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করেছিলেন, তারপর দ্বিতীয় বারে অধ্যক্ষ হিসেবে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার আগে মাসখানেকের জন্যে সাহিত্য অধ্যাপকের পদেও কাজ করেছিলেন। এই স্বল্প সময়ের চাকরীকালে বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে সরকারের কাছে দুটি দীর্ঘ পরিকল্পনা এবং একটি স্মারকলিপি পেশ ক'রেছিলেন। এই পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারবিষয়ে বিদ্যাসাগরের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথম শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনায় তাঁর নিজের কথাতেই তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা চলে,

'প্রচলিত শিক্ষাবিধির কার্যকারিতা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। সংস্কৃত এবং ইংরেজি বিদ্যায় একই সঙ্গে গভীর জ্ঞানলাভের পরিকল্পনার ওপর অনেক ভেবে চিন্তেই আমি আমার অভিমত প্রদান করছি। আমার ধারণা,

এইরকম শিক্ষাই আমাদের স্বদেশী ভাষাগুলিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার রসে অভিসিঞ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত মানুষ গ'ড়ে তুলবে।'[১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার সমন্বয়ের জন্যে বিদ্যাসাগরের এই যে স্বপ্ন তাঁর শিক্ষাসাধনার মধ্যে রূপায়িত হ'য়ে উঠতে চেয়েছিল, সেই স্বপ্ন রূপায়ণে তাঁর নিজের যোগ্যতা বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি, সে-যুগে এ-যুগে সর্বযুগেই, তাঁর চেয়ে একাজে উপযুক্ত ব্যক্তি খুব কমই দেখতে পাওয়া গেছে। প্রায় সাড়ে বারো বছর ধ'রে অধ্যয়ন করার পর সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে যাবার সময় বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ অধ্যাপক মণ্ডলী তাঁকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে অধ্যয়ন করার বছরগুলির পৃথক পৃথক রিপোর্ট দেখলেই, তার যাথার্থ্য বুঝতে পারি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবেশ ক'রে বিদ্যাসাগর ব্যাকরণের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে। সাড়ে তিন বছরের ব্যাকরণ শ্রেণীতে প্রথম তিনবছর তিনি 'মুগ্ধবোধ' পাঠ করেন আর শেষ ছ'মাস অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পাঠ করেছিলেন। তিন বছরের তিনটি বার্ষিক পরীক্ষাতেই তিনি পারিতোষিক লাভ করেছিলেন। একবছরের ফল আশা-স্বরূপ হয়নি ব'লে তিনি সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, নিজের অসাফল্যজনিত দুঃখে নয়, পরীক্ষকের অকারণ বিরুদ্ধতার বেদনায়। মৌখিক পরীক্ষাদানের সময় তিনি একজন ইংরেজ পরীক্ষকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন ধীরে ধীরে, কেটে কেটে, একটা শব্দ থেকে অন্য শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ ক'রে। সেই পরীক্ষকের কাছে সেটা দোষের মনে হয়েছিল; আবার অনেক জায়গায় তিনি বিদ্যাসাগরের উত্তর বুঝতেও পারেননি। ফলে, সেবছর বিনা দোষে তিনি পুরস্কারে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

ব্যাকরণশ্রেণীর পর বিদ্যাসাগর পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে পাঠ নেবার জন্যে সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তাঁর সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশের সময় একটি ঘটনা তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও তীব্র আত্মসম্মানবোধ প্রকাশ

১ 'I have carefully studied the working of the system, and the suggestions made are brought forward with the view of fecilitating the acquirement of the largest store of sound Sanscrit and English learning combined, under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our Vernacular dialects with the science and civilization of the Western World.'

ক'রে গুরুকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। কাব্য পড়াবার সময় গুরু জয়গোপাল ভাষা বা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাই ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে চাইতেন। ব্যাকরণের সুদৃঢ় বনিয়াদ ছাড়া কাব্যের অন্তর্লোকে প্রবেশের এই প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য ছিল, তাই প্রথম পাঠার্থী ছাত্রদের তিনি যথেষ্টভাবে পরীক্ষা ক'রে নিতেন, নিশ্চিন্ত হ'তে চাইতেন তাদের ব্যাকরণজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে। একাদশ বৎসরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ শেষ ক'রে সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে নিতান্ত বালক ভেবে তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞান সম্বন্ধে জয়গোপালের মনে সন্দেহ জেগেছিল, সে সন্দেহ তিনি প্রকাশ ক'রেও ফেলেছিলেন। গভীর আত্মবিশ্বাসী এবং তীব্র আত্মাভিমানী বালকের আত্মসম্মানে সে সন্দেহ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। তাই সাহিত্যবিষয়ে পরীক্ষা না ক'রে তাঁকে সাহিত্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা হ'লে তিনি কলেজ ছেড়ে দেবেন ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। পরীক্ষা গুরুকে নিতে হয়েছিল এবং সে পরীক্ষায় তিনি এমন উত্তর করেছিলেন, যা উচ্চশ্রেণীর অনেক ছাত্রের পক্ষেও দুঃসাধ্য ছিল। হৃষ্টচিত্ত গুরু তাঁকে কেবল সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্র হিসেবেই গ্রহণ করলেন না, তাঁর কবিপ্রতিভার উজ্জীবনে প্রথম প্রেরণা দান ক'রে মৌলিক রচনার দিকে তাঁর চিত্তকে উদ্দীপিত ক'রে তুললেন। সাহিত্যশ্রেণীর দু'বছরই তিনি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এরপর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কাছে অলঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির কাছে বেদান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্র, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে ন্যায় এবং যোগধ্যান মিশ্রের কাছে জ্যোতিষের পাঠ সমান কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত ক'রে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত কলেজের পাঠজীবন শেষ করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজেই বিদ্যাসাগরের ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য বিষয় না থাকলেও যারা পড়তে চাইতো তাদের ব্যকরণশ্রেণী থেকেই ইংরেজির পাঠ নিতে হতো। বিদ্যাসাগরও মুগ্ধবোধ পড়তে পড়তেই ইংরেজিশ্রেণীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে সেখানেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে তিনি History of Greece প্রভৃতি গ্রন্থ পুরস্কার লাভ করেন। পরের বছরও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি Poetical Reader No. 3 এবং English Reader No. 2 নামে দু'খানি গ্রন্থ পুরস্কার পান। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ইংরেজি বিভাগ তুলে দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের ইংরেজি শিক্ষায়

ছেদ পড়ে। এই হঠাৎ ছেদ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মনে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল, তারা কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেবের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তনের আবেদন জানিয়েছিলেন,

'এইক্ষণে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্বক রীত্যনুসারে আমাদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয়। তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি।'[১]

এই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যাসাগরের পক্ষে তাই ইংরেজিবিদ্যা আহরণ করা আর সম্ভব হয়নি। শিক্ষায় এই অসমাপ্তির বেদনা বিদ্যাসাগর কোনদিন ভুলতে পারেননি, তাই প্রাপ্ত প্রথম সুযোগেই তার উপশমের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের চাকরীতে ঢোকার সময় তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারেননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী হিসেবে মার্শাল সাহেব তাঁর নিযুক্তির সপক্ষে যে অভিমত দিয়েছিলেন, তাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়,

'সংস্কৃত কলেজের ইংরেজিশ্রেণীতে প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটেছিল ব'লে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি সম্বন্ধেও পরিমিত জ্ঞানের অধিকারী; কিন্তু সেই শ্রেণী তুলে দেওয়ায় তিনি সে বিষয়ে অধিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাননি।'[২]

লক্ষ্য করবার বিষয়, মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের ইংরেজি জ্ঞানের অভাবের কথা উল্লেখ করেননি, তাঁর ইংরেজিশিক্ষার সুযোগের অভাবটাকেই বড়ো ক'রে তুলেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের চাকরি জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে মার্শাল সাহেবের এই মন্তব্যের সারবত্তা বোঝা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের কাজে যোগ দেবার পরই বিদ্যাসাগরের জীবনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং তার মাধ্যমে অনায়ত্ত ইংরেজিবিদ্যা আহরণের প্রথম সুযোগ এলো। মার্শাল সাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি হিন্দী এবং ইংরেজি শিখতে সুরু করলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়। দুর্গাচরণের একজন ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ও তাঁকে কিছুদিন ইংরেজিশিক্ষা দিয়েছিলেন। মাসিক পনেরো টাকা বেতনে রাজনারায়ণ গুপ্ত ব'লে হিন্দু কলেজের একজন ছাত্রকেও তিনি তাঁর ইংরেজি শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা সং ১৮

২ General Dept. Home Miscellaneous No. 5/4 Vol. No. 17

নিজের ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁধাধরা অধ্যাপনার কাজে যেমন ব্যস্ত থাকতেন, তেমনি চলতো তাঁর অবৈতনিক সংস্কৃতিশিক্ষার মিশনারী প্রয়াস। মার্শাল সাহেব তাঁর কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ নিতেন। তাঁর বাসায় সংস্কৃত শিখতে আসতেন শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিরা। ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ ও সংস্কৃত শিক্ষাদানের সহযোগে গঠিত বিদ্যাসাগরের চাকরিজীবনের এই প্রথম পর্বটি তাঁর শিক্ষা-সাধনার উদ্যোগপর্ব, এই পর্বেই তিনি তাঁর সাধনপথের যেমন সন্ধান পেয়েছিলেন, তেমনি সাধ্যবস্তুরও স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই চাকরিপর্বে বিদ্যাসাগর যে সমস্ত উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র সেক্রেটারী ডঃময়েটের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল বিশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজের বাৎসরিক স্কলারশিপ পরীক্ষা গ্রহণে বিদ্যাসাগর যে কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ডঃ ময়েটের মারফৎই তা শিক্ষাদপ্তরের সুপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় সমান জ্ঞান থাকার জন্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিধির সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল, মার্শাল সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ময়েট সাহেবও সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি আরও সচেতন ছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত ও ইংরেজি-ভাষার পারঙ্গমতা নিয়ে এমন একটা গভীর দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছেন যে, নিছক অধ্যাপনার মধ্যে তাঁর তৃপ্তি ঘটবে না। তাই সংস্কৃত কলেজে পাশ্চাত্যবিদ্যা প্রচারের সুস্পষ্ট সরকারী নীতি রূপায়িত ক'রে তোলার মধ্যে তিনি তাঁর মনোগত অভিপ্রায়ের কিছুটা প্রকাশপথ লাভ করবেন ব'লে মনে করেছিলেন ময়েট সাহেব। তাই ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হ'লে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে একযোগে তিনিও বিদ্যাসাগরকে সেই পদে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মার্শাল ও ময়েট সাহেবের মতো বিদ্যাসাগরও নবপ্রবর্তিত শিক্ষাদর্শের আলোকে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী পরিবর্তনে আগ্রহী হ'য়ে উঠেছিলেন। অধ্যাপনার দ্বারা সেই শিক্ষাসংস্কারের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব ছিল না ব'লে সংস্কৃত কলেজে বার বার অধ্যাপনার সুযোগ এলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ ও তৃতীয় শ্রেণীর

অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হ'লে বিদ্যাসাগরের কাছে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পদটি গ্রহণ করার অনুরোধ আসে। বিনীতভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে সেই পদে নিয়োগের জন্যে সুপারিশ করেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরির পরিবর্তে মাসিক নব্বই টাকা বেতনের চাকরি গ্রহণ না ক'রে তিনি পায়ে হেঁটে কালনা গিয়ে তারানাথের প্রশংসাপত্রাদি এনে তাঁর নিয়োগের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছিলেন। ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক পদ এবং গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ খালি হ'লে তিনি নির্বাচনী পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগের প্রস্তাব এলে তিনি কিন্তু আর এড়িয়ে গেলেন না। কারণ সে পদে অধিষ্ঠিত হ'লে তাঁর অভিলষিত শিক্ষাসংস্কারের যথেষ্ট সুযোগ ঘটবে ব'লে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। তাঁর আবেদনপত্রের সঙ্গে মার্শাল সাহেব যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তাতে তাঁর পাঁচ বছরের চাকরিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানার্জনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তাঁর নবলব্ধ ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে মার্শাল সাহেবের সন্তুষ্টি,

'সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং সেখানে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যে সব শাখায় শিক্ষা দেওয়া হয় তার সবগুলিই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করেছেন। তারপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনা ক'রে ইংরেজিভাষার জ্ঞানবিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেছেন।[১]

মার্শাল সাহেবের এই প্রশংসাপত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে এই পাঁচ বছরে আরও কিছু অধ্যয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়,

'আপনার কলেজের প্রচলিত শিক্ষাবিধির-বাইরের সাংখ্যদর্শন এবং পুরাণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যে আমি গভীর মনোযোগ দিয়েছি।'[২]

ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্যদর্শন ও পুরাণ অধ্যয়নের ফলে একদিকে যেমন অনধীত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতবিদ্যার সকল শাখায় তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব এসেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার সমন্বয়ে ভারতবর্ষে নতুন একটি জাতীয় শিক্ষাধারা প্রচলনের জন্যে 'জেনারেল কমিটি'র নতুন কর্মকর্তারা যে পরিকল্পনা করেছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র শিক্ষাচিন্তাতেও তারই অনুসরণ

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা সং ১৮

২ বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৬, পৃঃ ৮

ঘটেছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার সাধ্য কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ছিল না, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল বিদ্যাসাগরের মতোই একজন সংস্কৃত ও ইংরেজিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের, মার্শাল সাহেবের মতে, যাঁর 'বুদ্ধি, শ্রম, সুস্বভাব এবং শোভন ও ভদ্র চরিত্রগুণ'[১] ছিল সকল প্রশ্নের অতীত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার মিলনে একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলনের ব্যাপারে সরকারী নীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোন মতভেদ না থাকলেও তিনি বিশিষ্ট একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই নতুন রীতির রূপায়ণে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন শিক্ষার পরিবেশে বারো বছরের অধিককাল শিক্ষা লাভ ক'রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পূর্ণ বাস্তব ও আধুনিক পরিবেশে শিক্ষকতা করতে এসে তিনি একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্য কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, আবার কেবলমাত্র অর্থকরী বিদ্যারও কোন সদুদ্দেশ্য নেই। বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য উদার, মুক্ত, সচেতন মানবতাবোধের উদয়ে যথার্থ চরিত্রগঠন। চরিত্রবান মানুষই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিত্ত অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, জাতি ও বিশ্বজগতের মঙ্গলচিন্তা করতে পারে। তাই তিনি বাংলাদেশের মানুষের চরিত্র গঠনের উপযোগী আধুনিক শিক্ষার জন্যে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তির ওপর আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রাসাদ গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা তাকে যেমন প্রাচীনের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে আধুনিকতার সূর্যালোকে আবৃতচক্ষু শশকের দশায় নিক্ষেপ করবে, তেমনি কেবলমাত্র ইংরেজিশিক্ষা তাকে তার অতীত ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিলেও কোনক্রমেই তাকে ইংরেজে পরিণত করতে পারবে না। তাই সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যার অধ্যয়নেই বাঙালী আপন জাতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকাতেই আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হবে। তখন প্রাচীনও অবহেলিত হবে না, আধুনিকও বিকৃত হ'য়ে উঠবে না। সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই মনোভাবই সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হ'তে দেখি।

সহকারী সম্পাদক হিসেবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিধি সংস্কারের জন্যে যে বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন সম্পাদক রসময় দত্তের

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা সং ১৮

প্রতিকূলতায় সেটি তিনি কার্যে রূপায়িত করার সুযোগ পাননি। ব্যর্থমনোরথ বিদ্যাসাগর তাই পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পদত্যাগে রসময় দত্ত ব্যক্তিগত-ভাবে নিষ্কণ্টক হয়েছিলেনবটে, কিন্তু সংস্কৃতকলেজের দুর্দশা কাটেনি। 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এর প্রতিবেদনে তাই আক্ষেপ ক'রে বলা হয়েছিল,

'বর্তমানে বাংলাদেশে স্বদেশী সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, দক্ষ ও সবল পরিচালনাগুণে সংস্কৃত কলেজ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারতো এবং এই (বাংলা) প্রেসিডেন্সীর ভাষাকে সুসমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারতো।'১

যা হ'তে পারতো বলে এই প্রতিবেদনে আক্ষেপ করা হয়েছিল, বিদ্যাসাগর তাকেই সার্থক ক'রে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজের কর্ম গ্রহণ ক'রে, এবারে অবশ্য অধ্যক্ষ হিসেবে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রদত্ত 'প্রতিবেদন' আর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তার ওপর রচিত একটি স্মারকলিপিতে তাঁর সেই প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও স্বরূপ সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'Notes on Sanscrit College' নামে যে স্মারকলিপিটি বিদ্যাসাগর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র কাছে পেশ করেছিলেন, তার ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে তিনি তাঁর আগের প্রতিবেদনগুলির বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই স্মারকলিপিটির প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদকে তাঁর শিক্ষাদর্শের 'প্রস্তাবনা' ব'লে গ্রহণ করা যায়। প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে নবশিক্ষা আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যটি বিবৃত ক'রে তিনি লিখেছিলেন,

'The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.' অর্থাৎ, যাঁদের ওপর বাংলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে, একটি উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এবং অন্যান্য প্রাচ্য কলেজগুলির শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রতিবেদনের উত্তরে 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল'-এর অনুমোদনক্রমে 'কোর্ট অফ ডিরেকটার্স' ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন,

১ Education Consultation, 29. 1. 1851, No. 3

'হিন্দু কলেজ (অর্থাৎ, সংস্কৃত কলেজ) স্থাপনার প্রস্তাবের পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ক্ষেত্রেও, দ্বিবিধ উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল: প্রথমতঃ, এদেশে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদান ক'রে ভারতীয়দের মনে আমাদের অনুকূলে একটি প্রবণতা সৃষ্টি করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় শিক্ষার উন্নতিবিধান করা।'[১]

কিন্তু কোম্পানীর প্রতিনিধিরা এদেশে প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক কলেজগুলি স্থাপন করার সময় এই দু'টি মূল উদ্দেশ্যের দ্বারা বিন্দুমাত্রও যে প্রভাবিত হননি সে তথ্যও 'পরিচালক সমিতি'র অজানা ছিল না। তাই এদেশে শিক্ষাবিস্তারের সর্ববিধ প্রয়াসে উৎসাহ জানিয়েও তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,

'আমরা আশঙ্কা করছি, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধানের দিকে এখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, তাদের মূল এবং আদি পরিকল্পনাই ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। হিন্দুবিদ্যা বা মুসলমানবিদ্যা শিক্ষাদানই তাদের স্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল না, উচিত ছিল প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষাদানের চিন্তা করা।'[২]

কিন্তু তাঁদের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের দ্বন্দ্বকোলাহলে এদেশে মাতৃভাষার উন্নতিসাধন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যাপারে অনেকদিন পর্যন্ত কোন সচেতনতা ছিল না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চের সরকারী নির্দেশনামাতেও তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল না। 'জেনারেল কমিটি'র অধিবেশনে পরে এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা ক'রে বলা হয়েছিল যে, সংস্কৃত ও আরবির সঙ্গে ইংরেজির মাধ্যম নিয়ে যে সমস্যা বা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা ক'রে ইংরেজির সপক্ষে সরকারী নীতির আনুকূল্য ঘোষণার সময় মাতৃভাষা মাধ্যমের উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, সেইজন্যে বড়োলাটের নির্দেশনামায় সেকথা অঘোষিত রয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র একটি বিবাদ মীমাংসার জন্যেই বড়োলাটের নির্দেশনামার প্রয়োজন ছিল না, এদেশে সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঘোষণা করাও সে নির্দেশনামার উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতিই কেবল অনুল্লেখিত থাকেনি, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আবশ্যিকতাও স্বীকৃত হয়নি। 'জেনারেল কমিটি'র অধিবেশনে সেই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হ'লেও মধ্যবর্তী স্তরে ইংরেজি

১ Trevelyan—On the Education of the People of India.
২ Trevelyan—On the Education of the People of India.

ভাষার মাধ্যম গ্রহণের যৌক্তিকতা নির্ণয়ের ওপরই অনাবশ্যক জোর দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর স্মারকলিপির প্রথম অনুচ্ছেদেই, সেই বহুকথিত অথচ অবহেলিত উদ্দেশ্যটিকে, অর্থাৎ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচারের আদর্শটিকে, সরকারী নীতির মধ্যে অগ্রাধিকার দানের প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

এই প্রদেশের মাতৃভাষা বাংলাকে সর্ববিধ আধুনিক বিদ্যা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ'ড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়োজনের পক্ষে অবশ্য পালনীয় দু'টি সর্তের উল্লেখ ক'রে স্মারকলিপিটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

'Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.' অর্থাৎ, পাশ্চাত্য সূত্র থেকে আহৃত তথ্যকে সুন্দর, স্পষ্ট ও বাগ্‌বিধিসম্মত বাংলায় প্রকাশে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রয়াসে সে সাহিত্য কখনই গ'ড়ে তোলা যাবে না।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানসহ প্রয়োজনীয় সর্ববিধ জ্ঞানবিদ্যায় উৎসাহ প্রদানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে 'জেনারেল কমিটি' গঠিত হ'লেও কমিটির সদস্যরা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের 'কোর্ট অফ্ ডিরেকটার্সে'র ডেসপ্যাচের ভাষ্য অনুযায়ী বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিজ্ঞানের ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সুপারিশ অনুমোদনকালে 'কোর্ট অফ্ ডিরেকটার্স' কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় হিন্দু বিদ্যা বা মুসলমান বিদ্যার ওপর জোর না দিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তা অগ্রাহ্য ক'রে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে 'জেনারেল কমিটি'র উদ্যোগের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের প্রতিবাদপত্রে আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রচারের বিষয়ে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতরীতির শিক্ষাধারার দিকে বেশিদিন এদেশের মানুষের মন আকৃষ্ট ক'রে রাখা যায়নি। সংস্কৃত কলেজ তাই দিনদিন তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছিল, ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ক্রমেই ছাত্রদের ভীড় জমছিল ইংরেজি বিদ্যায়তনগুলির দ্বারে দ্বারে। এই প্রবণতার দ্বিবিধ কুফল, স্বদেশী ভাষা-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তরুণমনে ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহ এবং ইংরেজি ভাষামাত্রের শিক্ষাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণের পরিসমাপ্তি, লক্ষ্য ক'রেই বিদ্যাসাগর দুইএর মধ্যে এক প্রয়োজনীয় অথচ সুষম ও সুদূরপ্রসারী মিলন ঘটাতে চেয়ে-

ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আহরণ ক'রে সুন্দর সাবলীল সর্বভাবপ্রকাশক্ষম বিশিষ্ট স্বদেশীরীতির বাংলাভাষায় তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কামনাই সেই মিলনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। তার ফলে মাতৃভাষার প্রতি যুবমনে শ্রদ্ধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যায় তার জ্ঞান ভাণ্ডারও পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। অর্থ উপার্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় ইংরেজি ভাষার জ্ঞান তার যেমন পরোক্ষ লাভ হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণও তেমনি তাকে সর্ববিধ উন্মার্গগামিতা থেকে রক্ষা করবে। তখনও পর্যন্ত কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার শৈশবাঙ্কুরের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশের উপযোগী শক্তি সঞ্চারিত হয়নি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে তাই বিদ্যাসাগরকে তার ধারণোপযোগী বাংলা গদ্য ভাষার গঠনকার্যের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে বিদ্যাসাগর মানসের সেই অতিব্যাগ্র চেতনাটিই প্রকাশিত হয়েছে।

স্মারকলিপির তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর সুন্দর সাবলীল সর্বভাবপ্রকাশক্ষম বাংলা গদ্য সৃষ্টির মূল উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন,

An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English Language and Literature.' অর্থাৎ, সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞদের পক্ষে একটি সুন্দর, স্পষ্ট এবং বিশিষ্ট বাগ্‌বিধি সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা-রীতি গঠন করা সম্ভব নয়। তাই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম ক'রে তোলা প্রয়োজন।

বাংলাগদ্যের ভাষাদেহ নির্মাণে সংস্কৃতভাষা থেকে সাহায্যের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই উইলিয়ম কেরির বিদেশী মননের কাছে তা' ধরা পড়েছিল। সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি একদা বলেছিলেন,

'ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাসম্প্রদায় অপেক্ষা বাংলাই সংস্কৃতের অধিকতর নিকট সম্পর্কীয় ব'লে ধরা যেতে পারে। ...এই ভাষার শব্দসম্ভারের পাঁচ ভাগের চার ভাগই হোল বিশুদ্ধ সংস্কৃত। একেবারে যথাযথভাবে ভাবপ্রকাশের জন্যে অসংখ্য শব্দসৃষ্টির সাবলীল ক্ষমতাই তার শব্দপ্রাচুর্যের বিশেষ কারণ।'[১]

বাংলাগদ্যে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন,

'সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা, এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়-দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্বোত্তমা সংস্কৃতভাষাবাহুল্যহেতুক।'[১]

এই সর্বোত্তমা সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্য ও মহিমাকে বিদ্যাসাগর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন,

'এই অপূর্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি নূতন পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে সুন্দর-রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারুরূপে সঙ্কালিত হইতে পারে না।

'যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদসাধন ও প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে।'[২]

সংস্কৃত ভাষার সর্ববিধ ভাবপ্রকাশের এই অসামান্য ক্ষমতাকে প্রাচীন দর্শন ও শাস্ত্র আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে বিদ্যাসাগর তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন আধুনিক জীবনের সর্বাধিক চেতনা ও চিন্তাধারার উদারতর মানসভূমিতে। সংস্কৃতভাষার সার্থক উত্তরসূরী বাংলাভাষার মধ্যে সংস্কৃতের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চারিত ক'রে দিয়ে পূর্বভারতের এই বিশাল জনপদের ভাষাকে তিনি আধুনিক বিশ্বের সমৃদ্ধতম ভাষাগুলির সমকক্ষ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই সমৃদ্ধ বাংলাভাষা সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান সর্ত হিসেবে তিনি সংস্কৃতভাষায় উত্তম জ্ঞান অত্যাবশ্যক ব'লে মনে করেছিলেন। আবার কেবলমাত্র সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হ'তে হবে। কারণ, সংস্কৃতভাষা সেখানে নবগঠিত বাংলাগদ্য ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার সেখানে তার ভাবদেহ গড়ে তুলবে।

১ প্রবোধ চন্দ্রিকা
২ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'

বাংলাগদ্যের প্রকাশসৌষ্ঠব বর্ধনে ও ভাবদেহ নির্মাণে সংস্কৃত ও ইংরেজির প্রাথমিক গুরুত্বের অনুপাত নির্ণয় ক'রে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত এবং ইংরেজি অধ্যয়নের ভিন্নমুখী উদ্দেশ্য এবং প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করার পরই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের সার্থকতা নির্ণয় ক'রে চতুর্থ অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন ;

'Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanscrit their after study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.' অর্থাৎ, অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র ইংরেজিতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁদের বক্তব্য সুন্দর এবং বাগ্বিধিবিশিষ্ট বাংলায় প্রকাশ করতে একেবারে সম্পূর্ণভাবে অপারগ। তাঁরা এতোদূর পর্যন্ত ইংরেজিভাবাপন্ন যে, পরবর্তীকালে সংস্কৃতে পাঠ গ্রহণ করলেও বাগ্বিধিবিশিষ্ট এবং সুন্দর বাংলারীতিতে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বাক্যকথনপ্রণালী, প্রকাশভঙ্গী, লেখনপ্রণালী এবং ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক অথচ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্কৃত থেকেই বাংলাতে বিবর্তিত হ'য়ে এসেছে। সেই বিবর্তনধারাটি অনুসরণ ক'রে সংস্কৃতভাষার অফুরন্ত ঐশ্বর্যসম্ভারকে বাংলাভাষায় আনয়ন করার পথটি যদি আবিষ্কার করা যায়, তা'হলে বাংলার ভাষাদেহ থেকে আঞ্চলিকতার অভিশাপ ঝেড়ে ফেলে তাকে একটি অভিজাত আধুনিক ভাষায় পরিণত করা যাবে। কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করতে হ'লে সুদূর অতীতের প্রাথমিক পর্যায়ের ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যভাষার দ্বারস্থ হ'তে হবে। কাল ও স্থানগত দূরত্বের জন্যে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার ঐক্য বা সাদৃশ্য আবিষ্কার প্রচেষ্টা তাই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। ভাষার বিচারে বাংলার ওপর ইংরেজির প্রভাবের কোন নিদর্শন নেই। কিন্তু ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে আধুনিক জীবনচেতনার দুকূল ছাপানো যে জোয়ার মানুষের জীবনতটকে প্লাবিত ক'রে নিয়ে গেছে, তার প্রভাবকে অস্বীকার ক'রে কোন জাতিরই আজ মুক্তি নেই। তাই সার্থক ভাবসম্পদ আহরণের জন্যেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সম্যক

জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু বাংলা বা সংস্কৃতভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ইংরেজি ভাব সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজির ভাষাবৈশিষ্ট্য-গুলি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায় যে, তাদের পক্ষে সেগুলি বাংলায় সুন্দর-ভাবে ভাষান্তরিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাংলার ভাষাবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পূর্বাহ্নেই পরিচিত থাকলে ইংরেজির ভাবসম্পদ তাঁদের চিত্তকে উদ্বেজিত ক'রে তুলে বাংলাভাষার বিশিষ্ট প্রকাশরীতিকে আশ্রয় করতে পারে।

ভাষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি অপেক্ষা সংস্কৃতের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী হ'লেও বিদ্যাসাগর তাঁর চরম উদ্দেশ্য কখনও বিস্মৃত হননি। তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল কথা ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি মুক্তবুদ্ধি উদারহৃদয় সচেতন বাঙালী জাতি সৃষ্টি করা, আর বাংলা-ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে সেই স্বপ্ন গ'ড়ে ওঠায় অতি স্বাভাবিকভাবেই ভাষা-কেন্দ্রিক একটি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো। পরজাতিবিদ্বেষের কলুষের সঙ্গে এই জাতীয়তাবোধের কোন সম্পর্ক নেই, মানবতার উদার অমৃতস্পর্শে তার উদ্ভব আর তার মধ্যেই তার চরম সার্থকতা। তাই ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে, ইংরেজি থেকে নব নব উন্মেষশালিনী ভাবসম্পদ আহরণ করতে হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের সর্বপ্রান্তে তাদের ছড়িয়ে দিতে হবে, আধুনিক মানবতাবাদী বিশ্বমুখীন একটি বাঙালী জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। সেই সম্ভাবনারই স্বপ্ন দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর সামগ্রিক শিক্ষাপরিকল্পনাটির মধ্যে। স্মারকলিপির পঞ্চম অনুচ্ছেদে আছে তারই আভাস,

'It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.' অর্থাৎ, এখন এটা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ক'রে তোলা যায়, তারা একটি সুসমৃদ্ধ বাংলাসাহিত্যের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ বা শিক্ষাদর্শনের এইগুলিই হোল মূল প্রস্তাবনা। এইগুলিকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলার পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনার রূপায়ণেই শিক্ষাশাস্ত্রী হিসেবে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছিল।

৪

সহকারী সম্পাদক হিসেবে একসময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সমগ্র শিক্ষাকালকে, জুনিয়ার ও সিনিয়ার, এই দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। জুনিয়ার বিভাগে ছিল ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার—এই তিনটি শ্রেণী আর সিনিয়ার বিভাগে ছিল বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও গণিত শ্রেণী। সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু তিনি সেবার শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে কিছুই করতে পারেননি। অধ্যক্ষ হিসেবে নিজের পরিকল্পিত শিক্ষাদর্শকে কাজে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তাই প্রচলিত রীতিকে আগে সংস্কার ক'রে নিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রারম্ভিক ব্যাকরণশ্রেণীই ছিল সবচেয়ে দুরূহ। কলেজ স্থাপনাবধি ব্যাকরণ শ্রেণীতে তাই বহুবার নানারকম পরিবর্তন করা হলেও নবপাঠার্থী বালকদের কাছে তা সামান্যতমও আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠেনি। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে একটি মুগ্ধবোধ শ্রেণী ও একটি পাণিনি শ্রেণী নিয়ে ব্যাকরণ বিভাগের গোড়াপত্তন হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে মুগ্ধবোধের দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নভেম্বর তৃতীয় শ্রেণী প্রবর্তিত হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে পাণিনি শ্রেণী বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লেও 'মুগ্ধবোধ' একটুও সুবোধ্য হ'য়ে ওঠেনি। তাই ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তার চতুর্থ শ্রেণী এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে পঞ্চম শ্রেণীর প্রবর্তন হয়। মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্যতাই বছরের পর বছর অধ্যাপনাকাল বাড়ানোর একমাত্র কারণ ছিল। তাই মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্যতা কিছুটা পরিমাণে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্যে বিদ্যাসাগরকে চিন্তা করতে হয়েছিল। তিনি ঠিক করেছিলেন এরপর সংস্কৃত কলেজে পড়তে এসে প্রথমেই মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্যতার মধ্যে প্রবেশ না ক'রে নবপাঠার্থী বালকেরা সহজবোধ্য বাংলাভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সূত্র শিক্ষা করবে। তারপর তারা দু'তিনটি পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করবে। এই পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সঙ্কলন করতে হবে। প্রথম দু'বছরে এই জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারলেই তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার মতো সে যুগে কোন বই ছিল না। তাই বিদ্যাসাগরকেই পরিকল্পনা মতো গ্রন্থও রচনা করতে হয়েছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'। প্রায় একই সঙ্গে 'ঋজুপাঠ' নামে তিনখণ্ড সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ক্রমে

ক্রমে উচ্চতর ব্যাকরণের আকর-গ্রন্থ 'ব্যাকরণ কৌমুদী-'র চারটি ভাগও প্রকাশিত হয়। পাঠ্যগ্রন্থের অভাব মেটার পর জুনিয়ার বিভাগের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হোল,

'সংস্কৃত কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট ছাত্রেরা প্রথম বৎসরে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ পাঠ করিবেক। দ্বিতীয় বৎসর, ব্যাকরণ কৌমুদী ও ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ। এই সকল পাঠ করিয়া, ব্যাকরণে একপ্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, এবং সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে সিদ্ধান্ত কৌমুদী, ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ এবং রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পাঠ করিবেক।'[১]

বিদ্যাসাগর সাহিত্য এবং অলঙ্কার শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থের কোন পরিবর্তন করেননি। কেবলমাত্র সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলির অধ্যাপনার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন এনে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছিলেন। জ্যোতিষ শ্রেণীর গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁকে আবার ব্যাকরণশ্রেণীর মতই আমূল সংস্কার করতে হয়েছিল। প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতি রদ ক'রে দিয়ে তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিক বিষয়ে ইংরেজি থেকে সঙ্কলন ক'রে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়, হর্শেলের জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদের সুপারিশ করা হয়; তাছাড়া উচ্চতর গণিতের বিভিন্ন শাখার অনুবাদ ক'রে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়।

জুনিয়ার বিভাগে এমনি ক'রে অধিকাংশ সময় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্যে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা ক'রে, সিনিয়ার বিভাগে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অধ্যাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে বিদ্যাসাগর প্রথমেই ইংরেজি বিভাগটির আমূল সংস্কার করতে উদ্যোগী হলেন।

সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কয়েক বছরের মধ্যেই ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সেখানে একটি ইংরেজি বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগর নিজে সেই ইংরেজি বিভাগে অধ্যয়ন ক'রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'জেনারেল কমিটি' হঠাৎ সেই ইংরেজি বিভাগ বন্ধ ক'রে দেন। 'জেনারেল কমিটি'র সেই সিদ্ধান্তে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গোঁড়া প্রাচীন-পন্থীরা সন্তুষ্ট হ'লেও সাধারণ ছাত্র অভি-ভাবকেরা ক্ষুণ্ণই হ'য়েছিলেন। ছাত্ররা যে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'জেনারেল

১ বিজ্ঞাপন, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

কমিটি'র কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। সে সময় ছাত্রদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেও ইংরেজি বিভাগ পুনঃপ্রবর্তনের ক্রমবর্ধমান দাবী 'জেনারেল কমিটি' বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। তাই ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আবার ইংরেজি বিভাগ প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু পুনঃপ্রবর্তিত হ'লেও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে ইংরেজি বিভাগ ছাত্রদের বিশেষ কোন উপকারে আসছিল না। ইংরেজি পাঠ সংস্কৃত কলেজে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়রূপে বিবেচিত হওয়াতে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রই ইংরেজি পড়তে আসতো। আবার তারা যখন ইচ্ছা পড়তে আসতো এবং যখন ইচ্ছা ছেড়েও যেতো। এইসব কারণেই ইংরেজি বিভাগের উন্নতির কোন আশা ছিল না। এইসব কারণেই 'জেনারেল কমিটি' একবার ইংরেজি বিভাগ তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং এইভাবে চলতে থাকলে আবার তুলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে, ইংরেজিবিভাগকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর স্থাপন ক'রে, সংস্কৃত কলেজকে পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণের উপযুক্ত আধার হিসেবেই বিদ্যাসাগর গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ইংরেজিবিভাগের পুনর্গঠনকল্পে তিনি কয়েকটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এরপর ঠিক হোল,

(১) সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা অধিকার অর্জন করার আগে কোন ছাত্র ইংরেজি শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(২) একটি বিশেষ সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্ররা একই ধরণের ইংরেজি পাঠক্রম অনুসরণ করবে।

(৩) ইংরেজিশিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য না ক'রে আবশ্যিক বিষয় ব'লে গ্রহণ করতে হবে।

(৪) কোন ছাত্র ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক হ'লে সংস্কৃতশিক্ষার পরবর্তী কোন স্তরেই সে আর ইংরেজি শ্রেণীতে প্রবেশ করবে না ব'লে তাকে আগেই জানিয়ে দিতে হবে, কারণ একজন ছাত্রের জন্যে পৃথক একটি শ্রেণী স্থাপন করা কখনও সম্ভব নয়।

এই ব্যবস্থাগুলিকে ফলপ্রসূ ক'রে তোলার জন্যে বিদ্যাসাগর কয়েকটি উপায় নির্দেশ করলেন। সাহিত্য শ্রেণীতে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটেছে ব'লে ধ'রে নিয়ে তিনি অলঙ্কার শ্রেণী থেকে ইংরেজি পাঠ সুরু করাতে চাইলেন। এর ফলে; ইংরেজির জন্যে ছাত্রদের বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হোত এবং কিছুটা মানসিক পরিমার্জনা লাভ করার

ফলে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে তারা ইংরেজির প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে পারতো। এর পরবর্তী সাত আট বছরে অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাকালের শেষ বছর পর্যন্ত ইংরেজিপাঠের ফলে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একজন ছাত্রের পক্ষে একটা মোটামুটি ধারণা গ'ড়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার ব'লে বোধ হোত না।

ইংরেজিবিভাগের আমূল সংস্কারের পর বিদ্যাসাগর স্মৃতিশ্রেণীকে ধর্মের আবরণ মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। স্মৃতিশাস্ত্র হিন্দুসমাজে সাধারণভাবে 'ধর্মশাস্ত্র' নামে পরিচিত। হিন্দুর ধর্মচেতনা সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে এই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিবিধান পালনেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। এর ফলে ধর্মচেতনার যেমন অবনতি ঘটেছিল, স্মৃতিশাস্ত্রও তেমনি অনাবশ্যক গুরুত্ব লাভ করেছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রকে সাধারণ হিন্দু আইন হিসেবেই গ্রহণ করার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। 'মনুসংহিতা'-কে শাস্ত্র গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ না ক'রে তিনি হিন্দু আইনের আকর গ্রন্থ ব'লে প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে 'মনুসংহিতা' ছিল সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় এবং অর্থশাস্ত্রবিষয়ক নিয়মালীর সঙ্কলন মাত্র। তাই 'মনুসংহিতা'র পাঠ প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' উত্তরাঞ্চলের হিন্দু সমাজের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের প্রামান্য গ্রন্থ ছিল। বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি' বিহার অঞ্চলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সঙ্কলন গ্রন্থ ছিল। জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' বাংলাদেশের উত্তরাধিকারবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল। 'দত্তক মীমাংসা' উত্তর ভারতের আর 'দত্তক চন্দ্রিকা' বাংলাদেশের পোষ্যপুত্র গ্রহণ ও তাদের দেওয়ানী অধিকার-বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। ভারতের সর্বপ্রান্তের হিন্দু আইনের আকর এই গ্রন্থগুলিও 'মনুসংহিতা'র সঙ্গে স্মৃতিশ্রেণীতে পাঠের ব্যবস্থা ছিল। এগুলির অধ্যয়ন বন্ধ না করলেও, বিদ্যাসাগর, যাজন ব্যবসায়ী পুরোহিতদের জন্যে প্রয়োজনীয় রঘুনন্দনের 'অষ্টবিংশতিতত্ত্বে'র অধ্যাপনা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।

স্মৃতিশাস্ত্রকে বিদ্যাসাগর যেমন ধর্মের আবরণ মুক্ত করেছিলেন, 'ন্যায়'-কেও তেমনি একদেশদর্শিতার দোষ মুক্ত করেছিলেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ছয়টি বিভিন্ন শাখার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমে কেবলমাত্র 'ন্যায়দর্শনে'র ওপর জোর দেওয়াতে ছাত্রদের সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারণা গ'ড়ে উঠতো না। বিদ্যাসাগর তাই 'ন্যায় শ্রেণী'র নাম পালটে 'দর্শন শ্রেণী' রেখেছিলেন এবং কেবলমাত্র 'ন্যায়দর্শনে'র পরিবর্তে, এমনভাবে সমগ্র ষড়দর্শনের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে

স্বচ্ছ জ্ঞানের পরিবর্তে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে কুসংস্কারের কোন ছায়া না পড়ে।

দর্শন শ্রেণীতে প্রবেশের পূর্বে ছাত্রদের ইংরেজি ভাষায় যে জ্ঞান লাভ হবে, তার সাহায্যেই তারা পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু গ্রন্থ অন্তত পড়তে ও বুঝতে পারবে মনে ক'রে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু গ্রন্থও তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

কেবলমাত্র ন্যায়দর্শনের পরিবর্তে সমগ্রভাবে ভারতীয় ষড়দর্শনের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করার পিছনে বিদ্যাসাগরের একটি বিশেষ মনোভাবই কার্যকরী ছিল। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার প্রবক্তারা নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে অন্যান্য শাখার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে আলোচনা করেছেন, সেগুলি পাঠ করলে কোন একটি বিশেষ শাখার বা সমগ্রভাবে ভারতীয় দর্শনের সম্বন্ধে কোন অন্ধ বিশ্বাস গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। তার ওপর পাশ্চাত্য দর্শন পাঠের যোগ্যতা জন্মালে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের একটা তুলনামূলক আলোচনা বিশ্বদর্শনের মূল তত্ত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে একটা সুস্থ ধারণা গ'ড়ে তুলে দর্শন পাঠের সার্থকতা প্রতিপন্ন করবে।

সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাবিধির এই আমূল সংস্কারের পিছনে বিদ্যাসাগরের যে উদ্দেশ্যে কার্যকরী ছিল, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে স্মারকলিপির ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছিলেন,

'The students of the Sanscrit College while they are in the Grammar and Literature classes, should direct there attention principally to Sanscrit studies devoting two-thirds of the time to the Sanscrit and one-third to the English. When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two thirds of the time to this important branch of Education.' অর্থাৎ, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে প্রধানতঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ ক'রে দুই-এর তিন ভাগ সময় সংস্কৃত এবং একের তিন ভাগ সময় ইংরেজি পড়বে। অলঙ্কার স্মৃতি এবং দর্শন শ্রেণীতে পাঠের সময় তাদের প্রধান আকর্ষণ ইংরেজির দিকে ঘুরিয়ে শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার জন্যে দুই-এর তিন ভাগ সময় নির্দিষ্ট করতে হবে।

সংস্কৃত কলেজে, স্বাভাবিকভাবেই, চিরদিন সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সিনিয়ার বিভাগে সংস্কৃতের সেই প্রাধান্য খর্ব ক'রে তুই-এর তিন ভাগ সময় ইংরেজির চর্চা ক'রতে হ'লে ইংরেজি বিভাগের মধ্যে যে কিরকম পরিবর্তন আনা দরকার তা সহজেই অনুমান করা চলে। বিশেষভাবে যে সংস্কৃত কলেজে বহুকাল যাবৎ ইংরেজির কোন প্রবেশাধিকার ছিল না এবং যখন সে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তখনও তাকে ঐচ্ছিকের গণ্ডী পেরোতে দেওয়া হয়নি, সেখানে পরিকল্পনার সঙ্গে তাল রেখে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন তো একটা বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য। এই বিপ্লব সাধন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে বৈপ্লবিক কর্মসূচীই অনুসরণ করতে হয়েছিল। এ বিপ্লব এক দিকে যেমন ছিল প্রাচীনপন্থী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে অন্যদিকে তেমনি ছিল আধুনিকতার ধ্বজাধারী, তথাকথিত শিক্ষানুরাগী ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ সরকারের প্রজানুরঞ্জন প্রয়াসের আপাত আড়ম্বরের মধ্যে সযত্ন গুপ্ত বণিক মনোবৃত্তির নির্লজ্জ রূপটি সে যুগের মনিষিকুলের মধ্যে তিনিই প্রথম যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে এদেশে রাজপাট গ'ড়ে তোলার পিছনে কোন মানবতাবাদী প্রেরণা ইংরেজকে অনুপ্রাণিত করেন, অর্থোপার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল তাদের সর্বকর্মের উৎস। তাই সমাজকল্যাণ, জনশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজকর্মচারীরা যতোই পরিকল্পনা বা বক্তৃতা করুন না কেন, তাঁদের সব রকম কাজই নিয়ন্ত্রিত হোত আর্থিক দায়-দায়িত্বের সীমাবদ্ধতার দিকেই দৃষ্টি রেখে। এই ধরণের উপনিবেশবাদী সরকারের কাছ থেকে মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া কোন কল্যাণকর পরিকল্পনাতেই সাহায্য বা উৎসাহ আশা করা বৃথা, বিশেষ ক'রে সেই সাহায্য বা উৎসাহের সঙ্গে যদি আর্থিক দায়দায়িত্বের যোগ থাকে তাহলে তা কথাই নাই। তাই যে কোন পরিকল্পনায় বাহ্যিক আড়ম্বরের যতোই বাহুল্য ঘটুক না কেন কতোটা স্বল্প ব্যয়ে সেই পরিকল্পনার একটা যেমন-তেমন রূপ খাড়া ক'রে তোলা যায়, সেদিকেই ছিল তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সেদিন স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্যবোধের উন্মেষের বহু পূর্বে ইংরেজের এই জন বিরোধী নীতির প্রতিবাদে কোন গণ-বিক্ষোভ গ'ড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, যে কোন প্রতিবাদই ব্যক্তি বিদ্রোহ অথবা স্বেচ্ছানির্বাসনে পর্যবসিত হ'তে বাধ্য ছিল আর তার ফলে ব্যক্তিমহিমার যেমনই চূড়ান্ত বিকাশ ঘটুক না কেন, সামগ্রিকভাবে সমাজের কোন কল্যাণ সাধিত হোত না। তাই সেপথে না গিয়ে বিদ্যাসাগর সমাজে কল্যাণের

জন্যে কাজ করতে চেয়েছিলেন, বিদেশী সরকারে অনিচ্ছুক বদ্ধমুষ্টির ফাঁক দিয়ে যেটুকু দাক্ষিণ্য ঝরে পড়েছিল, তাকেই মূলধন ক'রে যতোটুকু সাধ্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগের পুনর্গঠনের জন্যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর একটি পৃথক প্রতিবেদনে তিনি রাজ্যসরকারের কাছে যে সুপারিশ প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে এই মনোবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটেছে দেখতে পাই। এই প্রতিবেদনে বিদ্যাসাগর মাতৃভাষাশ্রয়ী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বিত চূড়ান্তরূপের স্বরূপ অথবা প্রকৃতি নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। সরকার অনুমোদিত বার্ষিক অনুদানের মধ্যেই কেমন ক'রে তাঁর নতুন বিধিব্যবস্থার প্রচলন করা সম্ভব, অত্যন্ত নিপুণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারই আলোচনা করেছেন মাত্র।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যাসাগর ইংরেজিবিভাগের জন্যে পাঁচজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার হিসেব দিলেন। ইংরেজি সাহিত্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতের দুজন শিক্ষকের মাসিক বেতন হবে একশো টাকা হিসেবে; এছাড়া প্রথম নিম্নশিক্ষক মাসিক আশি টাকা হিসেবে, দ্বিতীয় নিম্নশিক্ষক মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসেবে এবং তৃতীয় নিম্নশিক্ষক মাসিক ত্রিশ টাকা হিসেবে বেতন পাবেন। এ-বিষয়ে সর্বসমেত খরচ হবে তাই মাসিক তিন শো ষাট টাকা। নতুন নিয়মে সংস্কৃত পদ্ধতির গণিত শিক্ষার অবলুপ্তি ঘটলে জ্যোতিষশিক্ষকের মাসিক বেতনের সাশ্রয় হবে। কর্মরত তিনজন ইংরেজি শিক্ষক এবং এই একজন জ্যোতিষ শিক্ষকের পরিবর্তে পাঁচজন ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ করলে সরকারের মাসিক আটাত্তর টাকা মাত্র বেশি খরচ হবে। এই পাঁচজন ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে একজন মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের নিম্ন সংস্কৃত শ্রেণীর শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বিদ্যাসাগর হিসেব দিলেন, এই বাড়তি দায়িত্বের জন্যে মাসিক একশো আট টাকা হিসেবে সরকারকে বৎসরে বারোশো ছিয়ানব্বই টাকা খরচ করতে হবে। এই বাড়তি খরচের জন্যেও সরকারকে বিব্রত হ'তে হবে না। সংস্কৃত কলেজের জন্যে নির্ধারিত বার্ষিক চব্বিশ হাজার টাকার অর্থবরাদ্দের মধ্যেই তার সংস্থান হ'য়ে যাবে। কারণ কোন বছরই সংস্কৃত কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশ হাজার টাকা খরচ পড়ে না, প্রতি বছরই তিন চার হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে এবং আইন অনুযায়ী সেই উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা চলবে না। অতএব, তাঁর নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংরেজি বিভাগের পুনর্গঠন করা হ'লে সরকারকে কোন বাড়তি অনুদানের দায়িত্ব নিতে হবে না, স্থাপনাবধি যে চব্বিশ হাজার টাকার ব্যয় সংস্কৃত কলেজের

জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার মধ্যেই সমস্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কুলান হয়ে যাবে।

আর্থিক দায়দায়িত্বের মীমাংসা হ'লেই চলবে না, ইংরেজ প্রভুদের যেন কোন ক্রমেই সন্দেহ না জাগে যে এদেশীয় এক ব্যক্তি অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র এবং উন্নত একটি ব্যবস্থা চিন্তা ক'রে ফেলেছে, তার দিকেও নজর দিতে হবে। বিদ্যাসাগর সে ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন দেখতে পাই। এদেশে ইংরেজি শিক্ষাপ্রচারের পদ্ধতির সম্বন্ধে ইংরেজ কর্মকর্তাদের একটি প্রিয় তত্ত্ব ছিল, তাঁরা সেটির নামকরণ ক'রেছিলেন 'উধ্বর্পাতন তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁরা কল্পনা করেছিলেন এদেশের সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানদের যদি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়, তা'হলে তারাই সেই পাশ্চাত্যবিদ্যাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের গভীরতম স্তরে পৌঁছে দেবে। তাঁর নবপ্রবর্তিত শিক্ষাসংস্কার এই 'উধ্বর্পাতন তত্ত্বে'রই ভিত্তি প্রস্তুত করবে ব'লে ঘোষণা ক'রে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্যবাদী ইংরেজ মহাপ্রভুদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন,

'I further beg leave to observe that if an extended and improved system of vernacular education in Bengal be carried out and the Sanscrit Collage be regarded in the light of a Normal School to meet the increased demand for a higher order of Bengali teachers that will arise, it will be unable to meet this demand without a considerable extension of its present classes'. অর্থাৎ, 'আমি আরও জানাতে চাই যে, যদি বাংলাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটি বিস্তৃত ও উন্নত নিয়মবিধি অনুসরণ করতে হয়, এবং ক্রমবর্ধমান উন্নত বাংলা শিক্ষকের চাহিদা মেটাতে সংস্কৃত কলেজকে যদি একটি নর্মাল স্কুল হিসেবে গ্রহণ করা হয়, বর্তমান শ্রেণীগুলির সম্প্রসারণ ভিন্ন সেই চাহিদা কোনক্রমেই মেটানো যাবে না'।

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব বিদ্যাসাগর ঠিকমতোভাবে কার্যে রূপায়িত করতে পারছেন কিনা সে-বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ঘুচলো না। ভারতীয় ব'লে বিদ্যাসাগরের ওপর কোনদিনই তাঁরা পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেননি। এমন কি, বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষপদে নিয়োগও ঘটেছিল, তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়, ইংরেজদের মধ্যে উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল ব'লে। বিদ্যাসাগরের অতিপরিচিত ডঃ ময়েটও কাউন্সিল

অফ এডুকেশনে'র সেক্রেটারী হিসেবে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী গ্র্যান্টকে সেই কথাই জানিয়েছিলেন,

'ডঃ স্প্রেঙ্গার যেমন আরবিতে পণ্ডিত, তেমনি সংস্কৃতজ্ঞ কোন ইউরোপীয়কে পাওয়া গেলে, কাউন্সিল সংস্কৃত কলেজের প্রধান হিসেবে তাঁরই নিয়োগ পছন্দ করতেন। কিন্তু সে-বিষয়ে এখন কোন প্রশ্নই নেই ব'লে কাউন্সিল যে সুযোগ পাওয়া যায় তাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।'[১]

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের যোগ্যতাই সেই সুযোগ আর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই সুযোগ গ্রহণে কাউন্সিলের অসহায় বাধ্যবাধকতাই হোল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের নিয়োগ। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাকে বাধ্য হ'য়ে অধ্যক্ষ নিয়োগ করতে হয়েছিল, শিক্ষা বিষয়েও এতো বড়ো একটা পরিকল্পনা তিনি যথার্থভাবে রূপায়িত করতে পারবেন ব'লে কাউন্সিল যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তাই বিদ্যাসাগরের কাজ পরিদর্শন করার জন্যে তাঁরা বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালান্টাইনকে আমন্ত্রণ জানালেন।

কিন্তু, কাউন্সিলের মতে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হ'লেও, ডঃ ব্যালান্টাইন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্য সামান্যতমও বুঝতে পারেননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার সমন্বয় বলতে তিনি মনে করেছিলেন দুই দেশের বিদ্যায় সমান দক্ষতা অর্জন পূর্বক পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা মাত্র। তাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-বিদ্যার মধ্যে সাম্য আবিষ্কারে উৎসাহিত ক'রে তোলাই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য-সূচীর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব'লে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, বিদ্যাসাগর ব্যালান্টাইনের এ মত গ্রহণ করতে পারেননি। ব্যালান্টাইনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে তিনি 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র সেক্রেটারী ডঃ ময়েটকে লিখেছিলেন,

'Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled, if supported and encouraged by the

১ Education Consultation, 29.1.1851, No 3.

Council, to furnish you with a body of youngmen who will be better qualified by their writings and teaching to diseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the Educated eleves of any of your Colleges whether English or Oriental'.[১] । অর্থাৎ, মাতৃভাষার পূর্ণ অধিকারলাভের মুখ্য উদ্দেশ্যে আমাকে সংস্কৃত শেখাতে দিন, তার ওপর ইংরেজিভাষার মাধ্যমে গভীর জ্ঞান লাভের সুযোগ দিতে দিন আর তার ফলে আপনি নিশ্চিত হ'তে পারেন যে, কাউন্সিলের সহায়তা ও উৎসাহ সাপেক্ষে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমি এমন একদল তরুণকে তৈরি করতে পারবো, যারা তাদের গ্রন্থরচনা ও অধ্যাপনার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এমন জ্ঞানগর্ভ তথ্য বিতরণ করবে যা এতাবৎ—ইংরেজি অথবা প্রাচ্য—আপনার কোন কলেজের শিক্ষিত ছাত্রদের কর্মপ্রয়াসের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যাসাগরের এই আপোষহীন জেদ ও তীব্র উদ্দেশ্যমুখীনতার কাছে নতি স্বীকার ক'রে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' তাঁর সংস্কার প্রয়াসকে মেনে নিলেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর মাতৃভাষায় গদ্য সৃষ্টি ও সেই গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞানকে দেশের মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেবার সাধনায় মেতে উঠলেন। বাংলাদেশের বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণকে জ্ঞানভারতীর আধুনিক কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য যেমন তাঁর সে সাধনায় প্রেরণা দান করেছিল, তেমনি ভাষাকেন্দ্রিক একটি বাঙালী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পরোক্ষ উদ্দেশ্যও হয়তো বা তাঁর অবচেতন মনে সামান্যতম ঢেউ তুলেছিল। বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারাই বাঙালী, সেই বাঙালী যদি তার মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্বদর্শনের সুযোগ পায় তাহ'লে, মানবতার উদার আলোকে সে যেমন যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হ'য়ে উঠবে, ঠিক তেমনি মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই অমৃতলোকের আস্বাদ পেয়ে সে মাতৃভাষাকেও শ্রদ্ধা করতে শিখবে, আর তখনই সে প্রকৃত অর্থে, বাঙালী হ'য়ে উঠবে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাসাধনার তাই মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষাকে কেন্দ্র ক'রে একটি বিশ্বমুখীন বাঙালী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করা, সেই জাতীয় চেতনার আলোকে বাঙালীর

১ Letter, dt. 5.10.1853, to the Secretary, Council of Education Department Records, Govt. of West Bengal.

জীবনকে বিশ্বমন্ত্রে অভিষিক্ত করা, বাংলার মানুষকে যথার্থ মানুষ ক'রে তোলা, সার্থক মানুষ ক'রে তোলা।

সংস্কৃত ও ইংরেজির ওপর আনুপাতিক গুরুত্ব দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য যে মাতৃভাষার উন্নতিসাধন তারই ভূমিকা রচনার জন্যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য তালিকায় বাংলাও অন্তর্ভুক্ত করলেন। জুনিয়ার বিভাগের জন্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুও তিনি নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন,

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণী—জীবজন্তুবিষয়ক চিত্তাকর্ষক গল্প।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী—চেম্বার্সের 'এডুকেশনাল কোর্স'-এর অনুসরণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের গল্প প্রবন্ধ।

ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণী—চেম্বার্সের অনুসরণে নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ।

ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণী—মুদ্রণশিল্প, চুম্বক, নৌ-চলাচল, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনের প্রাচীর, মৌমাছি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের গ্রন্থ।

সাহিত্য শ্রেণী—চেম্বার্সের অনুসরণে মহাপুরুষ-জীবনী; টেলিমেকাস, রাসেলাস, মহাভারত প্রভৃতি থেকে সঙ্কলিত এবং অনূদিত চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় নানা বিষয়।

অলঙ্কার শ্রেণী—নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন রচনা এবং প্রকৃতি দর্শনের কোন সহজবোধ্য গ্রন্থ।

বিষয়বস্তু ঠিক করলেও সেই বিষয়ের গ্রন্থ সে যুগে পাওয়া যায়নি। তাই তাঁকেই গ্রন্থরচনারও ভার নিতে হয়েছিল। চেম্বার্সের 'রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজ' অবলম্বনে তিনি লিখেছিলেন 'বোধোদয়', 'বায়োগ্রাফী' অবলম্বনে 'জীবনচরিত'। মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগেরও অনুবাদ করেছিলেন। 'মরাল ক্লাশ বুক' অবলম্বনে 'নীতিবোধ' রচনা সুরু করলেও সময়াভাবে শেষ করতে পারেননি, পরে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে শেষ করান। পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তাঁর সুপারিশ তাই কেবল কথার কথা হ'য়েই থাকেনি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অমানুষিক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তার সাফল্যের পথও প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্দেশ এবং সেই বিষয়বস্তু অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি বাংলা গ্রন্থ পঠনের সুপারিশ ক'রে লিখেছিলেন,

'কাউন্সিল যদি বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা অনায়াসেই বাংলাতে খুব দক্ষতা অর্জন করবে এবং বাংলার মাধ্যমে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহরণ করতে পারবে, আর তার ফলেই, ইংরেজিপাঠ সুরু করার আগেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট প্রসার ঘটবে'।

৫

বাংলা গদ্যভাষা সৃষ্টি ও বাংলা মাধ্যমের শিক্ষক গ'ড়ে তোলার প্রয়াসকে সংস্কৃত কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, বিদ্যাসাগর নবসৃষ্ট সেই ভাষার মাধ্যমে, নতুন গ'ড়ে তোলা সেই শিক্ষকদের সহায়তায়, বাংলাদেশের সর্ব-প্রান্তে শিক্ষার উদার আলোক ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এবার জনশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। সুযোগও এসে গেল অভাবনীয়ভাবে এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিদ্যাসাগর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, পাদ্রী উইলিয়ম এ্যাডামকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন দিতে বললেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষাবিদদের হট্টগোলে অ্যাডামের প্রয়াস একেবারে চাপা প'ড়ে গেল; অত্যন্ত পরিশ্রম ক'রে বিভিন্ন তথ্য আহরণ ক'রে এ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদন রচনা করলেও সরকারী মহলে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষ মর্যাদা লাভ করলো না। মেকলের পরামর্শে গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ক ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সরকারী আনুকূল্যের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করার পর এ্যাডামের অনুসন্ধানের প্রতিবেদন একেবারে চাপা প'ড়ে গেল। এরপর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে জনশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকের অভাবে সে বিদ্যালয়গুলিও স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেবের সহকারী হিসেবে বাংলা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্রথম অভিজ্ঞতা ঘটে। তাঁর নতুন শিক্ষাদর্শের আলোকে সেই অভিজ্ঞতাজাত পরিকল্পনাকেই দোষ-ত্রুটি মুক্ত ক'রে বিদ্যাসাগর বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রথম সুযোগ পেলেন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লেঃ গভর্ণর হ্যালিডের জনশিক্ষা-প্রচারের সদুদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে।

বাংলাদেশে জনশিক্ষা প্রচারের এই সরকারী প্রয়াসেরও একটা গৌরচন্দ্রিকা ছিল। পাদরী এ্যাডামের অনুসন্ধানের প্রতিবেদন ও পরামর্শ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হ'লেও, নবগঠিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেঃ গভর্ণর টোমাসন, এ্যাডাম নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ ক'রেই, দেশীয় রীতির শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কার সাধন ক'রে যখন বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন, তখন কিন্তু তাতে অভূতপূর্ব ফল পাওয়া গেল। টোমাসনের এই সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে গভর্ণর জেনারেল বাংলাদেশেও সেই নীতি অনুসরণের জন্যে বিলেতের কর্তৃপক্ষের

কাছে সুপারিশ করলেন এবং সেখান থেকে অনুমোদন এসে পৌঁছোবার আগেই বাংলা সরকারকে সে-বিষয়ে মতামত জানাতে নির্দেশ দিলেন। বাংলা সরকার তখন 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র সদস্যদের মতামত চেয়ে পাঠালেন। কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ভারত সরকারের সেক্রেটারী হ্যালিডে এ-বিষয়ে যে মতামত পাঠালেন, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম লেঃ গভর্ণর নিযুক্ত হ'য়ে তিনি সেই মতামতকেই কাজে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সে ব্যাপারে সর্বাবস্থাতেই তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় অনেক দিনের, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে স্মারকলিপিটি প্রস্তুত করেছিলেন। বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই ভাববিনিময় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই হ্যালিডে তাঁর প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও সে শিক্ষা প্রচলনে তাঁর গভীর উৎসাহ দেখে হ্যালিডে তাঁকে সে-বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করতে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই পরিকল্পনা হ্যালিডেকে এতোদূর সন্তুষ্ট করেছিল যে, তিনি নিজস্ব কোন মতামত না দিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার পূর্ণ বয়ানটিই তাঁর 'মিনিটে'র সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, সাধ্যমতো সেটির রূপায়ণের জন্যেই অনুরোধ জানালেন। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটিতে বাংলা শিক্ষা প্রসারের বিচিত্র সম্ভাবনা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, আজকের যুগেও তাঁর গুরুত্ব সামান্যতমও হ্রাস পায়নি,

১। জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র উপায় ব'লে সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

২। লিখন, পঠন এবং গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষার মধ্যেই এই শিক্ষার পরিণতি ঘটলে চলবে না। শিক্ষায় সম্পূর্ণতা দানের জন্যে ভূগোল, বিজ্ঞান, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, জীবনচরিত, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং শারীরবিদ্যার অধ্যাপন প্রয়োজন।

৩। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিনভাগে আছে বর্ণপরিচয়, বানান

এবং পঠনশিক্ষা। চতুর্থ ভাগে আছে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পঞ্চম ভাগে চেম্বার্সের 'এডুকেশনাল কোর্সে'র নীতিশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(খ) পশ্বাবলী অর্থাৎ জীবজন্তুর বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(ঘ) 'চারুপাঠ' অথবা প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা।

(ঙ) 'জীবনচরিত'—চেম্বার্সের 'ইক্সেমপ্লারি বায়োগ্রাফী'র কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশাস, লিনিয়াস, ডুবাল, উইলিয়াম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্সের জীবনবৃত্তান্তের ভাবানুবাদ।

৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা আর নীতিবিজ্ঞানের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা হচ্ছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ আর কতকগুলি জীবনচরিত এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারত, গ্রীস, রোম এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস হ'লেই চলবে।

৫। একজন নয়, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দু'জন ক'রে শিক্ষক চাই। বিদ্যালয়গুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি থেকে পাঁচটি ক'রে শ্রেণী থাকবে, তাই একজন শিক্ষকের দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালানো যাবে না।

৬। যোগ্যতা এবং অন্যান্য অবস্থা বিচার ক'রে পণ্ডিতদের মাইনে কমপক্ষে ৩০.০০, ২৫.০০, অথবা ২০.০০, টাকা ক'রে ধার্য করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি রচিত হ'য়ে পাঠক্রমে গৃহীত হ'লে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০.০০ টাকা বেতনের একজন হেডপণ্ডিত রাখার দরকার হবে।

৭। কোথাও না গিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানেই শিক্ষকেরা যাতে নিয়ম মতো বেতন পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। বর্তমানে কাজের জন্যে হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারটি জেলাকে নির্বাচিত ক'রে নিতে হবে। বর্তমানে পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজন মতো সেগুলিকে চারটি জেলার মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। শহর গ্রামে সর্বত্র ইংরেজি স্কুল কলেজ থেকে দূরে এই বিদ্যালয়-গুলি স্থাপন করতে হবে। কারণ, ইংরেজি স্কুল কলেজের পাশে বাংলাশিক্ষা ঠিকমতো আদৃত হয় না।

৯। বাংলাশিক্ষার সাফল্য যেমন সুদক্ষ ও কর্মকুশল তত্ত্বাবধানের ওপর নির্ভর করে, তেমনি মেধাবী ছাত্রদের উৎসাহ প্রদানের ওপরও তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণ দেশবাসীর এখনও বিশুদ্ধ জ্ঞানোপার্জনের উদ্দেশ্য

সম্বন্ধে কোন ধারণা গ'ড়ে ওঠেনি। তাই লর্ড হার্ডিঞ্জের যে প্রস্তাব এতোদিন চাপা পড়েছিল, তাকে এখন দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা দরকার।

১০। তত্ত্বাবধানের জন্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি বিশেষভাবে কার্যকর আর অল্প ব্যয়সাধ্য হবে ব'লে মনে হয়।

১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ মাসিক ১৫০'০০ টাকা বেতনে দু'জন বাঙালী পরিদর্শক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তাঁদের একজন মেদিনীপুর ও হুগলীজেলার ভার নেবেন, অন্যজন নদীয়া ও বর্ধমানের দায়িত্বে থাকবেন। ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন করাই তাঁদের কাজ হবে।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচ ছাড়া তাকে এর জন্যে কোন অতিরিক্ত বেতন দিতে হবে না। তাই এই বাবদে বছরে ৩০০'০০ টাকার বেশী খরচ হবে না। তিনি বছরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন ক'রে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেবেন। বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকবে।

১৩। পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নির্বাচন ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান পরিদর্শকের হাতে থাকবে।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হ'লেও বাংলা স্কুলের শিক্ষক গড়ার জন্যে নর্মাল স্কুল হিসেবেও পরিগণিত হবে।

১৫। এই রকম অবস্থায় শিক্ষকদের ট্রেনিং, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নির্বাচন, শিক্ষক নির্বাচন ও সবকিছু পরিদর্শনের ভার একজনের হাতে থাকলে অনেক অসুবিধা এড়ানো যাবে।

১৬। প্রধান পরিদর্শকের মাসিক ১০০'০০ টাকা বেতনের একজন সহকারী নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক তৈরী এবং পাঠ্যপুস্তক রচনায় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে যেমন সাহায্য করবেন, তেমনি প্রধান পরিদর্শক হিসেবে তিনি বাংলা স্কুল পরিদর্শনে গেলে অস্থায়িভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে কাজ চালাবেন।

১৭। গুরুমশাইদের পরিচালিত পাঠশালাগুলি অতি অপদার্থ। অযোগ্য শিক্ষকদের হাতে পাঠশালাগুলির শোচনীয় দুরবস্থা ঘটেছে। এইসব পাঠশালা পরিদর্শন ক'রে শিক্ষারীতি সম্বন্ধে শিক্ষকদের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়াই হবে পরিদর্শকদের প্রধান কাজ। সুযোগমতো পূর্বোল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলির যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও তাঁদের কাজের মধ্যে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে পাঠশালা-

গুলি যাতে প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে সেদিকেও তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৮। এদেশী অথবা মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত যেসব স্কুলগুলি সুদক্ষ শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তাঁদের উৎসাহ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এইসব স্কুল পরিদর্শন ক'রে, কিরকম উৎসাহ দেওয়া উচিত তা পরিদর্শকেরাই স্থির করবেন।

১৯। এইসব সরকারী বিদ্যালয়ের আদর্শে শহর গ্রামের লোকদের নিজ নিজ এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করাও পরিদর্শকদের এক কাজ হবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রচারের এই সুদীর্ঘ পরিকল্পনাটি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনারই উত্তরভাগ মাত্র। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনার দ্বারা বিদ্যাসাগর বাংলাভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, একমাত্র ব্যাপক জনশিক্ষা প্রচারের মধ্যেই তার চরম রূপের বিকাশ প্রত্যাশিত ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষা প্রচারের কথাও তাঁকে চিন্তা করতে হয়েছিল। লেঃ গভর্ণর হ্যালিডের অনুরোধে রচিত দীর্ঘ রিপোর্টে সেই চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছিল।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটির ওপর হ্যালিডে যে মন্তব্য জু'ড়ে দিয়েছিলেন, তাতে নতুন কোন কথা ছিল না। অতি অযোগ্য শিক্ষকের হাতে প'ড়ে দেশীয় পাঠশালাগুলির যে দুরবস্থা হয়েছিল, তার প্রতিবিধানের জন্য ব্যবস্থা নেবার সুপারিশ ক'রে তিনি পাঠশালাগুলির আদর্শস্বরূপ কয়েকটি মডেল স্কুল স্থাপন করতে বললেন। কেবলমাত্র বলাই নয়, লেঃ গভর্ণর পদে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মডেল বিদ্যালয়ের জন্যে বিদ্যাসাগরকে স্থান নির্বাচন করতে আদেশ দিলেন। স্থাননির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে স্থানীয় লোকেদের উৎসাহের কথা বিদ্যাসাগর হ্যালিডেকে জানালেন। উৎসাহিত হ'য়ে হ্যালিডে নানা প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য ক'রে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। নতুন কাজের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষক নির্বাচন করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় লোকের অভাব দেখে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। বাংলা স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষকের সত্যিই অভাব থাকায় তাঁর মডেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করলেন। স্বতন্ত্র বাড়ি না

পাওয়ায় সংস্কৃত কলেজেই নর্মাল স্কুলের কাজ আরম্ভ হোল। অক্ষয়কুমার দত্ত তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের কেবল তত্ত্বগত জ্ঞান দান করলেই চলবে না, সেই জ্ঞান ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্যে অনুশীলনের প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে 'পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় সংযুক্ত ছিল। বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে সেটি অধিগ্রহণ করতে চাইলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় নর্মাল স্কুলটি যেমন সার্থক-নামা হ'য়ে উঠলো, মডেল স্কুলগুলিও তেমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করলো।

৬

একটি বলিষ্ঠ, প্রাণবান জাতিগঠনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বিদ্যাসাগর যে শিক্ষার আলোকে বাঙালীর মানসলোক আলোকিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, কেবলমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ না রেখে নারীজীবনেও সেই শিক্ষার আলোক সঞ্চারিত ক'রে দিতে তিনি দ্বিগুণ উদ্যমে তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অনেক আগেই এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত ক্ষীণ সচেতনতার আবির্ভাব ঘটেছিল, সর্বত্রই যেন একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত উঁকি মারছিল। বিদ্যাসাগরের কর্ম-প্রয়াসে সেই সম্ভাবনাই একটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং বাংলাদেশের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করেছিল স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের ব্যাপারও একটা চিন্তনীয় বিষয় বটে এবং সেই চিন্তার যথার্থ রূপায়ণেই জাতির জীবনে যথার্থ উন্নতির সূত্রপাত ঘটে।

'স্কুল সোসাইটি' পরিচালিত কোন কোন পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা দেবারও সামান্য ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে একযোগে পাঠাভ্যাসে তাদের কোন সুযোগ ছিল না। পিতার বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর বাড়ির মধ্যে তাদের পৃথকভাবে পড়াশুনা করতে হোত। সোসাইটির পণ্ডিত ও সহকারীরা রাধাকান্ত দেবের বাসভবনে ছেলেদের মতো তাদের পরীক্ষা নিতেন। পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাতে পারলে ছেলেদের মতোই তাদের নানারকম পুরস্কার দেওয়া হোত। কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশিদিন চলেনি। স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী সদস্যদের প্রতিকূল মনোভাবের জন্যে এই সামান্য সুযোগটিও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়।

'ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটি'র একজন সভ্য ভারতীয় নারীর দুঃখদুর্দশার

বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে একটি প্রচারপত্র বের করেছিলেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়। সেই দুঃখদুর্দশার একমাত্র প্রতিকার হিসেবে ব্যাপক 'স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচারপত্রটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই প্রচার-পত্রে ভারতীয় নারী জাতির দুঃখের কথা জানতে পেরে কয়েকজন বিদেশিনী স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে সেইবছরই একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। সোসাইটির সদস্যারা নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হ'লে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁরই উৎসাহে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'র কয়েকজন মহিলা সদস্যের আহ্বানে লণ্ডনের 'ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি' ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মিস কুক নামে একজন শিক্ষাব্রতিনীকে কলকাতায় পাঠালেন। মিস কুক কলকাতায় এসে পৌছোলে কিন্তু 'স্কুল সোসাইটি' তাঁর ভার নিতে অস্বীকার করলেন। 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' তখন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলেন। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' কলকাতায় এর আগেই কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে-ছিলেন, মিস কুক নানাস্থানে আরও আটটি স্কুল স্থাপন করলেন। বিবাহোত্তর জীবনে মিস কুক মিসেস উইলসন হবার পর, ইচ্ছা সত্ত্বেও, আগের মতো স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের জন্যে পুরোপুরি সময় দিতে না পারায় গভর্ণর জেনারেলের পত্নী লেডি আমহার্ষ্টকে সভানেত্রী ক'রে গঠিত 'লেডিস সোসাইটি' নবোদ্যমে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করলেন। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের দক্ষিণপূর্ব কোণে 'সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁরা রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছিলেন। বিদেশী প্রয়াস কল্যাণকর হ'লে এদেশের মানুষ সর্বদাই যে সাহায্য দানে অকৃপণ হ'য়ে উঠতো রাজা বৈদ্যনাথের অর্থসাহায্যই তা প্রমাণ করে।

বিদেশিনীদের প্রতিষ্ঠিত এইসমস্ত বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনার নিয়ম আবশ্যিক থাকায় এদেশের লোকে এগুলির প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি। খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের এটিও অভিনব এক মিশনারী কৌশল ব'লে মনে ক'রে তারা সচেতনভাবেই দূরে দূরে থাকতো। সর্বপ্রকার মানসিক জড়তা কাটিয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের এই বিদেশী উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব গ'ড়ে তোলার জন্যে 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর তরুণ বিদ্রোহীরা খুব চেষ্টা করেছিলেন।

নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে বিভিন্ন সভাসমিতি ও আলোচনাচক্রে তাঁরা ভারতীয় নারীর অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার কথা তুলে ধরেছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারই সেই দুর্দশার একমাত্র প্রতিবিধান ব'লে প্রচার করতে সুরু করেছিলেন। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ শতকে প্রধানতঃ তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে অবলম্বন ক'রেই স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন মিশনারী কর্মপ্রচেষ্টার নির্মোক ত্যাগ ক'রে বৃহত্তর জন সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং দেশের নানাস্থানে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের বিচ্ছিন্নপ্রয়াস সুরু হ'য়ে যায়।

অশিক্ষা আর কুসংস্কারে ভরা স্থবির জনমানস এই শুভ কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রথম দর্শনেই কিন্তু প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকেও প্রথমে নানাবিধ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এই বিরুদ্ধতার ফলেই অবশ্য সর্ববিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রমের পন্থা নির্দেশের জন্যে চিন্তাশীল মনীষী পণ্ডিতরা গভীরভাবে চিন্তা করতে সুরু করেছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার এক সংখ্যায় সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সুচিন্তিত এক মন্তব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়,

'আমরা সকল বিষয়াপেক্ষা এ-বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশহিতৈষি জনসমূহের যুক্তসাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্য একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্যবিষয়ে মনোযোগী হউন।'[১]

অক্ষয়কুমারের এই চিন্তা সার্থকভাবে রূপ লাভ করলো একজন মহাপ্রাণ বিদেশীর কর্মপ্রচেষ্টায়। তিনি হলেন ভারত সরকারের তৎকালীন আইন সচিব এবং 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র সভাপতি স্যার জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীঠন। কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হ'য়ে, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকে একটি সংহত আন্দোলনের রূপ দেবার জন্যে তিনি দেশের গণ্যমান্য বিদ্বৎ সমাজের কাছে আবেদন জানালেন।

বীঠনের আবেদনে সমাজের গণ্যমান্য শ্রেণীর মধ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রথমে নবশাখ জাতীয় মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার পরামর্শ দিলেন এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে পাওয়া যাবে না ব'লে আশঙ্কা

১ 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক

প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'স্কুল সোসাইটি'র মতো একটি সমিতি গঠনেরও পরামর্শ দিলেন। অবশ্য এদেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কোন উদ্যোগ না থাকার অভিযোগ খণ্ডন করার জন্যে তিনি দেশীয় প্রয়াসের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে জানালেন,

'আমরা আমাদের কন্যাদের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা পড়াইয়া থাকি। সকলে অবশ্য এরূপ করেন না। আমার আশঙ্কা হয়, শিক্ষকগণ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে পাইবেন না। ...... শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্বে বালিকাদের বাংলা পড়ানো সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্বে আট-নয় বৎসর বয়স্ক মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।'[১]

বলা বাহুল্য, আট-নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের যেটুকু শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যেই বীঠন আপন প্রয়াস আবদ্ধ রাখতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি প্রাচীনপন্থীদের ছেড়ে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। 'ডিরোজিও'র মানস সন্তান 'ইয়ংবেঙ্গলে'র নেতারা তখন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। রামগোপাল ঘোষ ছাত্রী সংগ্রহে তৎপর হলেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্যে নগদ বারো হাজার টাকা দান করলেন এবং বিদ্যালয়ের পাঠাগারের জন্যে পাঁচ হাজার টাকার গ্রন্থ দান করলেন। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই বৈঠকখানায় বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হবে ঠিক হোল। সেই অনুযায়ী ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হোল দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানায়।

'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'জন ব্যক্তি বীঠনের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতবংশের সন্তান, রক্ষণশীল পরিবেশে পরিবর্ধিত এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন শিক্ষাবিধির দ্বারা লালিত এই দুই ব্যক্তি হলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মদনমোহন প্রতিদিন নিঃস্বার্থভাবে মেয়েদের বাংলা শিক্ষাদানের ভার নিলেন, তাদের ব্যবহারের উপযোগী একাধিক প্রাথমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হলেন এবং নিজের দুই মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দিলেন। আর বিদ্যাসাগরের যোগ্যতা ও চারিত্রগুণ সম্বন্ধে বীঠন এতই কৃতনিশ্চয়

১ যোগেশচন্দ্র বাগল—'রাধাকান্ত দেব' সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা সং ২০, পৃ. ৩১

হয়েছিলেন যে, তাঁর বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্যে তিনি তাঁকেই আহ্বান করলেন। হেদুয়ার পশ্চিমদিকে সিমুলিয়া অঞ্চলে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস করা হোল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে, সেই ডিসেম্বরেই বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে বীঠন স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রয়াসকে ব্যক্তিগত উদ্যমের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এ-বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সরকারী উদ্যম সৃষ্টি করার জন্যে চেষ্টা সুরু করলেন। শিক্ষার ব্যাপারে বাঙালী মেয়েদের উৎসাহ ও যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তিনি বড়োলাট লর্ড ডালহৌসীকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সরকারের করণীয় কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন,

'এখন আর সরকারের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়, এবং সর্বপ্রকারে একাজে তাঁদের সাহায্য করা উচিত। ..... আমি সেজন্য প্রস্তাব করছি আপনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'কে এই নির্দেশ দিন যে স্ত্রীশিক্ষা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যেন আমরা গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন স্থানের উৎসাহী ব্যক্তিদের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য সাহায্য করি।'[১]

বীঠনের আবেদনে সাড়া দিয়ে বড়োলাট ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখের একটি চিঠিতে জানালেন,

'আমার মতে, ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বীঠন সর্বপ্রথম উদ্যোগী হ'য়ে খুব বড়ো কাজ করেছেন। কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তিনি স্ত্রীশিক্ষার ভিত সুদৃঢ় করেছেন। তাই, তিনি কেবল শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতাই আমাদের কাছে দাবি করতে পারেন না, আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতাও দাবি করতে পারেন। স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তিনি আমাকে তাঁর পত্রে যে অনুরোধ জানিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মঞ্জুর করতে আমি রাজি আছি এবং আশা করি আমার সহযোগীরাও তাতে আপত্তি করবেন না। আমি প্রস্তাব করছি 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' ও 'কোর্ট অফ ডিরেকটার্স'কে অবিলম্বে এ-বিষয়ে লিখে জানানো হোক।[২]

বড়োলাটের এই মন্তব্য ভারত সরকারের সেক্রেটারী জেমস্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে সরকারীভাবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে বাংলা সরকারকে জানিয়ে দিয়ে লিখলেন,

১ J. A. Richey—Selections from Educational Records Part II (1840-59)
২ J. A. Richey—Selections from Educational Records Part II (1840-59)

'সপারিষদ বড়োলাট বাহাদুর মনে করেন যে, ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কাজ করা হয়েছে এবং এই প্রচেষ্টাকে এখন প্রকাশ্যে সাহায্য করাই সরকারের উচিত। 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'কে ভারত সরকার অনুরোধ জানাচ্ছেন এখন থেকে তাঁরা যেন স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনও তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য ব'লে মনে করেন এবং দেশীয় লোকের চেষ্টায় কোন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেই বিদ্যালয়কে যেন সবদিক দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য দানে কুণ্ঠিত না হন।'[১]

এইভাবে ভারত সরকারকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোলাই বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে বীঠনের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। কলকাতা শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন অপেক্ষা তাঁর এই কৃতিত্বের প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল বহুদূর প্রসারী। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষভাবে সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্য ছাড়া কোন আধুনিক দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার বা জনকল্যাণ প্রচেষ্টা যে সার্থক হ'তে পারে না, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে বীঠনই সর্বপ্রথম এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বীঠনের এই উপলব্ধির সূত্র ধ'রেই স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটেছিল। বীঠনকে সাহায্য করতে গিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের সম্পাদকত্ব গ্রহণ ক'রে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে তাঁর যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল, লেঃ গভর্ণর হ্যালিডের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তিনি তারই সার্থক ও পরিণত রূপ দান করতে চেয়েছিলেন।

'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপন করার পরেই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট বীঠন সাহেব হঠাৎ পরলোক গমন করলেন। বীঠনের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অক্লান্ত প্রয়াসে বড়োলাট লর্ড ডালহৌসী এতোদূর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তিনি বীঠনের স্কুলের ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে এলেন, তাঁর এই ঔদার্যের প্রশংসা ক'রে 'বোর্ড অফ ডিরেক্টার্স' বিদ্যালয়টিকে সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে আদেশ দিলেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁর কার্যকালের সমস্ত সময়টাই ব্যক্তিগতভাবে বীঠনের স্কুলের ব্যয়ভার মেটালেও তাঁর ভারতত্যাগের পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিদ্যালয়টি সরাসরি সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হোল। লেঃ গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক জেম্‌স্ হ্যালিডে তার পরিচালনার ভার দিলেন স্যার সিসিল বিডনের ওপর। সিসিল বিডন এই বিদ্যালয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কন্যাপ্রেরণের উপযুক্ত পরিবেশ গ'ড়ে তোলার জন্যে একটি বিস্তৃত

১ J. A. Richey—Selections from Educational Records. Part II (1840-59)

ব্যবস্থাবিধি অবলম্বন করলেন এবং বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে অংশগ্রহণের জন্যে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতিদের আহ্বান জানালেন এবং বীঠনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বিদ্যাসাগরকেই আবার সম্পাদকপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। বীঠনের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদ্যাসাগর সে অনুরোধে সাড়া দিলেন এবং বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্যে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করলেন।

বীঠনের বিদ্যালয়ের জন্যে চিন্তা করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম সারা দেশে নারী শিক্ষা প্রচারের একটি বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তখন বীঠন বিদ্যালয়কে একটি কেন্দ্রীয় মডেল বিদ্যালয়রূপে সামনে রেখে বাংলাদেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের একটি চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসে। অভাবনীয়ভাবে লেঃ গভর্ণর হ্যালিডের সহযোগিতা লাভ ক'রে তিনি সেই চিন্তা কাজে রূপ দেবারও সুযোগ পেয়ে যান। আমরা আগেই দেখেছি, ভারত সরকারের সেক্রেটারী থাকাকালীন হ্যালিডেই স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে লর্ড ডালহৌসীর অনুজ্ঞা বাংলা সরকারকে জানিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরও খুব উৎসাহ ছিল। বিলেতের কর্তৃপক্ষও বিষয়টি উৎসাহ সহকারেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই লেঃ গভর্ণরের পদে নিযুক্ত হ'য়েই তিনি বাংলাশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও উদ্যোগী হলেন। বাংলাশিক্ষা প্রচারের মতো এ ব্যাপারেও তাঁর প্রধান সহায়ক হলেন বিদ্যাসাগর। হ্যালিডের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় উৎসাহিত হ'য়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বর্ধমান ও হুগলী জেলায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয়গুলিকে উদার হস্তে সাহায্য প্রদান ক'রে হ্যালিডে নতুন আবেদন পত্রের খোঁজ করলেন। লেঃ গভর্ণরের এই অযাচিত উৎসাহ বিদ্যাসাগরকে এতোদূর অনুপ্রাণিত করলো যে, অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র দেড় বছরের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাতে তিনি ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে ফেললেন। প্রায় ৩০০ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়গুলির মাসিক খরচ দাঁড়ালো ৮৪৫ টাকার মতো। এই খরচ মেটানোর জন্যে সরকারী অনুদান প্রার্থনা ক'রে আবেদন জানালে হ্যালিডে দরাজহাতে সাহায্যদানের জন্যে প্রচলিত নিয়মবিধি কিছুটা শিথিল করার অনুরোধ জানিয়ে ভারত সরকারকে লিখলেন যে, স্থানীয় অধিবাসীরা গৃহ নির্মাণ ক'রে দিলে এবং কুড়িটি ছাত্রী সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকলেই সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অজস্র সাড়ম্বর প্রতিশ্রুতি দান করা হ'লেও কার্যক্ষেত্রে

যে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের কিছু করার ইচ্ছা ছিল না, তা প্রথম বোঝা গেল হ্যালিডের এই চিঠির উত্তরকে কেন্দ্র ক'রে। প্রচলিত নিয়মবিধির কোন পরিবর্তন করতে অস্বীকার ক'রে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হোল যে, কেবলমাত্র বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ক'রে দিলেই চলবে না, স্থানীয় জনসাধারণকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্যও করতে হবে এবং ছাত্রীদের কাছ থেকে কিছু কিছু বেতন নেবার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু যে দেশে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মেয়েদের স্কুলে আনাই একটা সমস্যা, যে দেশের সমাজপতিদের কাছে আট-নয় বছর বয়সের পর মেয়েদের শিক্ষাদান বাহুল্য মাত্র, সে দেশের মানুষের কাছে ভারত সরকারের এই প্রত্যাশা ছিল আকাশ কুসুম মাত্র। বিরূপ দেশাচারের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সরকারী প্রয়াসের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন যেখানে দেশের সর্বত্র একটা জাতীয় আন্দোলনরূপে প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, সেখানে শিক্ষা-দীক্ষাহীন সাধারণ মানুষের কাছে উৎসাহ ও প্রথম প্রবর্তনা আশা ক'রে ভারত সরকার দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চাইলেন মাত্র। বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রেই বিদেশী সরকারের এই ঔপনিবেশিকতাবাদী নীতির প্রথম উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যমের সরকারী প্রতিক্রিয়ায় দেশের সচেতন মানুষ ইংরেজের অন্তঃসারশূন্য বাকসর্বস্ব সাম্রাজ্যবাদী রূপটি প্রথম দেখতে পেয়ে সচকিত হ'য়ে উঠেছিল, ইংরেজের উদার মানবতাবাদী রূপের মোহে আবিষ্ট শিক্ষিত সমাজ প্রথম ভিন্নভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

বাস্তব রূপায়ণে অনিচ্ছুক সরকারের ঘোষিত নীতির সুযোগ নিয়ে জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে বিদ্যাসাগর সরকারকে যেমন অসুবিধায় ফেলেছিলেন, নিজেও তেমনি শিক্ষাবিস্তারে সরকারী বিরূপতায় অত্যন্ত আশাহত হয়েছিলেন। তাই সরকারী চাকরি থেকে তিনি অকালে অবসর নিতে চেয়েছিলেন। সরকারী চাকরি ছাড়া এই তাঁর প্রথম নয়। শিক্ষাবিধির সংস্কারে বাধা পেয়ে একবার তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন অবহেলা ভরে। আবার স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে সরকারী বিরূপতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে তিক্তবিরক্ত বিদ্যাসাগর সেই সংস্কৃত কলেজেরই অধ্যক্ষপদ ছেড়ে দিতে চাইলেন ঘৃণা ভরে। সংস্কৃত কলেজের চাকরি তিনি কোনদিনই প্রাত্যহিক গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পঞ্চাশ টাকা মাইনের সেরেস্তাদারির চাকরি ছেড়ে দ্বিগুণ বেতনের সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে চাননি, সম্পাদক

রসময় দত্তের বিরুদ্ধতায় শিক্ষাবিধি সংস্কারে ব্যর্থ হ'য়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি যখনই বাধা পেয়েছেন, ব্যর্থ হয়েছেন, তখন চাকরি তাঁর কাছে মূল্যহীন হ'য়ে পড়েছে। ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের মতো তা পরিত্যাগ ক'রে গেছেন পরম অবহেলা ভরে। চাকরি অপেক্ষা চাকরির পশ্চাৎবর্তী উদ্দেশ্যটাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই চাকরিকে একটা উপায় হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার পদত্যাগপত্রেই এই মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে,

'The new arrangements for the Sanscrit College have not yet been fully developed and as I am desirous of completing them which will occupy two or three months more, I wish to continue in my present office untile the end of December next when I shall tender my resignation in due form'. অর্থাৎ, সংস্কৃত কলেজের জন্যে গৃহীত নতুন ব্যবস্থাবিধি এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হ'য়ে ওঠেনি এবং তার জন্যে এখন দু'তিন মাস সময় লাগবে। সেটি শেষ করার জন্যে আমি আগামী ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত আমার বর্তমান পদেই নিযুক্ত থাকতে চাই। তারপর যথোচিতভাবে আমি আমার পদত্যাগপত্র পেশ করবো।

কিন্তু ডিসেম্বরের আগেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর থেকে তাঁর পদত্যাগ কার্যকর ব'লে গ্রহণ করা হয়েছিল। অনুমান করা যায় সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা তাঁর আগেই সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হ'য়ে গিয়েছিল; বাংলাশিক্ষা প্রচারের তাঁর করণীয় কর্তব্যও শেষ হ'য়ে গিয়ে ছিল আর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর আর কিছুই করার ছিল না, তাই প্রয়োজনের একটা দিনও বেশি সরকারী পদ আঁকড়ে থাকা তাঁর কাছে নিরর্থক ব'লে বোধ হয়েছিল।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্যে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াস আর তাতে বাধা পেয়ে সরকারী চাকরি পরিত্যাগের পেছনে বিদ্যাসাগর চরিত্রের একটি অনালোচিত মহিমাই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে দেখি। একটি কল্যাণকামী সরকারের কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা ছাড়া কোন জাতীয় পরিকল্পনা কখনই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না ব'লেই তিনি বিশ্বাস করতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'পরিচালক সমিতি'র বর্ণাঢ্য ঘোষণার দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে সে-যুগের অনেক মহাপুরুষের

মতো তিনিও মনে করেছিলেন নবযুগের নবীন আলোকে উদ্ভাসিত পাশ্চাত্য মানুষ হিসেবে ইংরেজই হয়তো সেই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভিত গড়বে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নেমে তাঁর মোহ ভঙ্গ ঘটেছিল, তিনি ইংরেজের ওপর বিশ্বাস রাখার অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, যে সরকারের হাতে দেশের সর্বাধিক উন্নতি নির্ভর করে, দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগহীন বিদেশীর হাতে সেই সরকার পরিচালনার ভার থাকলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হ'তে পারে না। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করার পেছনে বিদ্যাসাগর মানসের এই উপলব্ধিই যে প্রধান প্রেরণা দান করেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নে, সদ্য সিপাহীবিদ্রোহোত্তর কালে বণিকের হাত থেকে রাজশক্তি গ্রহণ ক'রে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের পরাধীনতার বন্ধনে যখন আরও বজ্রগ্রন্থি দিতে সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তখন নিঃশব্দে বিদ্যাসাগর একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচীর বীজ বপন করলেন। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তনধারার আধুনিকতম পর্যায়ে দেখা যায়, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনও ব্যক্তিগত প্রয়াস নির্ভর নয়; সচেতনভাবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সরকারই সেই বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা রচনা ক'রে থাকে। ইংরেজের কাছে এই অত্যাধুনিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রত্যাশা ক'রে বিদ্যাসাগর বিফল-মনোরথ হয়েছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতা থেকে দূরে সরে এসে তার সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক চরিত্রটিও তিনি উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই অসহযোগকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই 'প্যাট্রিয়টিজম্' ব'লে বর্ণনা ক'রে লিখেছিলেন,

'যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক লেখনীযন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি patriot, যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন।'[১]

সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়লেও বিদ্যাসাগর বীঠন বিদ্যালয়ের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেননি এবং সেখানে নিজের দায়িত্বকে তিনি গতানুগতিক-তাবদ্ধ ক'রেও রাখেননি। বীঠন বিদ্যালয়ের হিতকরী প্রভাবে অনেক সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তি মেয়েদের গৃহশিক্ষার আয়োজন করলেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বীঠনের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হ'তে তখনও অনেক দেরি ছিল। সম্পাদক

১ বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, 'পরিশিষ্ট'

হিসেবে বীঠন বিদ্যালয়ের শুভকরী প্রভাবের সেই মন্থরগতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর দুটি বাধার স্বরূপ আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল সরকারের সচেতন বিরূপতা ও ঔদাসীন্য, আর একটি ছিল বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতি। তাই স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের জন্যে শিক্ষা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা সর্বপ্রথমে এই বাধা উৎক্রমণের জন্যেই তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং দেশবাসীকেও সে-বিষয়ে সচেতন ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। সরকারী বিরুদ্ধতা অপসারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের তখন কোন উপায় ছিল না, কাল ও জাতীয় চরিত্রই ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক। বিদ্যাসাগর তাই অন্য বাধাটি উৎক্রমণের মধ্যেই আপন প্রয়াস আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। সে প্রয়াস খুব সহজসাধ্য ছিল না, কষ্টসাধ্যও ছিল না, দুঃসাধ্যই ছিল বলা চলে। সেই দুঃসাধ্য সাধনের কঠোর তপশ্চর্যায় বিদ্যাসাগর প্রায় সারা-জীবনই অতিবাহিত করেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সমকালেই তার সূত্রপাত হয়েছিল, ভগ্নহৃদয়ে রোগজীর্ণ দেহ পরিত্যাগের সময়ও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। বিদ্যাসাগরের সমগ্র কর্মজীবনের ইতিহাস তাই বিকৃত বিবাহপদ্ধতি-জাত সেই সামাজিক বাধার অপসারণ প্রয়াসের ইতিহাস, বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সংস্কারের ইতিহাস, নারীজাতির শৃঙ্খল মোচন প্রচেষ্টার ইতিহাস, নারীমুক্তির আগমনী রচনার ইতিহাস।

চার

'স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি'

১

স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে কলকাতার সুধীসমাজে একটা প্রচণ্ড আন্দোলন দেখা দিলে সেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে একটা সাধারণ জনমত গ'ড়ে তোলার জন্যে সেদিন কলকাতার আধুনিক শিক্ষিত ছাত্রসমাজও এগিয়ে এসেছিলেন। হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন ছাত্র সেই উদ্দেশ্যে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশের ইচ্ছায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগরের কাছে দু'টি রচনা প্রার্থনা করলে দুই বন্ধু তাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। ১২৫৭ সালের ভাদ্রমাসে (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে) পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হোল 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে বিদ্যাসাগরের একটি প্রবন্ধ নিয়ে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মদনমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষা।'

প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত দুই নব্যপণ্ডিত আশ্চর্যরকম মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তদৃষ্টি নিয়ে তাঁদের প্রবন্ধ দু'টিতে স্ত্রীশিক্ষার নানা বিষয় আলোচনা করেছিলেন। বিরোধীদের অসার যুক্তি খণ্ডন ক'রে মদনমোহন স্ত্রীশিক্ষার অভাবে জাতি ও সমাজের দুরবস্থার বিবরণ দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রীশিক্ষার ফলে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথাও আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারের পথে প্রধান যে অন্তরায় সেই বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহ-পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, কেবলমাত্র বিরোধী মনোভাবের জন্যেই নয়, কতকগুলি বিকৃত সামাজিক প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয়েছে ব'লেই অসহায় মানুষ ইচ্ছা থাকলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসতে পারছে না। তাই কেবলমাত্র বিরোধীদের কুযুক্তির যথার্থ প্রত্যুত্তর দিলেই চলবে না, মানবতাবিরোধী যুক্তিহীন এই সামাজিক প্রথা গুলিকে সর্বাগ্রে দূর করতে হবে। অর্থাৎ, স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী মানসিকতা সৃষ্টি করলেই চলবে না, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রধান সামাজিক বাধাগুলিকে অপসারণ করতে হবে। তাঁর এই 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়টিকেই যে কেবলমাত্র ঠিকমতো উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন, তা নয়, এর মধ্যেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎজীবনের সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টার সূত্রটিকেও প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরা যখন স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের জন্যে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে নানা তর্কযুক্তির মাধ্যমে অবিরাম চেষ্টা ক'রে চলেছিলেন, তখন তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবল জনমত গঠন করলেই চলবে না, সেই জনমতের প্রকাশপথের প্রধান বাধা বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের মূল প্রেরণা তাই স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল বলা চলে। মানুষের প্রয়োজনেই সমাজ গঠিত হয়েছিল আর সামাজিক বিধিবিধানও সেই প্রয়োজনেরই বাস্তব স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মনুষ্যত্ববিকাশের প্রধান উপায় শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সেই সামাজিক বিধিবিধানের সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন হ'লে ইতস্ততঃ করা তাই অর্থহীন। স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের এই অভিনব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়েছিলেন ব'লেই বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের স্থান আজও একক ও অনন্য হ'য়ে আছে, নানা মনীষী মহাপুরুষের মধ্যেও তাঁর মাথা তাই সকলকে ছাড়িয়ে উচ্চে উন্নত হ'য়ে আছে, শতাব্দীপাদের এপার থেকে আজও তাই তা স্পষ্টভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।

'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের প্রবন্ধদু'টির মধ্যে মদনমোহনের রচনায় স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক সহকারে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বস্বীকৃত হ'লেও সামাজিক বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে সেই সর্বস্বীকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগর সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর রচনাটিতে। বিদ্যাসাগরের রচনাটি প্রথমে প্রকাশিত হ'লেও আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে মদনমোহনের বক্তব্য বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের ভূমিকা হিসেবে পরিগণিত হ'তে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনে কলকাতা তখন তোলপাড় হ'য়ে উঠেছে। প্রাচীন ও আধুনিক মতাবলম্বী নানা ব্যক্তি পক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তিতর্ক দিয়ে তখন আসর গরম ক'রে তুলেছেন। বিরোধীদের হাস্যকর মনোভাবকে যুক্তির প্রখরতায় ছিন্নভিন্ন ক'রে স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকামীরা সেদিন ক্রমাগত যে সংগ্রাম ক'রে চলেছিলেন, মদনমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটির মধ্যে তার একটি সার্থক পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটির মধ্যে মদনমোহন নৈয়ায়িকের মতো পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ খাড়া ক'রে বিরোধীপক্ষের আপত্তিগুলি একটি একটি ক'রে খণ্ডন

ক'রে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, শিক্ষালাভের উপযোগী মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির কম নেই,

'শিক্ষাকার্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদয়ই আছে, কোন অংশের ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।'[১]

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা কোনদিনই শাস্ত্র বা আচারবিরোধী ছিল না। আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাচীনযুগের বিদ্যাবতী রমণীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে মদনমোহন প্রমাণ করতে চাইলেন প্রাচীনযুগে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের কোন বাধা ছিল না, বরং মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটাই প্রচলিত নিয়ম ছিল।

বিদ্যাশিক্ষা 'দুর্ভাগ্যদুঃখ' ও 'পতিবিয়োগদুঃখে'র কারণ হ'য়ে বিদ্যাবতী রমণীর সারাজীবন বিড়ম্বিত ক'রে তোলে ব'লে প্রচলিত কুসংস্কারের উত্তরে ব্যঙ্গের সঙ্গে মদনমোহন বললেন,

'পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয় এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে একজনের মাদকদ্রব্য সেবনে অন্যজনের মত্ততা, অন্যজনের চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্বদাই সম্ভবিতে পারে।'[২]

লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা মুখরা ও স্বেচ্ছাচারিণী হবে এবং মাতাপিতা ও স্বামীকে অবজ্ঞা করবে ব'লে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদের প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে মদনমোহন যুক্তি দিলেন বিদ্যাই হোল বিনয়ের মূল, মহাজ্ঞানী নিউটনের সমুদ্রবেলায় উপলসংগ্রহের উপমায় সেই বিদ্যারই মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষা স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী মেয়েদের স্বাভাবিক চরিত্রগুণগুলিরই উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করবে।

এই সমস্ত বহিরঙ্গীয় কারণ আলোচনা করতে গিয়ে মদনমোহন এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিমুখতার একটি গভীর ও অত্যন্ত বাস্তব কারণ আবিষ্কার করলেন। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল কেবলমাত্র চাকরি অথবা ব্যবসাবাণিজ্য করা এবং সেই উপলক্ষে দেশি বিদেশি নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশার জন্যেই

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'মদনমোহন তর্কালঙ্কার', পৃ. ৩৪। সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা সং ১৩

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'মদনমোহন তর্কালঙ্কার', পৃ. ৩৮।

শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার গভীরতর প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আহরণের অতিবাস্তব প্রয়োজনীয়তা ছাড়া শিক্ষার গভীরতর কোন উদ্দেশ্য তারা স্বীকার করতো না। এই কারণেই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিরূপতা থাকলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে ইংরেজিশিক্ষা বিস্তারে তাঁদের আগ্রহের কোন অভাব ছিল না। নিজেদের আচার-বিচার দেশাচার-কুসংস্কার নিয়ে ডুবে থাকতে চাইলেও নবাগতা ইংরেজবাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদলাভে ইংরেজিভাষাশিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিল ব'লেই ছেলেদের ইংরেজিশিক্ষায় তাদের আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য সেশিক্ষা কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, সে ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণের সামান্যতম ইচ্ছাও তাদের ছিল না। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের ধর্মবিনাশী চিন্তাধারা তাদের শঙ্কিত ক'রে তুললেও তারা তাই ইংরেজিভাষা শিক্ষা পরিত্যাগ করতে পারেনি, অন্যত্র নানা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে সে শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছিল। তারা যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অর্থকরী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিচার করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। এই বণিক মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা ক'রে মদনমোহন লিখলেন,

'আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যা-ভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত।'[১]

মনুষ্যত্বের উৎকর্ষবিধানে শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় ক'রে মদন-মোহন অর্থ ছাড়াও বিদ্যার বহুবিধ উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেও, নিজেই বুঝেছিলেন তাঁর যুক্তি বিষয়ী লোকদের বোধগম্য হবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থোপার্জনের সহায়তা করবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে তিনি লিখলেন,

'আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জনের নিমিত্ত লালায়িত-চিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একেবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে।'

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'মদনমোহন তর্কালঙ্কার', পৃ. ৪১
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা নং ১৩

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'মদনমোহন তর্কালঙ্কার', পৃ. ৪৩

অবশ্য মেয়েদের অর্থোপার্জনের পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে মদনমোহন ঘরে ব'সে নানাবিধ হস্তশিল্প সৃষ্টির কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার আলোচনায় মদনমোহন প্রধানভাবে উপযুক্ত মাতৃজাতি সৃষ্টির ওপরই জোর দিয়েছিলেন। সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ ক'রে তোলার মধ্যেই মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং সেই বিকাশের ধারায় মায়ের প্রধান শক্তি তাঁর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা। আবার শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে সন্তান মায়ের কাছে যেমন সহজভাবে ও অবলীলাক্রমে পাঠ গ্রহণ করতে পারে 'ব্যাঘ্র অথবা মূর্তিমান মৃত্যুরাজে'র মতো 'অপরিচিত ভীষণাকার' শিক্ষকের কাছে তার সামান্যতমও সম্ভাবনা নাই। যে গৃহশান্তির অভাব এদেশে একটি বহুলপ্রচারিত প্রবাদে পরিণত হয়েছে, শিক্ষার অভাবই তার মূল কারণ ব'লে বর্ণনা করে মদনমোহন বললেন, অশিক্ষার ফলে পুরনারীর চিন্তাক্ষেত্রে যে দৈন্যের সূচনা হয়, প্রাত্যহিক কর্মধারার বিশৃঙ্খলাতেই তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। অবসর সময়ে উচ্চচিন্তা করার অক্ষমতা পাস্পরিক অকারণ কলহের মধ্যেই কালহরণের সূত্র খোঁজে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীজাতির অশিক্ষা সমগ্র পরিবারে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও ডেকে আনে। পুরোহিতের প্রতারণায় বা প্রতিবেশীদের কুযুক্তিতে অশিক্ষিতা নারী নানা ব্যয়সাধ্য বৃথা পূজা বা ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে স্বামীকে সর্বস্বান্ত ক'রে ফেলে।

পরিশেষে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাপুরুষদের সর্ববিধ কল্যাণকর্মের বিরুদ্ধতা করার অবজ্ঞা ও অজ্ঞতাজনিত জঘন্য মনোবৃত্তিকে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে ধিক্কার জানিয়ে মদনমোহন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন,

'এখানে আমরা একপ্রকার স্থির করিয়াছি, এদেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এদেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎ কার্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না।'[১]

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'মদনমোহন তর্কালঙ্কার', পৃ. ৫১-৫২, সাহিত্যসাধক চরিতমালা পুস্তিকা সং ১৩

মদনমোহনের প্রবন্ধে সে-যুগের প্রগতিশীলদের মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছিল। তাঁর যুক্তিজালের বিরুদ্ধে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী প্রাচীনপন্থীদের বিশেষ কিছু বলার ছিল ব'লে মনে হয় না। কিন্তু লেখনীযুদ্ধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকামীদের জয়লাভে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের পথ সুগম হওয়া তো দূরের কথা, সে পথের কোন বাধাই অপসারিত হয়নি। এর কারণ হোল, স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদের আপত্তিগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে তাত্ত্বিক এবং সেই আপত্তি খণ্ডনের জন্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকামী-দের যুক্তিতর্কও ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাত্ত্বিক। এই তাত্ত্বিক উত্তর প্রত্যুত্তরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা এবং শিক্ষিত সচেতন মানুষের মজলিস যতোই গরম হ'য়ে উঠুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধতার বাস্তব কারণের সঙ্গে তার কোনই যোগ ছিল না। কারণ, সে বাধা কোন তত্ত্বে ছিল না, কোন মানসিক বিরুদ্ধতাতেও ছিল না, সে বাধা ছিল বাঙালী হিন্দুর সামাজিক আচারের গভীরতম তলদেশে, তার মূল ছিল সমাজজীবনের গোপনতম অন্তস্থলে, তা ছিল বাঙালী হিন্দুর বিকৃত-বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে। বিদ্যাসাগরই প্রথম সেই বাধার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেই গভীরপ্রোথিত মূলটিকে ধ'রে সজোরে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন. সমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক সেই বিষবৃক্ষটিকে টেনে উপড়ে ফেলে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় প্রকাশিত তাঁর 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সেই প্রয়াসেরই ভূমিকা রচিত হয়েছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেবের যুক্তিতে কর্ণপাত না ক'রে বীঠন সাহেব তাঁর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা দেয়নি। এই অনুৎসাহের কারণ সেদিন অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলেও বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন করলেই চলবে না, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ নিয়ে লেখনীযুদ্ধ চালালেই চলবে না, স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সে পথের প্রধান প্রতিবন্ধক বিকৃত বিবাহ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংস্কার করতে হবে। তাই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন এবং অকালবিধবা শিশুকন্যাদের পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধতার ভিত্তিতে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে যে অমানবিক এবং অবৈজ্ঞানিক রীতিনীতি গ'ড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেই, সমাজের সর্বাধিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিরুদ্ধতার মূল অন্বেষণ ক'রে বিদ্যাসাগর তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। যে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিতান্ত

নাবালিকা কন্যার বিবাহ দান ক'রে মাতাপিতা অক্ষয় স্বর্গলাভের আনন্দে বিভোর হ'য়ে ওঠেন, সেই শাস্ত্রীয় বিধানকে অলীক ও আবর্জনাস্বরূপ বর্ণনা ক'রে তার আচরণজাত স্বর্গপ্রাপ্তির চিন্তাকে বিদ্যাসাগর মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করলেন,

'অষ্টমবর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়া পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোক প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।'[১]

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাক্য দিয়েই সমাজসংস্কারের যুক্তিযুক্ততা সপ্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিদ্যাসাগরবিরোধীরা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শাস্ত্রকে তিনি কোনদিনই মানুষের চেয়ে ওপরে স্থান দেননি। কিন্তু মানুষ যেখানে শাস্ত্রকথার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত, সেখানে সেই মানুষের উপকারের জন্যেই তাঁকে অনুকূল শাস্ত্রবাক্য অন্বেষণ করতে হয়েছিল। 'বাল্যবিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগরের প্রথম সমাজসংস্কারবিষয়ক প্রবন্ধ। তখনও এদেশের মানুষের অন্ধ শাস্ত্রানুরক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা জন্মায়নি, তাই যুক্তি দিয়েই সেখানে তিনি আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, আপন মত প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করেননি, এমন কি, প্রয়োজনে শাস্ত্রকে ধিক্কারও দিয়েছিলেন। বাল্যবিবাহের অসার শাস্ত্রবিধি সেদিন সমাজে যে অনর্থ সৃষ্টি করেছিল, তা উপলব্ধি ক'রেও লোকাচারের ভয়ে কেউ তার প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। লোকাচারের দাসত্ব থেকে সমাজমানসকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই অযথা ভয় ভেঙ্গে দেবার জন্যেই বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বাল্যবিবাহ প্রথার কদর্য স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক, নৈতিক, মানসিক, আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার ক'রে, বিদ্যাসাগর, এই অনিষ্টকর প্রথা বাঙালী সমাজে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার একটি জীবন্ত চিত্র প্রদান করেছিলেন। পারস্পরিক প্রণয় যে বিবাহের ভিত্তি, সুখে দুঃখে বেদনায় বন্ধুর জীবনপথে পরস্পরের সমব্যথী চিরসাথীর পবিত্র অঙ্গীকারে যে দাম্পত্য জীবনের শুভসূচনা, বাল্যবিবাহের অমানবিক শাস্ত্রবিধি তারই মূলে

[১] 'বাল্যবিবাহের দোষ,' বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড ; পৃ. ৩৫৫

কুঠারঘাত করেছে ব'লে বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেছিলেন ; কেবল তাই নয়, যে শাস্ত্র 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' ব'লে বিধি দান করেছে, সেই শাস্ত্রই আবার বাল্য-বিবাহের বিধান দিয়ে প্রকারান্তরে পূর্ববিধির বিরুদ্ধতা করেছে ব'লেও প্রমাণ করেছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন সুস্থ সবল দীর্ঘজীবী পুত্রের হাতে পিণ্ডলাভ ক'রে পরলোকে পুন্নাম নামক নরক থেকে উদ্ধারের যে বাসনা হিন্দুর বিবাহ চিন্তার মূল প্রেরণা ছিল, বাল্যবিবাহের কদর্য প্রথা তারই মূলে কুঠারঘাত করেছে, কারণ বাল্যবিবাহের ফলে 'পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা'। তাই এ-বিষয়ে তাঁর চরম সিদ্ধান্ত ছিল, যে শাস্ত্র এই ধরণের পরস্পরবিরোধী বিধি দান করে, তার অনুশাসন সমাজের কোন মঙ্গল সাধন করে না, উপরন্তু বিশৃঙ্খলাই বাড়িয়ে তোলে। এই তথাকথিত শাস্ত্রের বিশৃঙ্খলার হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্যে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবিধির স্থানে সুস্থ জীবনবোধকেই অবশ্য পালনীয় ও আচরণীয় ধর্ম ব'লে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন।

এরপর বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধতার বৈজ্ঞানিক কারণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছিলেন, বাল্যবিবাহের ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার অকাল জাগ্রত যৌনচেতনা উন্নতভাব ও উচ্চচিন্তাকে একেবারে পঙ্গু ক'রে ফেলে, রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাকচাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে,' তারা এতো বেশি উদগ্রীব হ'য়ে ওঠে যে, জীবনের এই গঠমান পর্যায়টি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে। শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত সেই বালদম্পতি পরবর্তী জীবনে 'মনুষ্যের আকারমাত্রধারা, বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য গণনায় পরিগণিত হয় না'।

মানসিক অপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ বালদম্পতির শারীরিক পুষ্টিরও হানি ঘটায়। জীববিজ্ঞানীদের মতে বাল্যবিবাহজনিত দাম্পত্য সম্পর্কের ফলে যে সন্তানের আবির্ভাব হয়, গর্ভবাসকালেই তার নানাবিধ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে। সেই বিপত্তিসমূহ অতিক্রম ক'রে যদি-বা সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তো সারা জীবন ধ'রে রুগ্ন দুর্বল শরীরে সে পিতামাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলে। দুর্বল শরীরে সবল মন বা রুগ্নদেহে বলিষ্ঠ চিন্তা আশা করা যায় না। এই নবজাতকের দল তাই নিরুদ্যম একটি ভীরু প্রজন্মেরই সূচনা করে।

বাল্যবিবাহের ফলে অর্থ নৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা গ'ড়ে ওঠার আগে সংসার বড়ো হয়ে যায়, অথচ শিক্ষার অভাবে অর্থোপার্জনের কোন যোগ্যতা জন্মে না। অপরিনামদর্শী অযোগ্য মানুষ তখন সংসারের প্রয়োজন মেটাতে

অসৎ-পথেও ছুটে যায়। জঘন্ত শাস্ত্রবিধি আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশাচার উদ্ভাবিত এই বাল্যবিবাহ প্রথা তাই মানুষের সর্ববিধ মহৎ সম্ভাবনার বিনষ্টি ঘটিয়ে জীবনকে অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন ক'রে তোলে।

বিশবছর বয়স পর্যন্ত মানুষের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাল, তারপরই মানুষ দেহে মনে পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। বিশবছর অতিক্রম করলে তাই মানুষের জীবনে অকালমৃত্যুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। অকাল বৈধব্যের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্মে তাই বিশবছর বয়স অতিক্রান্ত হ'লেই পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত। পুরুষের মৃত্যুর পর আমাদের দেশে তার বিধবা স্ত্রীর ওপরই সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের ভার বহন করার জন্মে প্রচণ্ড সামাজিক চাপ আসে। বালবিধবার ক্ষেত্রে সে চাপ যেমন নিষ্করুণ তেমনি অমানবিক আকার ধারণ ক'রে থাকে। বিধবা-বিবাহের বিধি প্রচলিত না থাকায় নিষ্প্রাণ সামাজিক বিধির পাষাণ প্রাচীরে হতভাগিনী বালবিধবাদের সারাজীবন নিষ্ফল মাথা কুটেই মরতে হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমনে অসমর্থ হ'য়ে বিধবা নারী কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে যদি বিপথগামিনী হ'য়ে পড়ে, তখন সমাজের সম্মান রক্ষার জন্মে ও লোকাপবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় তাকে কেবলমাত্র ভ্রূণহত্যার পাপেই লিপ্ত হ'তে হয় না, স্বাভাবিক জীবনপথ পরিত্যাগ ক'রে গণিকা জীবনের অন্ধকার পাতাল পথেও তলিয়ে যেতে হয়। অকাল বৈধব্যের ফলে এই ধরণের নানাবিধ যে পাপের অনন্ত সম্ভাবনা, বাল্যবিবাহই সে সকলের একমাত্র কারণ।

বাংলাদেশের সর্ববিধ আত্মিক সঙ্কট, তার সর্বৈব অধঃপতন আর মনুষ্য-মর্যাদাগর্বের চরম অবনতির কারণ লুকিয়ে ছিল এই অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক বিবাহবিধির মধ্যে। জীবজগতে নারীপুরুষের মিলনে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাবের বিবর্তনধারা বেয়েই মরণশীল জীবদেহআশ্রয়ী অমর প্রাণের জয়যাত্রা ব'য়ে চলে। মানব সংসারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠা যৌনজীবনের সুস্থ সংযত আচরণের মাধ্যমেই এই বিশ্বনিয়মের প্রকাশ ঘটা উচিত। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বিবাহবিধির পেছনে এই চেতনাই সক্রিয়ভাবে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। পারস্পরিক স্নেহ প্রেম ভালোবাসার আবির্ভাবে এই বিবাহবিধি উত্তরোত্তর প্রকৃষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সেই ক্রমবিবর্তনের ধারাপথেই বর্তমান যুগে নরনারীর পরস্পরের মনের মিলই দাম্পত্য বন্ধনের একমাত্র ভিত্তি হ'য়ে উঠেছে। বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাইরের ও অন্তরের নানাবিধ ভাবের পূর্ণ বিকাশের ওপরই আবার এই মানসিক মিল নির্ভরশীল। নিজজীবনে

এই বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ বিকাশের পরই নরনারী পরস্পরের পূর্ণ পরিচয় উপলব্ধি করে। বাল্যবিবাহে মানববিবাহের এই মূল ভিত্তিটিই বিনষ্ট হ'য়ে যায়। তাই বিদ্যাসাগরের খেদ,

'অস্মদ্দেশীয় বাল-দম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয়ের দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়নসংঘটনও হইল না। কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল।'[১]

এরফলেই, এদেশে যথার্থ দাম্পত্য বন্ধন গ'ড়ে ওঠার কোন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়না, 'কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী পরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।'

এই যান্ত্রিক বিবাহবিধির ফলেই জাতির জীবনে অবশ্যম্ভাবী পতনের যে সুনিশ্চিত পরিণতি অপেক্ষা ক'রে আছে, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে একমাত্র গণশিক্ষাই তার থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে ব'লে বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অথচ এদেশে পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখে নারী শিক্ষা প্রসারের কোন চিন্তাই করা হয়নি। তাই বীঠনের প্রচেষ্টাকে পরোক্ষে স্বাগত জানিয়ে, রাজা রাধাকান্ত দেবের মতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন বিদ্যাসাগর,

'আমরা অবগত আছি, কোন ভদ্রসন্তানেরা স্ব-স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেইদিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূশ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জ্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়।'[২]

১ 'বাল্যবিবাহের দোষ,' বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭

২ 'বাল্যবিবাহের দোষ', বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড. পৃঃ ৩৫৯

যথার্থভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাই বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত হওয়া উচিত। একটা সুস্থ সবল প্রাণবান জাতি সৃষ্টির জন্যে তাই এই কুৎসিত প্রথার নিষিদ্ধকরণ বাঞ্ছনীয়। সহজাত মানসিক বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে নর ও নারী উভয়ের জীবনেই যে শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রধান বাধা বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে জাতিকে তাই মুক্ত করা প্রয়োজন। নরনারীর পারস্পরিক আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে পরস্পরকে উপলব্ধির পর উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে অত্যন্ত সচেতনভাবে দাম্পত্যজীবন গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেই বাল্যবিবাহের অমানবিক প্রথার তাই বিলুপ্তি-সাধন প্রয়োজন। এই অনিষ্টকর প্রথাকে পরিত্যাগ করতে না পারলে জাতির মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই।

আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বেই বিদ্যাসাগর শাস্ত্র সংহিতার নাগপাশ থেকে মুক্ত ক'রে বিবাহ বন্ধনকে নরনারীর মনের মিলের ওপর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই মনের মিল আবিষ্কারের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন আর শিক্ষার পূর্ণতা বিধানের জন্যে বয়োপ্রাপ্তির প্রয়োজন। তারপরেই সুশিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক নরনারী সজ্ঞানে সচেতনভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে সুস্থ দাম্পত্য জীবনে গ'ড়ে তোলার যোগ্যতা অর্জন করবে। তাই নরনারীর পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত বিবাহানুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তীব্রভাবে সন্দিহান,

'হায় কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী এবং অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয় কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।'[১]

শতাব্দীপাদের ওপার থেকে ভেসে আসা বিদ্যাসাগরের এই কণ্ঠস্বর বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও আজ অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য এক আধুনিক মানোভাবেরই পরিচয় প্রদান করে।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটিতেই বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাঙালী হিন্দুর বিকৃত-বিবাহপদ্ধতির সংস্কারের দ্বারা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমগ্র জাতিকে আধুনিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ স্থাপনের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রকৃত প্রেরণাটির সঙ্গে এই প্রবন্ধটিতেই আমরা

---

১ 'বাল্যবিবাহের দোষ', বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, পৃ. ৩৫৭

সর্বপ্রথম পরিচিত হই, বুঝতে পারি ব্যক্তিজীবনের কোন ঘটনার দ্বারা উত্তেজিত হ'য়ে ক্ষণিক ভাবাবেগের বশে তিনি সমাজ সংস্কার কাজে অগ্রসর হননি, আধুনিক উদার মানবতাবাদী শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেই তিনি বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহবিধির সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বুঝতে পারি শিক্ষাচিন্তাই বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রয়াসের মূল প্রেরণা; শিক্ষা বিস্তারের দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই তিনি কুসংস্কারাচ্ছাদিত সামাজিক বিধিবিধানের দুর্ভেদ্য দুর্গকে নির্ভয়ে আক্রমণ করেছিলেন।

৩

বাল্যবিবাহের দোষ নির্ণয় কালে বাল্যবিবাহের অন্যতম কুফল বালবৈধব্যের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর অকালবিধবা বালিকাদের পুনর্বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন,

'যেহেতু অস্মদ্দেশ্যে বিধবাবেদনের বিধি দৃঢ়তররূপে প্রতিসিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়।'[১]

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত দুঃখেরই কারণ নয়, শত শত বালিকার জীবনে অকালবৈধব্য ঘনিয়ে এলে, বাল্যবিবাহ প্রথা সমাজকে গর্হিতপাপে কালিমালিপ্ত ক'রে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। বালবৈধব্যের সমস্যার আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর তাই মন্তব্য করেছিলেন,

'ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কতপ্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব-ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপকার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে।'[২]

এইজন্যেই বাল্যবিবাহপ্রথা রহিত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি বাল্য-

১ 'বাল্যবিবাহের দোষ', বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬১
২ 'বাল্যবিবাহের দোষ', বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড; পৃ. ৩৬১

বিবাহের বিষময় পরিণতিতে যে বালিকারা অকালে বিধবা হয়েছে তাদের জীবনসঙ্কটের একমাত্র সুস্থ, সহজ ও সম্মানজনক সমাধান হিসেবে পুনর্বিবাহের প্রচলন করাও প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর-জীবনে কোন উপলব্ধিই উপলব্ধিমাত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, উপলব্ধি তাঁর কর্মোদ্যমেরই প্রেরণা হ'য়ে উঠতো। এই প্রেরণার বশেই তিনি যেমন বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তেমনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনেরও চিন্তা করেছিলেন, আর বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে তাঁকে যে বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টায়। তাঁকে একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল, শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন খুঁজতে হয়েছিল এবং রাজকীয় বিধি প্রণয়নের জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে হয়েছিল।

বিধবা-বিবাহের চিন্তা কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনেই প্রথম উদ্ভূত হয়নি। তাঁর শতাধিক বৎসর পূর্বে রাজা রাজবল্লভ তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক বিধবাকন্যার পুনর্বিবাহের জন্যে শাস্ত্রীয় সমর্থন অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর মতো ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তির আদরিণী কন্যার অকালবৈধব্য যে পারিবারিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই, নিজের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি তার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রচলিত বিবাহবিধির সংস্কার ক'রে তিনি অভিষ্টপূরণের পথে কিছুটা অগ্রসর হ'লেও নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিরোধিতায় সফল হ'তে পারেননি। বালবিধবা শিশুকন্যার দুঃখে রাজবল্লভের মতো প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা যে আর কোন চেষ্টা করেননি, তা নয়; কিন্তু কেউই সমস্যাটিকে একটি জাতীয় সমস্যা ব'লে উপলব্ধি করতে পারেননি, একটা পারিবারিক বিপর্যয়ের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে লোকাচারের অনড় জগদ্দল পাথরটাকে নড়াতে গিয়ে তাই তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই সমস্যাটির নতুনভাবে বিচার বিশ্লেষণ সুরু হয়েছিল। শতকের গোড়াতেই একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ ও একজন তামিল ব্রাহ্মণ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয় ক'রে কলকাতার মতিলাল শীলও এই ব্যাপারে একটা আন্দোলন গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' আর ইয়ংবেঙ্গলদের 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন' সমস্যাটিকে একটি জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ ক'রে এ ব্যাপারে একটি সচেতন আন্দোলন সৃষ্টির পক্ষে জনমত গঠনের চিন্তা

করেছিলেন। কিন্তু আলোচনা, বাদপ্রতিবাদ বা তীব্র সম্পাদকীয় প্রকাশ ছাড়া তখন পর্যন্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যকরী কোন পন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়নি। ধনী প্রতিষ্ঠাবান লোকেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই তখন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানের জন্যে পথ হাতড়ে ফিরছিল। এমনি একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রেই এই সমস্যার সমাধানের জন্যে বিদ্যাসাগর একটি জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলের একজন প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি শ্যামাচরণ দাস তাঁর কন্যার অকালবৈধব্যের প্রতিকারকল্পে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ব্যবস্থাপত্রে সাক্ষরকারীরা সকলেই ছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। এই পণ্ডিতদের অন্যতম, বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ বিধবা-বিবাহের পক্ষে নানা শাস্ত্রীয় বিধি উল্লেখ ক'রে ব্যবস্থাপত্রটি রচনা করেছিলেন আর তাতে সাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মার্ত পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন। নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদ ক'রলে ভবশঙ্কর শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁকে পরাজিত ক'রে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, দু'জনেই যখন বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধতা সুরু করেন তখন হিন্দুধর্মের আপাত-আড়ম্বরের ভেতরে প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ্য ক'রে বিদ্যাসাগর হতবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন আর সমাজের রক্ষাকর্তা স্মার্ত পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ অর্থলোলুপতা এবং শাস্ত্রের স্থানে লোকাচারকে প্রধান ব'লে প্রচার করার ধৃষ্টতা দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন। এই ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দেবার জন্যেই তিনি শাস্ত্র ঘেঁটেছিলেন, কলম ধরেছিলেন এবং রচনা করেছিলেন 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হোল বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের প্রবাহহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে তখন হঠাৎ যেন মহাপ্লাবনের বিভীষিকা দেখা দিল।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর কোন শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেননি, বরং যে সমস্ত স্মৃতিসংহিতায় বাল্যবিবাহের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, সেগুলির শাস্ত্রীয় মর্যাদাই তিনি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যাহ্নলগ্নে বাংলাদেশে নানা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে যুক্তিতর্কের যে ঝড় ব'য়ে চলেছিল তা কখনই পণ্ডিতী আলোচনার সীমা অতিক্রম ক'রে আমাদের প্রাত্যহিক

জীবনাচরণকে প্রভাবিত করতে পারেনি, সেখানে তখনও যুক্তিহীন দেশাচারের স্বৈরতন্ত্র প্রবল প্রতাপে বিরাজিত ছিল। তাই যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরচনা পণ্ডিতের প্রশংসা অর্জন করলেও শাস্ত্রীয় বিধির সমর্থন না থাকলে সমাজজীবনে তার কোন প্রভাবই পড়তো না। শাস্ত্রবিধির সমর্থন না খুঁজে যুক্তিতর্কের দ্বারা আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর তাই ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যপথে অগ্রসর হ'তে গেলে কেবলমাত্র যুক্তিমার্গ অবলম্বন করলে চলবে না, শাস্ত্রশাসিত এই সমাজে তার সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও ঘটবে না। কিন্তু তার পরিবর্তে শাস্ত্রবিধির সমর্থনের দ্বারা নিজ বক্তব্যকে যদি তুলে ধরা যায় তাহ'লে সমাজকে শাস্ত্রীয় পথেই শাস্ত্রশৃঙ্খলমুক্ত ক'রে উদার মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তকে তিনি তাই মন্তব্য করেছিলেন,

'যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।'[১]

এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নিজের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রদান অথবা শাস্ত্রের প্রতি নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দেবার জন্যে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতে চাননি। দেশের অগণিত যে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি আপন বক্তব্য উপস্থাপনায় ব্রতী হয়েছিলেন, শাস্ত্রীয় সমর্থন ব্যতীত তাঁর বক্তব্যে তারা কোন গুরুত্ব আরোপ করতে চায়নি ব'লে তাঁকে বাধ্য হয়েই শাস্ত্রীয় সমর্থন খুঁজতে হয়েছিল। শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারের পিছনে বিদ্যাসাগরের তাই আন্তরিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাসঞ্জাত কোন প্রেরণা ছিল না, বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্যে একটি অনুকূল শাস্ত্রীয় পরিবেশ গ'ড়ে তোলার নিতান্ত বাস্তব উদ্দেশ্যেই তাঁকে সেই প্রয়াস চালাতে হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্ররাজির মধ্যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রই সামাজিক অনুশাসন ও আচরণীয় এবং অনাচরণীয় বিধিসমূহ নির্দেশ ক'রে এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের উপযোগী ও পালনীয় কর্তব্যকর্ম নির্দেশের প্রয়োজনে যুগে যুগে বার বার নতুন ক'রে ধর্মশাস্ত্র রচনার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী যুগের মানুষ পূর্ব পূর্ব যুগের বিধিনিয়মাবলী পালনে অপারগ হ'য়ে পড়াতেই নতুন

---

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৫-১৬

ক'রে ধর্মশাস্ত্র রচনার প্রয়োজন দেখা দিত। এই রকম প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই ধর্মশাস্ত্রকার পরাশরকে কলিযুগের উপযোগী ধর্মের অন্বেষণ করতে হয়েছিল নতুন ক'রে। ভারতবর্ষের মানুষ পরাশরনির্দেশিত এই ধর্মশাস্ত্রকেই বর্তমান যুগের একমাত্র পালনীয় ধর্ম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। বিদ্যাসাগর সেই পরাশরনির্দেশিত সংহিতার মধ্যেই তাঁর উদ্দেশ্যের সমর্থন খুঁজে তাঁর বক্তব্যের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

'পরাশর সংহিতা'য় বিধবাদের আচরণীয় ধর্ম সম্বন্ধে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হয়েছিল—বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ও সহগমন। এই বিধি তিনটির মধ্যে সহগমন রাজকীয় বিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তাই বর্তমানে বিধবাদের জন্যে মাত্র দু'টি পথ খোলা আছে, তাদের বিবাহ ও ব্রহ্মচর্যের মধ্যে যে কোন একটি বিধি অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশে দেশাচারের প্রাবল্যে বিবাহবিধি অপ্রচলিত হ'য়ে ব্রহ্মচর্যের ওপরই জোর পড়ায়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বিধবাদের জন্যে ব্রহ্মচর্য ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি। বাল্যে হোক, বার্ধক্যে হোক, বিধবা হ'লেই বাঙালী নারীর তাই ছিল একমাত্র বিধিলিপি।

বিদ্যাসাগরের যুক্তিধারা অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নিজের শাস্ত্রজ্ঞান বা শাস্ত্রবিধির প্রতি আপন হৃদয়ের আনুগত্য প্রকাশ করার জন্যে তিনি কখনও শাস্ত্রবিধির আলোচনা করেননি। তা করলে কলিকালের সমাজজীবনে পরাশরের একাধিপত্য স্বীকার ক'রে তাঁকে আইনতঃ নিষিদ্ধ সহগমনও সমর্থন করতে হোত। কারণ, সেক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রচলিত সামাজিক নিয়মাদি পরিবর্তন বা নিষিদ্ধকরণের সরকারী অধিকারই তাঁকে অস্বীকার করতে হোত। কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা মানুষই ছিল তাঁর কাছে অধিক প্রিয়, সেই মানুষের কল্যাণেচ্ছাতেই তিনি আপন কর্মজীবনের গতি ভিন্ন ভিন্ন খাতে পরিচালিত করেছিলেন। সেই মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁকে বিবাহ পদ্ধতি সংস্কারের কথা ভাবতে হয়েছিল এবং শাস্ত্র সমর্থন ছাড়া জনসমাজে সেই সংস্কার প্রয়াসের অগ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা ছিল বলেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে যুক্তিমার্গ ছেড়ে শাস্ত্রমার্গে নামতে হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্র প্রভাব কোন অবস্থাতেই তাঁর উদ্দেশ্যকে ঢেকে দেয়নি। তাই, প্রয়োজনে তিনি যেমন শাস্ত্রবিধিকে তুলে ধরেছিলেন, তেমনি প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা রাজবিধির প্রাধান্যও স্বীকার করেছিলেন। আবার, শাস্ত্রবিধি ও রাজবিধির মধ্যে সংঘাত বাধলে তিনি সাধারণ মানুষের প্রবণতার ওপর নির্ভর ক'রেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের তথাকথিত অন্তঃসার-

শূন্য শাস্ত্রবিধিশাসিত সমাজে ধর্মের প্রাধান্য যতোই স্বীকার করা হোক না কেন, রাজদ্বারে ধর্মশাস্ত্রবিরোধী কোন বিধি গৃহীত হ'লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই আইন মেনে নেওয়াই আমাদের চিরন্তন স্বভাব। সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সতীদাহ নিবারণী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছিল তার পিছনে ধর্মীয় আবেগ কতটা ছিল তা সন্দেহের বিষয়, কারণ ইংরেজ-আইন প্রদত্ত সুযোগের মধ্যে লম্ফঝম্ফ করার পরও আইনটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হ'লে ধর্মের মহিমা প্রচারোদ্দেশে কোন সমাজপতিই কিন্তু তা অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেননি। সমাজজীবনে আপাত আড়ম্বরের অভ্যন্তরে ধর্ম-শাস্ত্রের এই প্রভাবশৈথিল্য এবং রাজকীয় বিধির প্রতি সভয় আনুগত্যের প্রবণতা লক্ষ্য ক'রেই বিদ্যাসাগর সর্ববিধ সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায় রাজকীয় বিধি প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন, আর সেই রাজকীয় বিধির প্রতি সমাজের আনুগত্য প্রবণতাকে সন্দেহাতীত ক'রে তোলার জন্যেই তিনি শাস্ত্রকথার দোহাই পেড়েছিলেন। তাই শাস্ত্রমতে বিধিসম্মত হ'লেও সহগমন রাজকীয় বিধিদ্বারা প্রতিনিষিদ্ধ হওয়াতে তিনি তার ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচারের পণ্ডিতী তর্কে যেতে না উঠে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্যের আলোচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে-ছিলেন।

আবার বিবাহ ও ব্রহ্মচর্যের আলোচনাতেও তিনি শাস্ত্র সমর্থন অপেক্ষা বাস্তব প্রয়োজনের ওপরই জোর দিয়েছিলেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল। সেদিন বাংলাদেশের বালবিধবা রমণীকুলে ব্রহ্মচর্যের নামে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার যে বন্যা সামাজিক পরিবেশকে চূড়ান্ত-ভাবে কলুষিত ক'রে তুলেছিল, ব্রহ্মচর্যের অবাস্তবতা প্রমাণে তার চেয়ে বড়ো আর কোন যুক্তিরই প্রয়োজন ছিল না। তাই এই রকম ব্রহ্মচর্য অপেক্ষা পুনর্বিবাহ তাঁর মতো সমাজসচেতন যে কোন ব্যক্তির কাছেই অধিকতর কাম্য ছিল। কিন্তু অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজমানসে প্রয়োজনীয় ও কাম্য-বিষয়ের সমর্থনেও শাস্ত্রবিধির পৃষ্ঠপোষকতার অনিবার্যতা উপলব্ধি ক'রেই তাঁকে শাস্ত্র ঘাঁটিতে হয়েছিল এবং নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী পরাশরবাক্যকে ব্যাখ্যা ক'রে বলতে হয়েছিল,

'কলিযুগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন।'[১]

বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ. ১২

'পরাশর সংহিতা'র চতুর্থ অধ্যায়ে বিধবাদের কর্তব্যকর্ম নির্দেশ ক'রে বলা হয়েছে,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥
মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্র কোট্যোঽর্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ, 'স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হ'লে, মারা গেলে, ক্লীব প্রমাণিত হ'লে, সন্ন্যাস গ্রহণ করলে অথবা পতিত হ'লে নারীর পুনর্বিবাহ বিধিসম্মত।

স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে থাকে, দেহান্তে সে ব্রহ্মচারীদের মতো স্বর্গলাভ করে।

যে নারী স্বামীর সহগমন করে, মনুষ্যশরীরে সাড়ে তিন কোটি লোমের সমসংখ্যক সময় সে স্বর্গবাস করে'।

এই বিধিতে, বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কলিযুগে বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনে অসুবিধা দেখে পরাশর যে নিকৃষ্টপর্যায় ক্রমে বিবাহ থেকে ব্রহ্মচর্য ও সহগমনের বিধি দান করেছেন, তা কিন্তু পরাশরবাক্যের প্রকাশভঙ্গীতে প্রমাণিত হচ্ছে না। তিনি যেখানে পুনর্বিবাহকে বিধিসম্মত মাত্র ব'লে উল্লেখ করেছেন, সেখানে ব্রহ্মচর্যের ফলে ব্রহ্মচারীদের মতো স্বর্গলাভের লোভ দেখিয়েছেন আর সহগমনের ফলে সাড়ে তিনকোটি বছরের স্বর্গবাসের কথায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকারের স্পষ্ট প্রকাশিত এই মনোভাবের জন্যেই যে সহগমনের ব্যাপক প্রচলন, ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য-বিকাশ এবং বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়বৎ নিষিদ্ধকরণ ঘটেছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পুনর্বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত হ'লে তাঁর বক্তব্যেও তার প্রতিফলন ঘটতো এবং যেখানে তিনি ব্রহ্মচর্য ও সহগমনের জন্যে স্বর্গলাভের লোভনীয় চিত্র এঁকেছেন, সেখানে পুনর্বিবাহের বিধিমাত্রের উল্লেখ না ক'রে সেক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগের আশা দিতেন। বিদ্যাসাগর একথা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রকাররা যেখানে বিধবা-বিবাহের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি, স্বর্গপ্রাপ্তির আশা না দিলেও পরাশর যে তা বিধিসম্মত ব'লেছিলেন, তাই তাঁর কাছে বহুমূল্য ব'লে বোধ হয়েছিল। কারণ নৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন.

ছিল এবং সেই প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করার সাহস এদেশের মানুষের ছিল না। তারা এইরকম সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা, নৈতিকতা এবং ঔচিত্যবোধ অপেক্ষা অনেক বেশি নির্ভর করতো শাস্ত্রবিধির ওপর। তাদের সামনে তুলে ধরার জন্যে অন্ততঃ একটিও শাস্ত্রবিধির সন্ধান পেয়েই বিদ্যাসাগর কৃতার্থ হ'য়ে গিয়েছিলেন। সেই শাস্ত্রবিধির পশ্চাতে শাস্ত্রকারের উচ্ছ্বসিত ও স্বতোৎসারিত সমর্থন ছিল কিনা তা বিচার করার মতো সময় ও মানসিকতা কিছুই তাঁর ছিল না, অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রভৃতি প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকলে তাঁকে হয়তো তাই করতে হোত। কিন্তু শাস্ত্রসমর্থন খুঁজতে হয়েছিল তাঁকে অবস্থাবিপাকে প'ড়ে নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই, তাই বিধবা-বিবাহের বিধির উল্লেখমাত্রেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তার অধিক কিছু আশা করা যে বৃথা সে-বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। আবার গণনাতীত কোন এক অতীতে একজন সমাজবিধিচয়নকারীর পক্ষে যে মানব-সমস্যার ভবিষ্যৎ উপলব্ধি সম্ভব ছিল না, প্রত্যাশিতও ছিল না, উনিশ শতকের অমানবিক ও অনাচারপূর্ণ দেশাচারের মধ্যে ব'সে বিদ্যাসাগর তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই উপলব্ধির আলোকেই পরাশরবিধির শুষ্ক ভূর্জপত্রগুলি নবীন ব্যাখ্যায় সঞ্জীবিত হ'য়ে বর্তমান যুগের মানুষের কাছে সজীব ও চিরন্তন হ'য়ে উঠেছিল।

সেদিন রাজকীয় বিধিনির্দেশে সহগমন নিষিদ্ধ হয়েছিল। ব্রহ্মচর্যের নামেও ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার স্রোত নিবারিত হ'য়ে উঠেছিল। তাই অকালবিধবা নারীদের সমাজে পুনর্বাসনের একমাত্র উপায় ছিল পুনর্বিবাহ দান। অথচ শাস্ত্রসমর্থনহীন দেশাচারের দাপটে সেই একমাত্র উপায়ই অবহেলিত হ'য়ে থাকায় 'ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল' উত্তরোত্তর বেড়ে উঠে সমাজকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। এই সামাজিক ব্যাধির উপশমের উপায় নির্ধারণের জন্যে সেদিন অনেকেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন, বিশেষ ক'রে অকাল-বিধবা নারীর দুর্ভাগা আত্মীয়পরিজনেরা তাঁদের প্রিয়জনের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা উপলব্ধি ক'রে অবরুদ্ধ বেদনায় অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন। বিধবা-বিবাহবিধির প্রয়োজনীয়তা তাঁরাই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, রাজা রাজবল্লভ থেকে সুরু ক'রে পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস পর্যন্ত বিধবা-বিবাহবিধির অন্বেষণের মাধ্যমে রচিত হয়েছিল সেই বেদনারই ইতিহাস।

৪

শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি রয়েছে, সমাজেও বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আছে, অথচ সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিধি মতে সেই সামাজিক প্রয়োজনসিদ্ধির পথে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেশাচার। শাস্ত্রের ছদ্মবেশে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে এই শস্ত্রপাণি দেশাচারই এতোদিন ভ্রূকুটিভঙ্গে সমাজকে শাসন ক'রে এসেছে, এই দেশাচারের প্রভাবেই বাঙালী হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি শাস্ত্রবিরোধী হ'য়ে উঠে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা এনে নানাবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। শাস্ত্র-বিধির সাহায্যেই বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ও দেশাচারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করলেন এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধস্থলে দেশাচারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে শাস্ত্রবিধি পালনের যৌক্তিকতাও শাস্ত্রবিধিসম্মতভাবেই নির্ণয় করলেন।

বার বার নানা প্রয়োজনে শাস্ত্রবিধির দোহাই পেড়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার প্রয়াসের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ ক'রে বাঙালী সমাজে শুদ্ধ, নির্মল ও অবিকৃত শাস্ত্রশাসনের পুনঃপ্রবর্তনের যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তার পেছনেও তাঁর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল ব'লে মনে হয়। নির্মোহ জ্ঞান ও সতর্ক যুক্তির ভিত্তিতে আধুনিক বাঙালী জীবন গ'ড়ে তুলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বাঙালীকে অতীত ঐতিহ্যের অকারণ বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে তার সহজ উত্তরাধিকারীর যোগ্যতা দান করতে চেয়েছিলেন। কারণ, বহু পেছনে ফেলে আসা কোন এক যুগের এক বা একাধিক ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর অসহায়-ভাবে নির্ভরশীল কোন জাতিই অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না, অথচ অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাকে ভবিষ্যতের চলার পথ নির্মাণ করতে হয়। বিদ্যাসাগর তাই শাস্ত্রবিধিকে অতীতদিনের অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ ক'রে বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি দেশাচারের দেহ থেকে শাস্ত্রের নামাবলী ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশাচারকে অস্বীকার করতে পারলেই শাস্ত্রের নিত্যোদ্যত রক্তচক্ষুও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়বে আর তখনই তার প্রতি মানুষের একটা নিরপেক্ষতাবোধ গ'ড়ে উঠবে। মানুষ বুঝতে পারবে সন্ন্যাসের মতো শাস্ত্রও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, কারণ, পৃথিবীর আদিযুগ থেকে এই সন্ন্যাস ও শাস্ত্রের নামেই অনেক পাপ সংঘটিত হ'য়ে এসেছে। তখন ভণ্ডের সন্ন্যাসীবেশ দেখে সীতার মতো যেমন সে ভুল করবে না, তেমনি নিষ্প্রাণ শাস্ত্রের বিধি পালন করতে গিয়ে পরশুরামের মতোও আর মাতৃহত্যাজনিত পাপ করবে না। অথচ পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার শাস্ত্রনামধারী এই বিশাল

ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনমতো মণি আহরণেও তার কোন বাধা থাকবে না।

নিষ্প্রাণ শাস্ত্রের রক্তচক্ষুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মানবতাবাদের এই সহজ চেতনা আনয়নই সমাজসংস্কার প্রয়াসে বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব। শাস্ত্রবিধি পালনেই মানবজীবনের চরম সার্থকতার বক্র দৃষ্টিটাকে সোজা এবং স্বচ্ছ ক'রে তুলে তিনিই সর্বপ্রথম মানবজীবনের সহজ বিকাশধারায় শাস্ত্রবিধির গৌণ ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ক'রে তুলে-ছিলেন। বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থদু'টিতে তাই পদে পদে শাস্ত্রবিধি সংকলিত হ'য়েও তাঁর প্রখর বাস্তববুদ্ধি, গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ যুক্তিশীলতা আর অতলান্ত মানবতাবোধ শাস্ত্রীয় বিধিবিধানকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেছে। গ্রন্থদু'টিতে সর্বত্রই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, বাস্তব সমস্যার মানবিক সমাধান প্রার্থনা করেছেন, একটি সুউচ্চ মানবীয় আদর্শবোধকে অনুসরণ করেছেন এবং গভীর সহানুভূতিপূর্ণ যুক্তির দ্বারা আপন বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। শাস্ত্রবিধিকণ্টকিত হ'য়েও গ্রন্থদু'টির মানবিক আবেদন তাই কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। একটি সুস্থ সবল স্বাভাবিক প্রাণবান জাতি সৃষ্টির যে স্বপ্ন ধ্রুব আদর্শের মতো তাঁর সর্ববিধ সংস্কারকর্মে সর্বদাই প্রেরণা দান করতো, এখানেও তার কল্যাণস্পর্শ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর নতুন শিক্ষাদর্শের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যতের বাঙালীজাতির যে স্বপ্নময় রূপ কল্পনা করেছিলেন, অনুকূল পরিবেশের সহায়তা ভিন্ন তার রূপায়ণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেই তিনি বাঙালী-হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শে তাই প্রাচীন শাস্ত্রের অন্ধ আনুগত্যের কোন স্থান ছিল না। কারণ শাস্ত্রবাক্যের প্রশ্নাতীত অভ্রান্ততায় তাঁর নিজের যেমন বিশ্বাস ছিল না, অন্যের মনেও তেমনি তিনি কোন বিশ্বাস জাগাতে চাননি। কিন্তু তবু তাঁকে শাস্ত্রের সাহায্যে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা কেন প্রমাণ করতে হয়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রচার অথবা আপনার শাস্ত্রজ্ঞানের প্রমাণ দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, শাস্ত্রীয় হোক বা অশাস্ত্রীয় হোক, বিধবা-বিবাহ প্রচারই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনাক্রমে শাস্ত্রে আপন মতের আনুকূলতা দেখে তিনি তা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন মাত্র। তাই শাস্ত্র-বিধি উল্লেখ ক'রেও তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি, মানুষের সহজ সহানুভূতি, দেশাত্মবোধ ও মানবতার দ্বারে মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন,

'হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।'[১]

সম্পূর্ণভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহসমস্যার বিচার করেছিলেন ব'লেই বিকৃত বিবাহপদ্ধতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত বিধবাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছিল, বিদ্যাসাগর কখনও তাদের সম্বন্ধে সামান্যতম দুর্বাক্যও প্রয়োগ করেননি। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক দেহধর্মের অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠা শাস্ত্রবিধির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র দুর্বলতা ছিল না। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে নারী-পুরুষের যথেচ্ছ যৌনসংসর্গকে তিনি ব্যভিচার বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যভিচারজনিত অপবাদের বোঝা নারীজাতির ওপর চাপিয়ে দেবার গতানুগতিক মূঢ়তাকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা তার যৌনচেতনার একটা সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশপথ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েই তিনি জীবনে ও সমাজে সুস্থতা আনতে চেয়েছিলেন। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে-ছিলেন স্বাভাবিক যৌনাচারের মাধ্যমে বাঙালীজীবনে সুস্থ জীবননির্বাহে ও নবজাতকের শুভজন্মে যে চেতনা সার্থক হ'য়ে উঠতে পারতো, বিকৃত রুচি ও অবাস্তব দৃষ্টি লোকাচারের প্রবল প্রকোপে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার ভীষণতায় সমাজকে তা ক্ষয়রোগগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। যে লোকাচার সমাজকে সুস্থভাবে বাঁচার পথ নির্দেশ করতে পারছে না, অধিকন্তু, অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতির দিকে প্রবলভাবে পরিচালিত করছে, এদেশের হিন্দুসমাজ সেই ধ্বংসরূপী লোকাচারকেই পরম আগ্রহভরে আঁকড়ে ধরতে চাইছে দেখে তিনি তাই তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েছিলেন,

'অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নিরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশবর্তী হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপ-

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ৩০৩।

ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহে।'[১]

নারীজাতির স্বাভাবিক যৌনচেতনার অস্বীকৃতির ভিত্তিতে বিরচিত বৈধব্যজীবনের রুক্ষ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার শাস্ত্রীয় বিধিনির্দেশ, ক্রমবর্ধমান বালবিধবার সমস্যায় দিক্‌ভ্রান্ত এই বহুবিবাহকণ্টকিত বাঙালী হিন্দুসমাজে বারবার লজ্জিত হ'তে বাধ্য। কারণ শাস্ত্র যেখানে জীবনকে অনুসরণ করে না, জীবন সেখানে সর্বদাই শাস্ত্রকে অস্বীকার ক'রে চলে। তিক্তকণ্ঠে বিদ্যাসাগর তাই এহেন বাঙালী সমাজের কর্ণধারদের প্রশ্ন করেছিলেন,

'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়! কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে।'[২]

সহস্র উদাহরণ পেয়েও যে সমাজের কোন চৈতন্যোদয় হয়নি, তার কাছে অতিবাস্তব এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা বৃথা। সেই বৃথা প্রত্যাশায় অনর্থক কালহরণ না ক'রে বিদ্যাসাগর আপনার কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন একাকী, নিঃসঙ্গভাবে, সহস্র প্রতিকূলতার বাধাকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে।

৫

বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল ধ'রে যে আলোচনা চালিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্য বিচার করলে দেখা যায়, বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সম্বন্ধে তাঁর চরম সিদ্ধান্ত ছিল যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলেই বাংলাদেশে অকালবিধবার সংখ্যা দ্রুতবর্ধমান, বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এইসব অকালবিধবা বালিকার যে কোন সময় পদস্খলন হ'তে পারে, তখন লোকলজ্জাভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি পাপের সংঘটনও

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৪

২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৪

স্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথার অবলুপ্তি ঘটলে ভবিষ্যতে এই পাপের সম্ভাবনা কমে যাবে আর বিধবা-বিবাহ প্রথার প্রচলন ঘটলে বর্তমানে অকালবিধবারা বিবাহের মধ্যে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবে এবং সমাজ থেকে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপের অবলুপ্তি ঘটবে। বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের এই বৃহৎ পটভূমিকাটি সামনে রেখেই বিদ্যাসাগর বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিবাহ সংস্কার প্রচেষ্টার এই মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে না পেরে সে-যুগের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও তাঁর প্রচেষ্টাকে তীব্র সমালোচনায় জর্জরিত করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের ওপর আপন বক্তব্য গ'ড়ে তুললেও শাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজ তাঁকে ক্ষমা করেনি। বিধবা-বিবাহের স্বল্পতায় তাঁদের সমালোচনার গতিবেগ আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। এ-যুগেও তাঁর বিরুদ্ধে সে সমালোচনা কমেনি। অনেক সমালোচক আজও প্রচার করেন যে, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ছিল নিরর্থক, সমাজে তার কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটেনি। তাঁদের মতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আইন ক'রে বন্ধ করতে হয়নি, আপনা হ'তেই তা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু একশো বছর আগে আইন পাশ হ'লেও বিধবা-বিবাহ বাঙালী হিন্দু সমাজে আজও অজ্ঞাতপ্রায়। বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞানের অভাবেই এই ধরণের সমালোচনার উৎপত্তি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগর-জীবনে বাল্যবিবাহ বিরোধিতা, বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ বিরোধিতা একটি মূল চিন্তারই তিনটি ভিন্নভিন্ন প্রকাশপথ মাত্র। তাদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যগুলির বিচার চলে না। মূল উদ্দেশ্যটিকে ধ'রে বিচার করলেই কেবল-মাত্র তাঁর বিবাহবিষয়ক আন্দোলনগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

সমাজসংস্কার প্রয়াস বিদ্যাসাগর মানসের মূল চেতনাটির রূপায়ণপথের উপায় মাত্র ছিল, এই প্রয়াস তাই কখনই তাঁর চরম উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। নিতান্ত তরুণ বয়সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষাই হোল জাতির মেরুদণ্ড; উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষাবিহীন জাতি কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীজাতির জীবনে আধুনিক শিক্ষার উদার আলোক বিকীরণই তাই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের মহান স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলতে গিয়েই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন কেবলমাত্র পুরুষকেই সুশিক্ষিত ক'রে তুললে চলবে না, দেশের নারীসমাজকেও সমানভাবে শিক্ষাদান

না করলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সেই জন্যেই তিনি বীঠনের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার প্রচেষ্টায় সানন্দে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং হ্যালিডের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু কাজে নেমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্যে কেবলমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুকূল প্রচার-কার্যই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে প্রথমে এবং প্রধানভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পথের প্রধান বাধাগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কারণ সেগুলি সমূলে বিনাশ করতে না পারলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সর্ববিধ প্রয়াসই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বাঙালী হিন্দু নারীর শিক্ষালাভের প্রধান অন্তরায় বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সংস্কার সাধনায় প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বাল্যবিবাহের দোষ নির্ণয়েই তাঁর সেই কর্মোদ্যমের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। বাল্যবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বালবৈধব্যের কথা মনে এসেছিল, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বালবৈধব্যের কারণ লুকিয়ে আছে ঘৃণ্য বহুবিবাহ প্রথার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে অসীম সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন বালবিধবার জীবনের করুণ পরিণতি, ব্যভিচারের কলঙ্কপঙ্কে তলিয়ে যাবার বেদনাময় ইতিহাস আর ভ্রূণহত্যার পাপের বেদীতে সমাজদেবতার স্থায়ী আসন নির্মাণের জন্যে সমাজপতিদের জঘন্য অপপ্রয়াস। এই সমস্যার একমাত্র ফলপ্রদ সমাধান হিসেবে সেইসব অকালবিধবার পুনর্বিবাহ ছাড়া অন্য উপায় তিনি খুঁজে পাননি, তাই বিধবাবিবাহের জন্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেজন্যে সর্বস্বান্তপ্রায় হ'য়েছিলেন, জীবনপণ করতেও পশ্চাদপদ হননি। সর্বশেষে অকালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধিরোধের অন্যতম উপায় হিসেবে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। এমনি ক'রেই বিবাহবিধির সংস্কারের মাধ্যমে তিনি সমাজ জীবনে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনচেতনা আনয়ন ক'রে শিক্ষার পটভূমি ও পরিবেশ নির্মাণ কর'তে চেয়েছিলেন। প্রাচ্যভাষা ও পাশ্চাত্যবিদ্যার মিলনসঞ্জাত যে নবীন শিক্ষাদর্শ তাঁর মনে উদ্ভূত হয়ে'ছিল, তার যথার্থ পরিপোষকতার জন্যেই এই পটভূমি ও পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান যুগে অনায়াসলব্ধ এই পটভূমি ও পরিবেশ দেখে আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না, শিক্ষার এই প্রাথমিক সর্ত পূরণের জন্যে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসের অধিক অংশটিরই কি অপব্যয়ই না হয়েছিল! আধুনিক যুগ বাল্যবিবাহ প্রথাকে অতীতের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেছে। ফলে বাল-বৈধব্যও আজকের দিনে এক প্রায়-অজানা ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই তাই

বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তাও আজ সীমায়িত। বহুবিবাহ আজ শুধু হাস্যকরই নয়, রাষ্ট্রীয় বিধিবলে নিষিদ্ধও বটে। বিদ্যাসাগরের যুগে এই তিনটি প্রথার প্রচণ্ডতা তাই আজ আর উপলব্ধি করা যায় না; তেমনি উপলব্ধি করা যায় না এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই কর্মবীরের প্রয়াসের অযথা অপব্যায়ের বিপুল পরিমাণও। কিন্তু এটুকু উপলব্ধিতে কোন গভীর মনন বা গবেষণার প্রয়োজন হয় না যে, তাঁরই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবেই আজকের বাঙালী সমাজে প্রগতিশীলতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর মহান শিক্ষাস্বপ্নের রূপায়ণ-প্রয়াসের প্রধান বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের ও বহুবিবাহের অবলুপ্তির মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার তীব্রতার হ্রাস ঘটেছিল। আজ বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহের সবগুলি প্রথারই স্বল্পতা তাই কোন একটি ক্ষেত্রে তাঁর আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণ করে না, প্রমাণ করে তাঁর বিবাহবিধি-সংস্কারের সার্বিক প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ বহুবিবাহের অবলুপ্তির পথে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন আন্দোলনটিও বিলীন হয়েছে মাত্র, তা ব্যর্থ হয়নি, অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্তও হয়নি।

৬

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বিধবা-বিবাহ আইনের সপক্ষে বিদ্যাসাগর প্রায় এক হাজার ব্যক্তির সাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করলেন। অনেক বাদানুবাদ এবং যুক্তিতর্কের পর, প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল সমাজের সর্ববিধ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হোল। এই আইনের সুযোগ নিয়ে বিদ্যাসাগর নবোদ্যমে বিধবা-বিবাহ-দানে প্রবৃত্ত হলেন এবং অচিরকালমধ্যে সাড়ম্বরে কয়েকটি বিধবা-বিবাহও অনুষ্ঠিত হোল।

কিন্তু কেবলমাত্র বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হ'তে পারলেন না। কারণ তাঁর শিক্ষা স্বপ্নের যে মহান আদর্শকে তিনি বাংলাদেশের জনজীবনে রূপায়িত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন কেবলমাত্র বিধবা-বিবাহের দ্বারা তার সার্থকতার পথের সর্ববিধ বাধাকে অপসারণ ক'রা সম্ভব ছিল না। তার জন্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের অভিশাপকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে দূর করা প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই, প্রায় একই সময়ে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে, তিনি বহুবিবাহনিবারক কোন আইন

প্রণয়নের প্রার্থনা জানিয়ে সরকারের কাছে আর একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। যে বিশেষ উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি আর মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েছিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্যে জীবন বিপন্ন ক'রেও সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধতায় তাঁর সেই একই প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছিল। বহুবিবাহের সুদূরপ্রসারী সর্বনাশের ইঙ্গিত উপলব্ধি ক'রে তিনি তার বিরুদ্ধেও আর একটি আন্দোলন গ'ড়ে তোলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের মতো এই বহুবিবাহ বিরুদ্ধতাও বিদ্যাসাগরের বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের সচেতন মানুষের মনে চিন্তা জাগিয়ে তুলেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বিদ্যাদর্শন পত্রিকা'য় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই জঘন্য সামাজিক প্রথার দিকে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তার নিরাকরণের জন্যে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিদ্যাসাগরের আগেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 'সুহৃদ সমিতি' নামক এক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহনিবারণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্যে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্র প্রেরিত হয় ওই বৎসরের শেষের দিকে। এরপর কয়েক হাজার লোকের সাক্ষরসহ ১২৭টি আবেদনপত্র বাংলাদেশ থেকে আর একখানি আবেদনপত্র বারাণসী থেকে ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এইসব আবেদনপত্রের বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি ক'রে ভারত সরকারের পক্ষে গ্র্যাণ্ট সাহেব রমাপ্রসাদ রায়ের সহযোগিতায় বহুবিবাহনিরোধক একটি আইনের প্রাথমিক খসড়াও প্রস্তুত করেন। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের হঠাৎ প্রজ্বলিত বিশৃঙ্খলায় সে প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারকে সচেতন ক'রে তোলার জন্যে শিক্ষিত মানুষের প্রয়াস কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি। সিপাহী-বিদ্রোহের হাঙ্গামা মিটে যাবার কয়েক বছরের মধ্যেই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বহুবিবাহনিরোধক একটি আইন-প্রণয়নের জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ নন্দী, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক এবং আরো ১৬৮০ জন হিন্দুর সাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদনপত্র বাংলাদেশ থেকে ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়। 'ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য হিসেবে বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহও প্রায় একই সময়ে বহুবিবাহনিবারক একটি খসড়া বিল কাউন্সিলে উত্থাপনের জন্যে বড়োলাট লর্ড এলগিনের কাছে পেশ করেন। কিন্তু তাঁর

সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হ'য়ে যাওয়ায় সে বিল উত্থাপন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এরপর বহুলোকের সাক্ষর সমন্বিত আর একটি আবেদনপত্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা সরকার বহুবিবাহনিবর্তক কোন আইন প্রণয়নের সুপারিশ ক'রে ভারত সরকারের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা এদেশের সামাজিক বা ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ভারত সরকারকে অতিসাবধানী ক'রে তুলেছিল। ভারত সরকার মনে করেছিলেন ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে ব'লে সিপাহীদের একটি দৃঢ়বদ্ধ ধারণা তাদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার অন্যতম কারণ ছিল। তাই বাংলা সরকারের প্রস্তাবে সহজে রাজী না হ'য়ে ভারত সরকার জানালেন,

'এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথা একটি সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা।...ভারতবর্ষে, এমন কি বাংলাদেশেও, এই বিষয়টি নিয়ে কিছু করার পক্ষে প্রচণ্ড অসুবিধাগুলি পুরোপুরি বিবেচনা করা হয়েছে কি না সেবিষয়ে সপারিষদ বড়োলাট বাহাদুর সন্দেহ করছেন। সপারিষদ বড়োলাট বাহাদুরের মতে, পরে উল্লেখিত প্রদেশটির ব্যাপারেও সরকারের কাছে এমন কোন কাগজপত্র নেই যার দ্বারা প্রদেশটির সুশিক্ষিত মানুষদের বেশির ভাগই আন্তরিকভাবে বহুবিবাহের বিপক্ষে ব'লে একজন ধীরস্থির ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী সিদ্ধান্ত করতে পারেন। অবশ্য কুলীন ব্রাহ্মণদের আচরণের কয়েকটি বিশেষ ত্রুটির কথা স্বতন্ত্র।'[১]

ভারত সরকারের এই মতামতের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষের মনোভাব পর্যালোচনার জন্যে বাংলা সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করলেন। সি. পি. হবহাউস, এইচ. টি. প্রিন্সেপ, দিগম্বর মিত্র, সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই কমিটির সদস্য মনোনীত হলেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত, তদন্ত কমিটির, অন্যান্য সদস্যরা বহুবিবাহ প্রথার নির্লজ্জ বর্বরতা এবং সামাজিক অসাম্যের কথা উপলব্ধি করলেও লোকাচারের বিরুদ্ধতা করতে সাহসী হলেন না। তাই বহুবিবাহনিবারক কোন আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধেই মতামত জানিয়ে তাঁরা সরকারকে রিপোর্ট দিলেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হ'তে পারেননি। একটি স্বতন্ত্র নোটে নিজের মন্তব্য প্রকাশ ক'রে তিনি লিখেছিলেন,

---

১ Legislative Department Proceedings, August 1866, No. 14.

'I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfaring with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage.'[১] অর্থাৎ, 'আমার মত হোল, বর্তমানে হিন্দুদের আইনতঃ প্রাপ্ত বিবাহবিষয়ক অধিকারে হস্তক্ষেপ না ক'রেই একটি বিঘোষক আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।'

রাজদ্বারে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও বিদ্যাসাগর কিন্তু হতোদ্যম হননি। বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি তখন শাস্ত্রসাগর মন্থন ক'রে বিধবা-বিবাহ পুস্তকের মতো বহুবিবাহবিরোধী একটি পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তারপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' যখন বহুবিবাহনিরোধক কোন আইন প্রণয়নের জন্যে আবার নতুন ক'রে সরকারের কাছে আবেদন জানানোর উদ্যোগ করলেন, তখন সেই শুভ প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবেই বিদ্যাসাগর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট প্রকাশ করলেন তাঁর বহুবিবাহবিরোধী প্রথম গ্রন্থ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'।

৭

বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থরচনাকালে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণকল্পে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়েছিল। বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে তাঁকে কিন্তু তেমনি কোন আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়নি। কারণ, তাঁর গ্রন্থরচনার অনেক আগে থেকেই বহুবিবাহনিবারণের জন্যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল এবং আন্দোলনবিরোধীদের বক্তব্যও বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে বিদ্যাসাগর সেই সমস্ত বিরোধীবক্তব্যই খণ্ডন করেছেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরকে প্রধানভাবে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা নির্ণয়ের ওপর জোর দিতে হয়েছিল এবং একবার শাস্ত্রীয় ব'লে প্রতিপন্ন হ'লে এই বিধবা-বিবাহবিধির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলে তার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যেই সরকারী আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ, বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে সরকারকে শাস্ত্র ও ধর্মরক্ষাকারীর ভূমিকা নিতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু বহুবিবাহের ক্ষেত্রে অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সরকারকে আরও সতর্ক ক'রে তুলেছিল। সতীদাহ-প্রথা

১ Legislative Department Proceeding, March 1867, No. 26.

নিবারণোদ্দেশ্যে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণকালে তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইংরেজ অধিকারের বিনিময়েও এই জঘন্য প্রথা বিদূরিত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বেন্থামের ভাবশিষ্য হিতবাদী বেণ্টিঙ্কের পর ভারতবর্ষের অবস্থা যেমন অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের মনোবৃত্তিরও তেমনি অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। কোন বিষয় বা প্রথার যুক্তিযুক্ততা বা মানবিকতা অপেক্ষা কোন ধর্মের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে কিনা বিচার ক'রে তবেই তাঁরা তার সংশোধন বা নিবারণের চিন্তা করতে সুরু করেছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন ক'রে এই কুপ্রথা নিবারণের জন্যে যখন এদেশের সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায় বারবার রাজদ্বারে আবেদন জানাতে থাকলেন, তখন সরকার সেই আবেদনের যুক্তিযুক্ততা অপেক্ষা বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বেশি ক'রে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। বহুবিবাহ যে শাস্ত্রীয় প্রথা নয় এই কথা প্রমাণ ক'রে সরকারকে নিশ্চিন্ত ক'রে এই অশাস্ত্রীয় প্রথার বিরুদ্ধে আইন রচনায় প্রবুদ্ধ করার জন্যেই যেন বিদ্যাসাগরের গ্রন্থরচনার প্রয়োজন হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর হিন্দুবিবাহের মূল কথা আলোচনা ক'রে দেখিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিবাহবিষয়ে যে চার রকম বিধি নির্দিষ্ট আছে, তার কোনটির দ্বারাই বহুবিবাহের পোষকতা হয় না। মনুর বিধি অনুসারে চারটি বিভিন্ন প্রয়োজনে বিবাহকার্য সমাধা হ'য়ে থাকে। বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষার পর মানুষ বিবাহ ক'রে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে। অকালে স্ত্রীবিয়োগ হ'লে গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় বিবাহ করা প্রয়োজন। এই দুই বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহকে 'নিত্য' বিবাহ বলে। বিবাহ ভিন্ন মানুষ গার্হস্থ্যাশ্রমের অধিকারী হয় না। আবার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের অন্যথা হ'লে মানুষ আশ্রমভ্রংশ দোষে পাতকগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় বিধি অনুসারে অর্থাৎ স্ত্রীর অকাল-মৃত্যুর পর যে বিবাহ তাকে 'নিত্য' বিবাহও বলা যেতে পারে আবার 'নৈমিত্তিক' বিবাহও বলা যেতে পারে। কারণ, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম বিবাহের মত পুনর্বিবাহের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্তাশ্রয়ী ব'লে এই বিবাহে নৈমিত্তিকত্বও আছে। তাই সাধারণভাবে এই বিবাহকে 'নিত্যবিবাহে'র অন্তর্ভুক্ত করা হ'লেও নৈমিত্তিকত্বহেতু এই বিবাহকে বিশেষভাবে 'নিত্যনৈমিত্তিক' বলাই শ্রেয়। বিবাহের তৃতীয় বিধি অনুসারে স্ত্রী বন্ধ্যা হ'লে অষ্টম বৎসরে, মৃতপুত্রা হ'লে দশম বৎসরে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হ'লে একাদশ বৎসরে এবং অপ্রিয়বাদিনী হ'লে

কালবিলম্ব না ক'রে বিবাহ করতে বলা হয়েছে। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতির নিমিত্ত এই বিবাহ হ'য়ে থাকে ব'লে একে 'নৈমিত্তিক বিবাহ' বলে। বিবাহের চতুর্থবিধি অনুসারে রতিবাসনা পূরণার্থে অনুলোম পর্যায়ে বর্ণান্তরে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই বিবাহের পেছনে কোন ধর্মীয় বা সামাজিক কারণ নেই, ব্যক্তিগত রতিবাসনার পূরণই এই বিবাহের একমাত্র কারণ ব'লে একে 'কাম্য' বিবাহ বলা হয়েছে।

মনুবিধানোক্ত এই 'নিত্য', 'নিত্যনৈমিত্তিক', 'নৈমিত্তিক' ও 'কাম্য' বিবাহ-বিধির মধ্যে একমাত্র 'কাম্য বিবাহ' বিধি ভিন্ন বহুবিবাহের কোথাও পোষকতা পাওয়া যায় না। তাও আবার 'কাম্যবিবাহে'র ক্ষেত্রে সবর্ণা একাধিক স্ত্রীগ্রহণে নিষেধ করা হয়েছে। এই বিধি অনুসারে অনুলোমক্রমে অসবর্ণা বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র রমণী বিবাহ করবে, ক্ষত্রিয় কেবলমাত্র বৈশ্য এবং শূদ্র রমণী বিবাহ করবে, বৈশ্য কেবলমাত্র শূদ্র রমণী বিবাহ কর'বে। শূদ্রের 'কাম্যবিবাহে' কোনরকমই অধিকার নাই। 'কাম্যবিবাহ' বিধি অনুসরণ শাস্ত্রীয় হ'লেও অসবর্ণাবিবাহ লোকব্যবহার বিরুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্তমান যুগে বহুবিবাহ করার কোন শাস্ত্রীয় বিধি নাই। তাই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে সম্পূর্ণভাবে অশাস্ত্রীয় ব'লে ঘোষণা করলেন।

মনুনির্দিষ্ট বিধি অনুসরণে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ-প্রথা গ'ড়ে উঠলেও কতকগুলি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও তাকে প্রভাবিত ক'রেছে। বাঙালী হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণবর্ণের কৌলীন্যপ্রথা তেমনি একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। বল্লাল সেনের নিজস্ব রচনায় কোন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও কুলজীগ্রন্থ অনুসারে কিংবদন্তীর রাজা আদিশূরের পর দশ পুরুষ গত হ'লে রাজা বল্লাল সেন বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের সৎপথে আনার জন্যে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন করেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান—এই নয়টি গুণের সমাহার হ'লেই তিনি ব্রাহ্মণকে কৌলীন্যসম্মানে ভূষিত করতে থাকেন। এই নয়টি গুণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। এককালে ব্রাহ্মণ মাত্রেই এই নয়টি গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কাল বৈগুণ্যে তাঁদের সর্ব-বিদ্যার লোপ হওয়ায় তাঁদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্যে কৌলীন্যের লোভ দেখাতে হয়। এককালে যে গুণ থাকলে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দেওয়া যেতো এখন সেই গুণের জন্যে কুলীন ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত হওয়া গেল। লক্ষ্য করার ব্যাপার, গুণগত উৎকর্ষ না ঘটলেও কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে

সঙ্গে পদবী বা সামাজিক মর্যাদার বাহ্য আড়ম্বর বৃদ্ধির সূত্রপাৎ হোল।

বল্লালসেন যে নয়টি গুণের ওপর জোর দিয়ে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে আটটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে মেধা, পরিশ্রম ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল। কেবলমাত্র একটির ক্ষেত্রে মানবীয় কোন কর্ম এষণা বা তৎপরতার কোন প্রয়োজন ছিল না, তা হোল 'আবৃত্তি' গুণ। মানুষ জৈব নিয়মে পিতামাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করে আবার জৈবনিয়মেই সন্তান উৎপাদন ক'রে পিতামাতা হয়। এই জৈব বিবর্তনধারাকে অবলম্বন ক'রেই 'আবৃত্তি'-র প্রাধান্য একদিন অন্যবিধ অষ্টগুণকে ঢেকে ছিল। চার-ভাবে আবৃত্তির প্রকাশ ঘটে—আদান, প্রদান. কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা। সমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ থেকে কন্যাগ্রহণ হোল আদান, সমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান হোল প্রদান, কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যাদান হোল কুশত্যাগ, আর কন্যার অভাবহেতু ঘটকের সামনে বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পরের কন্যাদানই হোল ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।

বল্লালের বিচারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আটটি গাঁই নবগুণবিশিষ্ট হওয়ায় কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন। চৌত্রিশটি গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট থাকায় শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা লাভ করেন। আর সদাচারহীন থাকায় চৌদ্দটি গাঁই গৌণ কুলীন ব'লে পরিচিত হন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বিবাহের ক্ষেত্রে নিয়ম হোল যে, কুলীনেরা কেবলমাত্র কুলীনের সঙ্গেই আদান-প্রদান করবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয় ঘরে কন্যা দান করতে পারবেন না, দিলে বংশজ ব'লে পরিগণিত হবেন; গৌণকুলীনের কন্যা গ্রহণও করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই নিয়মে পাঁচটি থাকের উৎপত্তি হোল কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ, গৌণকুলীন আর পঞ্চগোত্র বহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

বাঙালী ব্রাহ্মণের পতনের যে অনিবার্য গতি নিবারণের জন্যে বল্লাল কৌলীন্যপ্রথার ব্যবস্থা করেন, সেই গতিপথেই কৌলীন্যপ্রথাও একদিন কন্যা-বিবাহমাত্রকে অবলম্বন ক'রে হাস্যকর এক পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটালো। আবৃত্তিগুণের মধ্যেও হাজার দোষ ঢুকে কালক্রমে আবৃত্তিগুণমাত্রঅবলম্বী কুলীনদের অবস্থা সঙ্গীন ক'রে তুললো। সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে দেবী-বর নামক এক ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণদের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভাগ করলেন। একে বলা হোল 'মেলবন্ধন'। বল্লাল গুণ অনুসারে কৌলীন্য নির্ণয় করেছিলেন

দেবীবর দোষ অনুসারে মেলবন্ধন করলেন। কৌলীন্যের নবগুণের অষ্টগুণ অবলুপ্ত হ'য়ে একমাত্র আবৃত্তিআশ্রয়ী কৌলীন্যপ্রথা কালক্রমে সর্বগুণহীন হ'য়ে কেবলমাত্র দোষের দ্বারা পরিচিত হ'তে লাগলো। কৌলীন্য নিয়ম অনুসারে বর্তমানে কাকেও আর কুলীন বলা চলে না। কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের সময় বিবাহবিধি কিছুটা কড়াকড়ি করা হ'য়েছিল। মেলবন্ধনের সময় তা অস্বাভাবিকভাবে আরও কড়াকড়ি করা হোল। ফলে, বিবাহদানের পরিধি ক'মে গিয়ে বহুবিবাহের প্রচলন ঘটালো। সম্পূর্ণ ধর্মহীন ব্যক্তিদের অধার্মিক বিধিবলে আবির্ভূত কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহপ্রথার পেছনে তাই ধর্মের কোন সমর্থন নাই। কারণ অধর্মই যে সমাজের ভিত্তি, সেখানে ধর্মবিধির কোন কথাই ওঠে না। বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হ'লে কুলীন ব্রাহ্মণের ধর্মনাশ হবে ব'লে অনেকে প্রতিবাদ করলে, বিদ্যাসাগর এমনিভাবে কৌলীন্যপ্রথার উদ্ভব ও বিবর্তনধারা আলোচনা ক'রে দেখালেন কুলীন ব্রাহ্মণের প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই নাই, কতকগুলি অধর্মীয় দোষ আশ্রয় ক'রে টিঁকে থাকা কুলীনদের তাই ধর্মনাশেরও কোন সম্ভাবনা নেই।

কুলীনদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আবার বহুবিবাহরাহিত্যের দ্বারা ভঙ্গ কুলীনদেরও ক্ষতি হবে ব'লে মনে করলেন। শ্রোত্রিয় ঘরে কন্যা দিলে কুলীন বংশজে পরিণত হতেন। বংশজকন্যা গ্রহণ করলেও কুলীনের কুলহানি ঘটতো অথচ কুলীনে কন্যাদান ক'রে বংশজরা বংশগৌরব বাড়াতে চেষ্টা করতেন। এর জন্যে দুটি জিনিষের প্রয়োজন ছিল—বংশজকন্যার পিতার আর্থিক সঙ্গতি আর কুলীনপুত্রের পিতার অর্থলোভ। দুই-এর মিল হ'লে বহু পুত্রবান কুলীন অর্থের বিনিময়ে একটি পুত্রকে বংশজ ঘরে বিক্রয় করতেন। কোন ধর্মীয় কারণে নয়, অর্থকারণে এই অনিয়ম ধর্মের চোখে খুব বড়ো দোষ ব'লে প্রতীয়মান হয়-নি। তাই বংশজকন্যা বিবাহকারী কুলীন স্বকৃতভঙ্গ কুলীন ব'লে পরিচিত হ'লেও তাঁর পিতা বা ভ্রাতাদের সেই কুলভঙ্গ দোষ স্পর্শ করেনি। কুলভঙ্গ ক'রে কুলীনকে কন্যাদান করা অনেক বংশজেরই আয়ত্তাতীত, তাঁরা স্বকৃতভঙ্গ কুলীনকে কন্যাদান ক'রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইলেন। কিঞ্চিৎলাভের আশায় বংশজকন্যা বিবাহ করা তখন স্বকৃতভঙ্গ কুলীনদের ব্যবসা হ'য়ে উঠলো। আর যে হতভাগিনী মেয়েরা পিতার স্বর্গলাভের পথ পরিষ্কার করতে গিয়ে বহুবিবাহের যুপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হোল, আজীবন পিতৃগৃহে বা মাতুলগৃহে পরিচারিকার জীবন-যাপনই তাদের একমাত্র ভবিতব্য হ'য়ে উঠলো। এই অস্বাভাবিক অমানবিক পরিস্থিতিতেও ব্যভিচার ভ্রূণহত্যাদোষ প্রবল

হ'য়ে উঠতে বাধ্য। তাই বিদ্যাসাগর তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করেছেন, 'এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত, পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই।' এই কুলহীন ভঙ্গ-কুলীনদের ধর্মবোধ আহত হবার ভয়ে, বহুবিবাহ নিরাকরণে উদ্যোগী না হওয়ার কোন কারণ নাই। অনেকে বলতেন বহুবিবাহপ্রথা পূর্বে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তার দৌরাত্ম্য কমে গেছে। তাদের মিথ্যাবাচনের অর্থহীনতা প্রমাণ করার জন্যে বিদ্যাসাগর একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। সেখানে দেখি ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা বজায় রেখেও আঠারো বছরের বালক পাঁচটি কন্যার পিতৃকুলকে উদ্ধার ক'রে ফেলেছে।

কুলীন ব্রাহ্মণদের মতো কুলীন কায়স্থদের মধ্যেও বিবাহবিধিতে কিছু বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। কায়স্থরা কুলীন ও মৌলিক দুই ভাগে বিভক্ত। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কুলীন-কন্যা বিবাহ না করলে জাতিনাশ ঘটে। কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তাদের ক্ষেত্রে মৌলিক-কন্যা বিবাহে কোন বাধা নেই। আবার মৌলিক কায়স্থের ক্ষেত্রে কুলীন-কন্যা বিবাহ ও কুলীনপাত্রে কন্যাদান খুব শ্লাঘার বিষয়। কুলীনের দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রকে কন্যাদানে বাধা না থাকলেও অর্থবান মৌলিক কায়স্থরা কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকেই কন্যাদান করতে চান। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কুলীন জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথমে কুলীন-কন্যার পাণিপীড়ন ক'রে পরে মৌলিক-কন্যা বিবাহ করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রের এই মৌলিক-কন্যাকে দ্বিতীয় বিবাহকে বলা হোত 'আদ্যরস' আর যে মৌলিক গৃহে এইরকম বিবাহ হোত তাদের বলা হোত 'আদ্যরসের ঘর'। কিন্তু এই ব্যবস্থা রহিত হ'লে কায়স্থদের কোন ধর্মহানি হয় না এবং হিন্দুবিবাহবিধিতে কোথাও এই অদ্ভুত নিয়মের উল্লেখ নাই। তাই বহুবিবাহবিধি নিরুদ্ধ হ'লে কায়স্থদের ধর্মহানির সামান্য সম্ভাবনাও ছিল না।

বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুক্তির অসারতা উপলব্ধি ক'রে অনেকে আবার অতি আধুনিক যুক্তিবাদ, গণতান্ত্রিক অধিকার বোধ প্রভৃতি আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে কাজ হাসিল করতে চাইছিলেন। বহু-বিবাহ একটি সামাজিক কুপ্রথা, এই কুপ্রথার নিরাকরণে সমাজের সচেতন লোকেরাই এগিয়ে আসবেন, তার জন্যে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া কোনক্রমে উচিত নয়। সরকার যদি তা করতেও চান, তাহ'লে প্রজার অধিকারে অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হবে, এই ছিল তাঁদের অভিমত। তাঁদের এই যুক্তিতে বিদ্যাসাগরও হেসেছিলেন, একশ বছর পরে আমরাও হাসছি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণী আইন থেকে ১৯৫৫

খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুবিবাহ আইন পর্যন্ত দীর্ঘদিনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এদেশে কোন সামাজিক বৈষম্য বা কুপ্রথাকে আইনের সহায়তা ভিন্ন নিবারণ করা যায়নি। এমন কি অস্পৃশ্যতা বর্জনের মতো একটি মানবিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এদেশে আইন করতে হয়েছে। যে শিক্ষা বিস্তারের সহজ পথে এইসব সামাজিক অন্যায় বিদূরিত হওয়ার কল্পনা করা হোত, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকগুলিরই সমানতালে বিস্তার ঘটেছে। যেমন পণপ্রথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে পণের টাকার অঙ্কও এদেশে দীর্ঘাকৃতি লাভ ক'রে চলে।

বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অসামাজিকতা প্রমাণিত হ'য়ে গেলেও শেষ চেষ্টা হিসেবে ভারতবর্ষের মতো বহুজাতি ও ধর্মের দেশে সকলের জন্যে এই প্রথা নিরোধক আইন রচনা করা যথার্থ হবে না ব'লে ক্ষীণকণ্ঠের একটা প্রতিবাদ উঠেছিল। তাদের ভ্রান্তি বা দিবাস্বপ্ন আপনোদনের জন্যে বিদ্যাসাগর স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ এবং কিছুটা পরিমাণে কায়স্থ বর্ণের মধ্যে এই কুপ্রথার যে বিষময় ফল প্রকাশিত হয়েছে, তারই নিরাকরণের জন্যে কেবলমাত্র এই প্রদেশের এই ধর্মাবলম্বীদের জন্যে এই আইন চাই। মিছামিছি বাংলাদেশের মুসলমান বা বাংলা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালী হিন্দুমুসলমানের কথা তুলে মূল বক্তব্যকে অস্পষ্ট ক'রে তোলায় কোন লাভ নেই।

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনের মতো এই বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনেও বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় পথই অবলম্বন করেছিলেন। এর একটি কারণ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের মতো এক্ষেত্রেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, এদেশের লোক তখনও পর্যন্ত যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রবাক্যের ওপরই বেশি নির্ভর করতো। যুক্তির প্রশংসা করলেও তারা অন্ধভাবে শাস্ত্রবাক্যেরই অনুসরণ করতো। আর একটি কারণ ছিল বিদেশী বিধর্মী রাজপুরুষদের প্রত্যয় উৎপাদন। ভারতবাসীর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করাতেই তারা সিপাহীবিদ্রোহে সামিল হয়েছিল ব'লে ইংরেজ রাজপুরুষদের একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। বহুবিবাহবিরোধী আইন রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা তাই অতি সাবধানী পদক্ষেপে এগোতে চেয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যয়ার্থেই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা, অসামাজিকতা ও অধর্মীয়তা প্রমাণ করেছিলেন বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে।

বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পরোক্ষ ফল হিসেবে তথাকথিত

শাস্ত্রবিধির প্রতি সচেতন বাঙালী মানসের ঔদাসীন্য সৃষ্টির যেমন প্রবল সম্ভাবনা ছিল, বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর তেমনি বাঙালীসমাজে কৃত্রিম জাতিভেদ ও অহেতুক জাত্যাভিমানের মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত হয়েছিল ব'লে মনে হয়। বিদ্যাসাগর সুনিপুণ বিশ্লেষণ সহকারে বাঙালী হিন্দুর উচ্চবর্ণের বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণদের আদি ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলির যে পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন, তাতে কোন শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তির পক্ষেই আর জাত্যাভিমান বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। যে জাতি বিংশতি প্রজন্ম ধ'রে ক্রমাগত অধোগতির দিকে এগিয়ে গেছে, তার অস্তিত্বরক্ষার জন্যে কখনও গুণের সমাহারে কখনও দোষের ঐক্যে গোষ্ঠীবন্ধনের যে ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছিল, তারই করুণ পরিণতিতে কেবলমাত্র কন্যার বিবাহকে অবলম্বন ক'রেই জাতিরক্ষার শেষ বাঁধ বাঁধা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেই বল্লাল সেনের আমলেই হারিয়ে বসেছিল। তাই তিনি ব্রাহ্মণকে আকস্মিক জন্মসূত্রে পাপ্ত ব্রাহ্মণত্বের গ্লানি থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই তাদের মনে উন্নতিলাভের আশা জাগাতে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে কুলীনও তার নবগুণের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সহজতম বৈশিষ্ট্য কন্যাদানকে অবলম্বন করলো। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জীবনে আর কোথাও প্রকাশিত হ'ত না, কেবলমাত্র বিবাহমণ্ডপেই তার দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হ'তে থাকলো। আবার সেখানেই থেমে থাকলো না। নানাবিধ সামাজিক দোষ সেটুকু বৈশিষ্ট্যকেও ঢেকে ফেললো। তখন ঘটকপ্রবর দেবীবর সেই দোষের ঐক্যেই কন্যাদানের বৈশিষ্ট্য রক্ষার চেষ্টায় মেলবন্ধনের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণ জাতি এই পতনের বিবর্তন ধারায় বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে তাদের মধ্যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই। ইতিহাসের আলোকে এই সত্য উপলব্ধি করলে কোন ব্রাহ্মণের আর জাত্যাভিমান থাকে না। ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমানই যেখানে ভিত্তিহীন, ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির আত্মগৌরবের সেখানে কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিদ্যাসাগর শাস্ত্র আলোচনা ক'রে কেবলমাত্র সমাজসংস্কারই করেননি, বাঙালী হিন্দুর জাতিভেদকণ্টকিত মুমূর্ষু অবস্থায় সামাজিক সাম্য আনয়ন ক'রে তাকে আধুনিক মানবতাবাদের উপযুক্ত পরিবেশও দান করেছিলেন। এই উপলব্ধির প্রভাবেই বাঙালীজীবনে বিবাহমণ্ডপের জাতিসচেতনতা আজ ক্রমশ বিলীয়মান হ'য়ে পড়েছে। বিদ্যাসাগর তাই শতবৎসর পূর্বেকার এক ঐতিহাসিক ঝঞ্ঝাবাতাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাঙালীর ইতিহাস আলোকিত করেননি, বর্তমান যুগেও

আধুনিক বাঙালীর চিন্তা, চেতনা ও সামাজিকতায় তিনি আজও জীবন্ত হ'য়ে আছেন। সমাজজীবনে তাঁর এই প্রভাব নারী মানবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থেকে সঞ্জাত ব'লে তাঁর নারীকেন্দ্রিক সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা আজও মূল্য হারায়নি।

বিদ্যাসাগরের নারীচেতনা তথা সংস্কারসাধনার পেছনে ঐতিহাসিক যুগচেতনা প্রধানভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও তাঁর সর্ব প্রচেষ্টার উৎস ও প্রেরণাস্থল ছিল নারীমানবের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ। তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে প্রতিটি স্তরে তিনি স্নেহময়ী নারীর কল্যাণ-হস্তের যে মাঙ্গলিকী লাভ করেছিলেন, তার সামান্যতম ঋণপরিশোধের চেষ্টাতেই তিনি সংকীর্ণচিত্ত নির্মম সামাজিক বিধিবিধানের যূপকাষ্ঠ থেকে নারীকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। পল্লীগৃহে পিতামহী ও মাতার স্নেহকোমল আশ্রয়ে থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর জীবনালোচনায় পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ যেরকম শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বদাই উল্লেখিত হয়েছেন, তাঁর পিতামহী দুর্গাদেবী ঠিক সমপরিমাণেই নেপথ্যবাসিনী রয়ে গেছেন। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সর্বকর্তব্যভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে এই অসামান্যা রমণী যেভাবে বনমালীপুর ও বীরসিংহের প্রতিকূল আত্মীয়স্বজনদের বিরোধও বিদ্বেষের উজান ঠেলে তাঁর সংসারতরণীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বল্প পরিসরে বর্ণিত সেই কাহিনীর মধ্যেই আমরা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সার্থক উদ্দেশ্যমুখিনতা এবং একটি আদর্শ জীবনানুসরণ প্রবণতার পরিচয় পাই। চাকরিব্যপদেশে পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন কলকাতাপ্রবাসী, তাই বিদ্যাসাগরের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে এই মহিয়সী রমণীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায়।

জীবনীকারদের কুণ্ঠিত লেখনীমুখে বিদ্যাসাগরজীবনে দুর্গাদেবীর প্রথম সচেতন উপস্থিতি দুরন্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের নানাবিধ অপকীর্তির মোকাবিলার ক্ষেত্রে। প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের মা পার্বতী ও স্ত্রী সুভদ্রাকে বিরক্ত করার জন্যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদের গৃহদ্বারে প্রত্যহ মলমূত্র ত্যাগ করতেন। মথুরের মা এই কাজকে যতই ঐশ্বরিক বিভূতির প্রকাশ বলে মনে করুন না কেন তার স্ত্রী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠতো, ঠাকুরমা আর গুরুমশাইকে ব'লে শাসন করার ভয় দেখাতো। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হোত ব'লে মনে হয় না। কারণ পাঠশালার পাঠের শেষে গুরু কালীকান্ত যাকে 'অধিক রাত্রি হইলে, প্রত্যহ স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া বাটীতে আনিয়া, পিতামহীর নিকট পাঁহুছাইয়া দিতেন,' তাকে যে তিনি শাসন করবেন, তা বোধ হয় না। আর যে পিতামহী

দুষ্ট বালকের অনিষ্ট আশঙ্কায় দিবারাত্রি শঙ্কিত হয়ে থাকতেন, নিজের প্রচণ্ড অপছন্দের কাজ করলেও যাকে কোনদিন সামান্য ভর্ৎসনাবাক্যও প্রয়োগ করতে পারেননি, তাকে শাসন করা ছিল তাঁর চিন্তারও অতীত।

লেখাপড়া শেখানোর জন্যে পিতা ঠাকুরদাস পাঁচ বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে কলতাতায় নিয়ে এলে বালক বিদ্যাসাগর পিতামহীকে ছেড়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন,—

'আমি পিতামহীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছুদিন, তাঁহার জন্য, যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম।'[১]

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রক্তাতিসার রোগে পড়লেন। নানারকম চিকিৎসাতেও যখন তাঁর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন দুর্গাদেবী নিজে কলকাতা এসে তাঁকে বীরসিংহের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে জলবায়ু ও স্থান পরিবর্তনে তাঁর শরীরের উন্নতি হোল, তিনি অচিরেই আরোগ্য লাভ করলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করার অল্পদিন পরেই বিদ্যাসাগরের পিতামহী দুর্গাদেবী পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত শোকাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন, কারণ পিতামহীর প্রতি বাল্যের আকর্ষণ তাঁর কর্মদীপ্ত যৌবনমধ্যাহ্নেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। তখনও ছোট্টছেলের মতো তাঁর কাছে বিদ্যাসাগরের আদর আবদারের অন্ত ছিল না। কঠিন বাস্তবের কর্তব্যময় খররৌদ্রের মধ্যে দুর্গাদেবী তখনও তাঁর জীবনে পত্রছায়াময় শীতল নিভৃত পরিবেশ গড়ে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের তাই একটি নিভৃত নিশ্চিন্ত সর্বসন্তাপহারিণী আশ্রয় চূর্ণ হয়ে গেল। অতি স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি তাই শোকব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন। পিতামহীর শ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে তিনি তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন।

দুর্গাদেবীর মৃত্যুর বহুদিন পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি অশ্বত্থবৃক্ষকে কেন্দ্র ক'রে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যেও বহুকালপূর্বে লোকান্তরিতা পিতামহীর প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরই অনুগ্রহে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিবেশী ডাক্তার নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা করা অশ্বত্থগাছটি বিনষ্ট করতে উদ্যত হ'লে উত্তেজিত বিদ্যাসাগর আদালতে যেতেও পশ্চাৎপদ

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত' বিদ্যাসাগর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩

হননি। ভাই শম্ভুচন্দ্র এই আপাততুচ্ছ বিষয় নিয়ে মামলামোকদ্দমায় অনিচ্ছা প্রকাশ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন,—'তুই মর্, তাহা হইলে আমি স্বয়ং লাঠি হাতে করিয়া গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ঐ গাছ রক্ষা করিব'। সে কাজ অবশ্য তাঁকে করতে হয়নি। অনেক বিবাদবিসংবাদের পর তাঁরই সপক্ষে ব্যাপারটির আপোষ মীমাংসা হ'য়ে যায়। দুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষরক্ষার মধ্য দিয়ে, নিজের শেষ জীবনেও, বিদ্যাসাগর, বহুকাল পূর্বে পরলোকগতা সেই মহিয়সী রমণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনির্বাণ প্রকাশটিকেই উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্র তাই লিখেছিলেন,

"তিনি যে কেবল মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এমত নহে; পিতামহীদেবীর প্রতিও আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি নিজের স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে কখনও আদালতে মকদ্দমা উত্থাপিত করেন নাই।"[১]

বিদ্যাসাগরজীবনে মাতা ভগবতীদেবীর প্রভাব ও অবদানের কথা আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি'। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর গ্রন্থে ভগবতীদেবীর ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি লিখেছিলেন,

'অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না—চিত্রপটের উপরিতলেই সৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা ও উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়তনেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহুদূর এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।'[২]

চিত্রে ভগবতীদেবীর মুখমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ এই যে স্বর্গীয় প্রভা লক্ষ্য করে-ছিলেন, তা ছিল তাঁর গভীর ও উদার হৃদয়বৃত্তির সহজ বহিঃপ্রকাশ। সর্বা-তিশায়ী দয়াধর্মের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতিমা। বিহারীলাল তাঁর সেই দয়া-ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

'বিদ্যাসাগরের জননীর মতো দয়া-দাক্ষিণ্যবতী রমণী প্রায় দেখা যায় না।...

১ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃ. ২২৭

২ 'বিদ্যাসাগর চরিত' চারিত্রপূজা

এই করুণাময়ীরই করুণাকণা পাইয়া, অতুল মাতৃভক্তিবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় জগতে করুণাময় নাম রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, যদি আমার দয়া থাকে ত মা'র নিকট হইতে পাইয়াছি, বুদ্ধি থাকে ত বাবার নিকট হইতে পাইয়াছি।'[১]

বিদ্যাসাগরজীবনীগুলির সর্বত্রই ভগবতীদেবীর অমৃতময়ী চারিত্রগুণের অমৃতকণা ছড়িয়ে আছে। ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে এক অগ্নিদুর্ঘটনায় বীরসিংহের বসতবাটী ভস্মীভূত হ'লে বিদ্যাসাগর ভগবতীদেবীকে কলকাতায় আনতে চান। কিন্তু তিনি অসম্মত হ'য়ে উত্তর পাঠান,—'আমি কলিকাতা যাইব না। কারণ, যে সকল দরিদ্রলোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলে, তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে? কে দরিদ্র বালকগণকে স্নেহ করিবে? বেলা দুই প্রহরের সময় যে সকল বিদেশস্থ লোক ভোজন করিবার মানসে এখানে সমাগত হন, কে তাঁহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা-পূর্বক ভোজন করাইবে? যে সকল কুটুম্ব আগমন করিবেন, কে তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইবে?'[২]

বৃদ্ধবয়সে ঠাকুরদাস কাশীবাসী হয়েছিলেন। ১২৭৬ সালের শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগর ভগবতীদেবীকেও তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি ঠাকুরদাসকে বললেন, 'এখন হইতে এস্থলে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমরা দেশে অবস্থিতি করিলে, অনেক অক্ষম দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবেসিবর্গের অনাথ শিশুগণের আনুকূল্য করিতে পারিলে, আমার মনে সুখ হইবে। আমার মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে, আমি আমার সময় বুঝিয়া আসিব।'[৩] এই যে-কর্তব্যভারে ভগবতীদেবী বীরসিংহ ছেড়ে কলকাতা বা কাশীতে থাকতে পারেননি, তার একটি সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

'ভগবতীদেবী এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন। পরিশ্রমে কখনও কাতর হইতেন না। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক বা অধিক হউক, গৃহে পরিবারবর্গের সেবার্থে হউক বা অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যাতেই হউক, কখনও বিমুখ ছিলেন না। দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলকে

১ 'বিদ্যাসাগর' চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ২৭

২ শম্ভুচন্দ্র—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃ. ১৯২

৩ শম্ভুচন্দ্র—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃ. ১৯৮

আহার করাইয়াও নিজে সহজে আহার করিতেন না, এইরূপ অনশনে অপেক্ষা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন উপবাসী অতিথি কিংবা কোন দরিদ্র-লোক একমুষ্টি ভাতের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্নব্যঞ্জন লইয়া আহারে বসিতেছেন, এমন সময়ে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই ব্যঞ্জনে তাঁহার সেবা করিয়া, হয় নিজে উপবাসে কাটাইতেন, না হয় বধূদিগের কেহ পুনরায় তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, তবে অপরাহ্নে আহার করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে নিজের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেন, বাজারের ফেরৎ লোক স্নানাহার না করিয়া কেহ দ্বার অতিক্রম করে কি না। এরূপ লোককে যাইতে দেখিলে, ডাকিতেন, স্নান করিতে বলিতেন, স্নান করিলে পর একমুঠা ভাত খাইয়া, না হয় চারিটা জলপান লইয়া যাইতে বলিতেন।'[১]

কেবলমাত্র অন্নদানেই নয়, মানুষের সর্ববিধ দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে ভগবতীদেবী সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। চণ্ডীচরণ একটি কাহিনীতে তার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,

'একবার বাড়ীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বাটীর অন্য কাহারও কাহারও জন্য সেগুলি আসিয়াছিল। প্রতিবেশিগণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শীতে বড় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে, শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশী গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া, অবশিষ্ট কয়খানিও শেষে ঐরূপে নিতান্ত অসচ্ছল ও শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন: "ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্যে লেপ পাঠাইয়া দিবে"।'[২]

বিদ্যাসাগর জননীর এই দয়াবৃত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোন প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা

১ 'বিদ্যাসাগর' চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৯৩-৯৪

২ 'বিদ্যাসাগর' চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৯৫

বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া ওঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধিউজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না'।[১]

বিদ্যাসাগর তাঁর জননীদেবীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই দয়াবৃত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে সেকথা স্বীকার ক'রে বলেছিলেন, 'যদি আমার দয়া থাকে ত মা'র নিকট হইতে পাইয়াছি', রবীন্দ্রনাথ তাই মন্তব্য করেছিলেন, 'জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি'।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের স্বাভাবিক আন্তর্জাতিকতাবোধও তাঁর মাতৃদেবীর উত্তরাধিকার। একবার ভগবতীদেবী হ্যারিসন নামে একজন সিভিলিয়ানকে নিজের হাতে চিঠি লিখে তাঁর বাড়িতে আহারের জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সাহেবের ভোজন সময় তিনি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে আহার করান। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন,

'তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনের সময় চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ......সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী, কি দারিদ্র, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয়, কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী, কি অন্যধর্মাবলম্বী—সকলের প্রতিই সমদৃষ্টি।'[২]

বিদ্যাসাগরের মধ্যে ভগবতীদেবীর এই সর্বসংস্কারমুক্ত উদার সমদৃষ্টিরই উত্তরাধিকার লক্ষ্য করি।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রগঠনের পরোক্ষ কর্মশালাতেই মাত্র নয়, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের বিরূপ রণক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ প্রেরণার অনির্বাণ শুকতারা ছিলেন জননী ভগবতী দেবী। লৌকিক প্রথার বন্ধন এবং শাস্ত্রীয় বিধির সংস্কার সাধারণতঃ নারীর হৃদয়েই দৃঢ়মূল হ'য়ে প্রবিষ্ট হ'তে দেখা যায়। বিশেষতঃ

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত' চারিত্রপূজা
২ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃ. ১৯১-১৯২

অশিক্ষিতা নারীর যুক্তিহীন অন্ধশাস্ত্র ও দেশাচারের আনুগত্যই বাংলাদেশের পরিচিত ব্যাপার। সেকাল-প্রচলিত কোন শিক্ষাধারাতেই শিক্ষালাভ না ক'রেও ভগবতীদেবী দেশাচার ও শাস্ত্রের প্রাণহীন বাঁধনকে অস্বীকার করতে পেরে-ছিলেন, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি ও চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত নিত্য-জ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রথম প্রেরণা ও সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত জ্যোতির্ময়ী মাতৃদেবীর কাছ থেকেই। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন,

'একদিবস বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, অগ্রজ, পিতৃদেবের সহিত বীরসিংহার বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া, একটি বালিকার বৈধব্যসংঘটনের উল্লেখকরতঃ দাদাকে বলিলেন, "তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কি না" ?'[১] ঠাকুরদাসও ভগবতীদেবীকে সমর্থন করলে বিদ্যাসাগর নবোদ্যমে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে অগ্রসর হলেন। এখানেই শেষ নয়, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ ক'রে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র যখন আইন পাশ করাতে সমর্থ হলেন, এবং নানাস্থানে বিধবা-বিবাহের আয়োজন করলেন, তখনও ভগবতীদেবী সর্বদাই প্রসন্ন কল্যাণহস্তের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান। শম্ভুচন্দ্রের লেখাতেই তার প্রমাণ আছে,

'১২৬৬ সাল হইতে ১২৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য, অগ্রজ মহাশয়, বিশেষরূপে যত্নবান ছিলেন; উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, একারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত একত্রে এক পত্রে ভোজন করিতেন। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল স্ত্রীলোক আমাদের বাটীতে আসিলে, জননীদেবী এবং বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকেরা উহাদের সহিত সমভাবে পরিবেশনাদি করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইত।'[২]

১ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃ. ১০৭

২ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ. পৃ. ১৩৯

বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্যে এদেশের পুরুষেরা যখন গোপনে বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন, তথাকথিত পণ্ডিতেরা যখন শাস্ত্র ঘেঁটে কুযুক্তি ও ভাষা ঘেঁটে কটূক্তি বর্ষণ ক'রে চলেছিলেন, তখন কোন যুক্তির দ্বারা নয়, উপদেশের দ্বারা নয়, শাস্ত্র ও দেশাচারের কৃত্রিম জাল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে, ভগবতী দেবী তাঁর সহজ স্বাভাবিক জীবনাচরণের দ্বারা অভিমন্যু-পুত্রকে সমর্থন ক'রে চলেছিলেন। সেই মনস্বিনী মাতৃহৃদয়ের প্রতি আপন অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন,

"এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননীজঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।"[১]

আর এক স্নেহময়ী রমণী বিদ্যাসাগরচিত্তকে অধিকার ক'রে সারাজীবন ধ'রে তাঁকে স্নেহরসে অভিষিক্ত ক'রে গিয়েছেন। তিনি হলেন ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের ভগিনী রাইমণি দেবী। পিতামহী ও মাতার স্নেহক্রোড়চ্যুত বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই অসামান্যা রমণীর চিরন্তন মাতৃত্বের স্নেহধারায় সান্ত্বনালাভ করেছিলেন। একটি পুত্রকে কোলে নিয়ে রাইমণি অকালবৈধব্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মাতৃত্বের যে স্নেহজ্যোতি আপনার চতুর্দিকে বিকীর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন, সদ্য মাতৃস্নেহপাশচ্যুত প্রবাসী বালকের হৃদয়মন্দিরে তা চিরদিনের জন্যে মুদ্রিত হ'য়ে গিয়েছিল,—'স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার-নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে।' কোথাও প্রসঙ্গ ক্রমে রাইমণির কথা উঠলে বিদ্যাসাগর চিরদিন প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন। রাইমণি তাঁর একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন পার্থক্য করেননি, পরম স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। সারাজীবন এই স্নেহের মূর্তিমতী প্রতিমাকে ঈশ্বরচন্দ্র আপনার হৃদয়মন্দিরে স্থাপন ক'রে গিয়েছেন। কেবলমাত্র তাই নয়, তাঁর মমতাময়ী মাতৃচেতনার প্রভাবেই ঈশ্বরচন্দ্রের মর্মচেতনা ও কর্মপ্রবণতা বহুলাংশে রূপলাভ করেছিল, প্রবীণ বিদ্যাসাগর মুক্তকণ্ঠে সেকথা স্বীকার ক'রে তাঁর অসমাপ্ত আত্মচরিতে লিখেছিলেন,

---

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত', চারিত্রপূজা

'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'[১]

বিদ্যাসাগরমানসে নারীচেতনার স্বরূপ গঠনে আর এক নারীর পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর পিতা ঠাকুরদাসের প্রচণ্ড দারিদ্র্য আর অনাহারপীড়িত কৈশোরের এক চরম বিপর্যয়ের দিনে ঠনঠনিয়া অঞ্চলের এক মুড়ি বিক্রয়কারিণী একদিন ক্ষুৎপিপাসাকাতর ঠাকুরদাসকে আহার দান ক'রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেবলমাত্র একটি দিনের জন্যেই নয়, ঠাকুরদাসের মুখে তাঁর দুঃখকাহিনী শুনে সেই দয়াময়ী জোর ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন যে, যেদিনই আহারের অসুবিধা হবে সেদিনই তিনি যেন তাঁর কাছে আহার ক'রে যান, ফলে 'যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের জোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, আহার করিয়া আসিতেন।' স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে এই কাহিনী সেই পক্ষপাতিত্বের অনুপাতকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল,—'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এই বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, 'এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর, কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না', কারণ স্নেহশীলতাই নারী-জাতির মূল প্রবৃত্তি ব'লে বিদ্যাসাগরের অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। ঠাকুরদাসের প্রাণদাত্রী সেই অনামী অঙ্গনা তাঁর অবারিত স্নেহ ও দয়ার অফুরন্ত উৎসধারায় বিদ্যাসাগরচিত্তকে নিত্য অভিষিক্ত ক'রে তাঁর সেই বিশ্বাসকে চিরদিন উজ্জ্বল ও সজীব ক'রে রেখেছিলেন। ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাসকে অন্নদান ক'রে তিনি চিরন্তন মাতৃত্বের যে সহজাত প্রেরণার পরিচয় দিয়েছিলেন, সমগ্র নারীজাতির মধ্যেই সেই চেতনার শীতল ছায়াকে প্রসারিত ক'রে বিদ্যাসাগর সারাজীবন ধ'রে সেই মাতৃত্বের পদে পুষ্পাঞ্জলি দান ক'রে ও নারীজাতির মঙ্গলে প্রাণপাত ক'রে সে ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধের চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের অমর কর্ম-জীবন সেই প্রচেষ্টাকেই যেন প্রতিফলিত ক'রে তুলতে চেয়েছিল।

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত', বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৭৩

পাঁচ

'শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন'

১

বর্তমান যুগে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা সত্য আমরা উপলব্ধি করেছি যে, তিনি প্রধানতঃ এবং মূলতঃ ছিলেন কাজের মানুষ এবং কলম চালনা তাঁর এই কর্মচেতনাকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনাই হোক, বিতর্কমূলক রচনাই হোক অথবা শাস্ত্রমূলক রচনাই হোক, সর্ববিধ রচনার পিছনেই তাঁর একটি ক'রে উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যও এক একটি কর্মপ্রেরণাকে ঘিরেই প্রকাশপথ অন্বেষণ করেছিল। তাঁর শাস্ত্রমূলক রচনাগুলি, 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের দু'টি খণ্ড এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থের দু'টি খণ্ড রচনার পিছনেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনবিদিত। এদেশে অকাল বিধবা বালিকাদের পুনর্বিবাহের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় পটভূমি অন্বেষণই ছিল প্রথম গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য আবার বহুবিবাহের পাপ অকল্যাণ থেকে নারীকে এবং জাতিকে মুক্ত করার জন্যে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণই ছিল দ্বিতীয় গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্য, একবার শাস্ত্রীয়তা এবং আর একবার অশাস্ত্রীয়তা নির্ণয় কালে, তিনি প্রধানভাবে শাস্ত্রবাক্যের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসকেই মেনে নিয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন ছিল সম্পূর্ণ মানবিক, কিন্তু সেই মানবিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র হিসেবে প্রথমেই তিনি 'পরাশর সংহিতা'র প্রামাণিকতা ও অভ্রান্ততা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রেও তিনি মনু বচনের যথাযথ অনুসরণের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রবাণীকে যাচিয়ে নেবার একটা প্রবণতা গ'ড়ে উঠেছিল, তখন এই গ্রন্থ দু'টি রচিত হ'লে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রবাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্ততাই প্রমাণিত হোত। আবার, আধুনিক যুগে এই ধরণের গ্রন্থ রচনা, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, অধিকাংশ মানুষের কাছেই পণ্ডশ্রম ব'লে মনে হোত। কারণ, আমাদের কাছে এখন মনু-পরাশর কেন, বেদ উপনিষদ্ আর অভ্রান্ত ব'লে মনে হয় না। যুক্তির

নিরিখে তাদের সত্যাসত্য বিচার এখন আর অধর্মাচরণ নয়। স্মৃতির ব্যবস্থা, পুরাণের প্রমাণ অথবা দেশাচার শিষ্টাচারও এখন অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার্য নয়। যুগের প্রয়োজনই আজকের দিনের বড়ো কথা। সেই যুগের প্রয়োজনই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধও চরম ঔদাসীন্যে পরম অবহেলার বস্তু হয়েছে। সমাজের এই বিশেষ মানসিকতার সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের আমল থেকেই। তাই সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর শাস্ত্রবাক্য আমদানী অক্ষয়কুমার দত্ত পছন্দ করতে পারেননি এবং তাঁর এই বিশেষ উপায় অবলম্বনকে ব্যঙ্গ ক'রে ভক্তমণ্ডলীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচুর হাস্যরস বিতরণ করেছিলেন। বঙ্কিমপ্রমুখ বিদ্যাসাগর বিরোধীরা শাস্ত্রপথে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টাকে যেমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন, আধুনিক যুগের অনেক মনীষী পণ্ডিতও তেমনি এই প্রয়াসের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। নিছক বিদ্যাসাগর-বিরূপতা বা তাঁর গতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলার অসামর্থ্য সঞ্জাত এই বিরূপ সমালোচনা থেকে মুক্ত ক'রে রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রয়াসকে যথার্থ মূল্যায়নের আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে বলেছিলেন,

'অনেকে বলবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্র বচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেননি। কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হ'য়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার ক'রে গেছেন।'[১]

হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করার পূর্বে তিনি যে হৃদয় দিয়ে যে সেই সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রমাণ বিবাহবিষয়ক গ্রন্থগুলির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থটির প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন,

'বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।'

বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে আরো তীব্রভাবে,

'এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও

১ 'বিদ্যাসাগর', চারিত্রপূজা

যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।'

কিন্তু এই বিদীর্ণ হৃদয়ে আবেগোদ্বেলিত হ'য়ে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন অথবা বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে বল্গাহীন সমালোচনায় মেতে ওঠেননি। দেশের মানুষকে এই প্রথাগুলি সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলে বিধবা-বিবাহকে একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন, আর তার সঙ্গে বহুবিবাহ সম্বন্ধে সমাজমানসে একটা বিরূপতাও গ'ড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আধুনিকশিক্ষিত বিরোধীরা তাকেই শাস্ত্রপথে শাস্ত্রসমর্থন ব'লে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর-অনুসৃত পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করলে, দেখা যায় নিজ বক্তব্য উপস্থাপনায় তিনি কেবল শাস্ত্রমার্গই অবলম্বন করেননি, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিমার্গও অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সংস্কার চিন্তায় ভবিষ্যৎচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের বাস্তব ভিত্তিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল। সে যুগের সমাজে শাস্ত্রপন্থী প্রাচীনদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও যুক্তিবাদী আধুনিকদের প্রভাবও কম ছিল না। আবার তিনি এ কথাও বুঝতে পেরেছিলেন আগামী যুগের সমাজচেতনায় শাস্ত্রবচন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হ'য়ে যুক্তিরই একাধিপত্য ঘটবে। কিন্তু সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সমাজ সংস্কার পরিকল্পনায় তিনি যদি নির্মোহ বৈজ্ঞানিক যুক্তিমাত্র অবলম্বন করতেন, তাহ'লে ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষ হিসেবে সহজেই হয়তো চিনে নিতে পারলেও সমকালীন সমাজমানসে তার কোন প্রতিফলন প'ড়ে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোত না। ফলে তাঁর পরিকল্পনা পরিকল্পনাতেই নিবদ্ধ থাকতো, বাস্তবে রূপ গ্রহণ করতো না। তাই সমকালীন মানুষকে প্রভাবিত করার জন্যেই তাঁকে যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যেরও সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছিল। আর, আজ আর কে না জানে বিদ্যাসাগরের সমকালে প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে, অত্যন্ত প্রগতিবাদী আধুনিকরাও সর্বাংশে শাস্ত্রবন্ধন মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের যুক্তিধারা তাঁদের সন্তুষ্ট করেছিল, শাস্ত্রীয় প্রামাণিকতা নির্দেশ তাঁদের নিশ্চিন্ত করেছিল।

বিবাহবিষয়ক বিতর্কমূলক গ্রন্থ দু'টিতে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য তাই পাশাপাশি দু'টি বিভিন্নমুখী পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছেন, সেখানে নিজস্ব মন্তব্য পরিহার ক'রে গাণিতিক পদ্ধতিতে একটি প্রমাণ থেকে উদ্ভূত পরবর্তী প্রমাণের

উল্লেখ ক'রে ক'রে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে দেখি বিধবা-বিবাহ কর্তব্যকর্ম কিনা নির্ধারণকল্পে প্রথমেই শাস্ত্রমার্গ অবলম্বনের বিষয় ঘোষণা করেছেন। তারপর একটি সামাজিক বিষয়ের কর্তব্য কর্ম নির্ধারণে কোন শ্রেণীর শাস্ত্র অনুসরণযোগ্য নির্ণয় ক'রে ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনের কথা বলেছেন। তারপর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকারের মধ্যে কাকে অনুসরণ করবেন, ধর্মশাস্ত্রঅনুযায়ীই তা নির্ণয় ক'রে কলিযুগে 'পরাশর সংহিতা'-অনুসরণের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নির্ণয় করেছেন। তারপর 'পরাশর সংহিতা'র উদ্বাহতত্ত্ব বিচার ক'রে পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহের শাস্ত্রনির্দেশ উদ্ধার ক'রে বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের মাধ্যমে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

ধর্মশাস্ত্রের সাহায্যে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করলেও বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তিনি শাস্ত্রজ্ঞান থেকে উপলব্ধি করেননি। বালবিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখে বিচলিত হ'য়েই তিনি করুণার্দ্রহৃদয়ে তার প্রতিবিধানকল্পে বিধবা-বিবাহের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কোন শাস্ত্রবচন অনুসরণের জন্যে নয়, সামাজিক অনিষ্ট এবং বাল্যবিধবাদের দুঃখ দূর করার জন্যেই এই চিন্তা তাঁর মনে এসেছিল ব'লে তাঁর গ্রন্থের বক্তব্যের উপস্থাপনা-পদ্ধতিই স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠেছে,

'বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে ততদূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।'

একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে নিজের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রে তিনি তাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। অনেকে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বুঝেও শাস্ত্রশাসনের ভয়ে কিছু করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর কিন্তু কেবলমাত্র যৌক্তিকতা উপলব্ধি ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে পারেননি, শাস্ত্রীয়তা নির্ণয়েও সচেষ্ট হয়েছিলেন; যদিও শাস্ত্র তাঁর কাছে উপায় হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল, উপেয় হবার যোগ্যতা অর্জন করেনি।

'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধের অভিজ্ঞতায় তিনি কেবলমাত্র যুক্তিপথ অনুসরণ না ক'রে শাস্ত্রমার্গও অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ রচনা ক'রে তাঁর আবার নতুন

অভিজ্ঞতা ঘটেছিল যে, শাস্ত্রও নয়, যুক্তিও নয়, দেশাচারই একমাত্র সমাজ-নিয়ন্তা। আরও অভিজ্ঞতা ঘটেছিল,

'ধর্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।'

এই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তি বা শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ না ক'রে কেবলমাত্র ব্যঙ্গ ও কটূক্তি দিয়েই তাঁর বক্তব্যকে তুচ্ছ ক'রে তুলতে চেয়েছিল। তিনি তাতে উত্তেজিত হননি বা তাদের বক্তব্যকে পাশ কাটিয়েও যাননি। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদের বক্তব্যের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। সেই উত্তর প্রসঙ্গেই তাঁর বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকটি রচিত হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

বিধবা-বিবাহবিষয়ক এই দ্বিতীয় গ্রন্থটি বিচার করলেই আমরা বিদ্যাসাগর বিরোধী প্রাচীন সম্প্রদায়টির চরিত্র নির্ণয় করতে পারি। আগড়পাড়ার মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, কাশীপুরের শশিজীবন তর্করত্ন ও জানকী-জীবন ন্যায়রত্ন, পুটিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, জনাই-এর জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর রত্নরাজি আজ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কালের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ এইসব রত্নেরা যুগান্তরে উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে গত শতাব্দীর সীমারেখার মধ্যেই জীবাশ্মে পরিণত হয়েছেন। আর তাঁদের উত্তরপুরুষেরা কৃত্রিম রত্নের জাল কেটে শাস্ত্রব্যবসার ক্ষুদ্রতা পরিহার ক'রে আজ বৃহৎ জনারণ্যে মিশে গেছেন। তাঁদের এই পরিণতি বিদ্যাসাগর পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের উত্থাপিত বিরুদ্ধ যুক্তির সমুচিত উত্তর দানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সর্বদেশের সর্বকালের চিরন্তন মানবতাবোধের দ্বারে বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। যদি কেবলমাত্র শাস্ত্রবচনেই তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের একমাত্র সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করতেন, তাহ'লে শাস্ত্রবিধির মধ্যেই নিজ বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখে রত্নসেবার মাধ্যমেই আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাতেন।

কিন্তু তবু তিনি প্রাচীনপন্থী এই সমস্ত শাস্ত্রব্যবসায়ীদের তুচ্ছ করেননি বা শীতল ঔদাসীন্যে তাঁদের যুক্তিজাল অগ্রাহ্য করেননি। তাঁদের উত্থাপিত যুক্তি-জাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং অত্যন্ত সচেতন সতর্কতার সঙ্গে একটি একটি ক'রে যেভাবে খণ্ডন করেছেন তাতে বর্তমান যুগে অতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হয় তিনি তাঁদের প্রতি অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ ক'রে তাঁদের সামাজিক মর্যাদাই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতো বাস্তববাদী সমাজ সচেতন ব্যক্তি এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন না বিশ্বাস করা যায় না।

সচেতনভাবে একাজ করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য একাজের ফলাফলের দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়।

২

বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর একটি মাত্র যে স্মৃতি-গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছিলেন তা হোল 'পরাশর সংহিতা'। সমগ্র 'পরাশর সংহিতা' বললেও ভুল বলা হয়, 'পরাশর সংহিতা'য়, 'নষ্টে মৃতে ·' ব'লে পুনর্বিবাহবিষয়ক যে শ্লোকটি আছে সেটিই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদীরা তাই তাঁদের বক্তব্য এই 'পরাশর সংহিতা' এবং তার অন্তর্গত পুনর্বিবাহবিষয়ক শ্লোকটির বিরুদ্ধেই সংহত করেছিলেন।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে যুগে যুগে মানুষের শক্তিহ্রাসহেতু ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। সত্যযুগের জীবনযাত্রা নির্বাহ হোত মনু নির্দেশিত স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণ ক'রে। ত্রেতাযুগে গোতম নিরূপিত ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য ছিল। শঙ্খ-লিখিত নিরূপিত ধর্ম ছিল দ্বাপর যুগের ধর্ম আর কলিযুগের ধর্ম পরাশর নিরূপিত ধর্মশাস্ত্র অনুসরণ ক'রেই পরিচালিত হয়। কলিযুগে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকার, এমন কি মনুর বচনেরও প্রাধান্য অস্বীকার ক'রে কেবলমাত্র পরাশর বচনের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-উদ্ধৃত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই নির্দেশ এদেশের অধিকাংশ স্মার্ত পণ্ডিতেরই অজানা ছিল। তাই বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ক'রে তাঁরা বললেন, কলিতে পরাশর নির্দেশিত স্মৃতিই একমাত্র মান্য ব'লে 'পরাশর সংহিতা'র ঘোষণা গ্রন্থরচনার একটা প্রচলিত রীতিমাত্র। যে কোন ব্যক্তিই গ্রন্থ রচনাকালে নিজগ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যে এই ধরণের ঘোষণা করতেন। নিজেদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তাঁরা আগম শাস্ত্রের কথা পাড়লেন। আগম শাস্ত্রে আছে সত্যযুগে বেদের ধর্ম, ত্রেতাযুগে স্মৃতির ধর্ম, দ্বাপর যুগে পুরাণের ধর্ম, আর কলি যুগে আগম শাস্ত্রের ধর্মই প্রধান ও অনুসরণযোগ্য। তাঁদের বক্তব্য হোল আগমের এই বচন প্রশংসার্থেই উক্ত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে, এই বচনের কোন প্রয়োগও নাই অনুসরণযোগ্যতাও নাই।

আগমবাক্যটির প্রয়োগ বা অনুসরণযোগ্যতা থাক বা না থাক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই বাক্যটি রচিত হয়েছিল ব'লে বিদ্যাসাগর বিচার ক'রে দেখালেন। আগমশাস্ত্র হোল মোহশাস্ত্র। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, জ্ঞানীদেরও মোহগ্রস্ত ক'রে সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণু ও মহেশ্বর যুক্তি ক'রে

আগম শাস্ত্র সৃষ্টি করেন। তাই বেদ স্মৃতি পুরাণ ভুলিয়ে দেবার সচেতন উদ্দেশ্য থেকেই আগম শাস্ত্রকে কলিযুগের একমাত্র প্রামাণ্য ও অনুসরণযোগ্য ব'লে আগমোক্ত ওই বচনের সৃষ্টি। সেই জন্যেই আগমকে বেদবিরুদ্ধ মোহন শাস্ত্র বলে। আগমোক্ত ওই রচনাটিকে কোন ক্রমেই অকারণ আত্মপ্রশংসাব্যঞ্জক বলা চলে না।

'পরাশর সংহিতা' যে কলিযুগের একমাত্র প্রামাণ্য স্মৃতিগ্রন্থ, তা কেবল 'কলৌ পরাশর স্মৃতঃ' ঘোষণাটির ওপর নির্ভর ক'রেই বোঝা যায় না।* বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বিস্তৃত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছিলেন 'পরাশর সংহিতা'র পরিকল্পনা, বক্তব্যভঙ্গী ও প্রকাশ রীতিতেই বোঝা যায় কেবলমাত্র কলিযুগের আচরণীয় ধর্ম নির্ণয়ের জন্যেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। 'পরাশর সংহিতা'র প্রথমেই উল্লেখ আছে যে, কয়েকজন ঋষি ব্যাসদেবের কাছে কলিযুগের ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি তাঁর পিতা পরাশরের কাছে ঋষিদের নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা অনুসারে মহর্ষি পরাশর কলিযুগের যে ধর্ম ও আচার নির্দেশ করেছিলেন, তাই 'পরাশর সংহিতা' নামে বিখ্যাত হয়। অতএব কলিযুগে পরাশর স্মৃতিই একমাত্র অনুসরণযোগ্য ব'লে 'পরাশর সংহিতা'র ঘোষণা নিছক আত্মপ্রশংসাবাচক নয়, তা যথার্থভাবেই কলিযুগের আচার ও ধর্মনির্দেশক একমাত্র স্মৃতি গ্রন্থ।

অনেকে 'পরাশর সংহিতা'কে কেবলমাত্র কলিযুগের শাস্ত্র না ব'লে সর্বযুগের শাস্ত্র ব'লে প্রচার ক'রে বলতে চাইলেন, মহর্ষি পরাশব কেবলমাত্র কলিযুগের ধর্মই নির্ণয় করেননি, তিনি অন্য তিনটি যুগ অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের অনুষ্ঠেয় ধর্মও নির্ণয় করেছেন। পরাশর স্মৃতিকে এমনি একটি বিস্তৃততর পটভূমিকার ওপর উপস্থাপিত ক'রে তাঁরা পরাশরের বিধবা-বিবাহবিষয়ক বিধানটিকে ধ্বংস ক'রতে চাইলেন। পরাশরকে যদি কেবলমাত্র কলিযুগপ্রবক্তা ব'লে স্বীকার করা যায়, তাহলে সেই বিধানটি কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না, কারণ, উক্ত গ্রন্থের প্রতিটি প্রাপ্ত পুঁথিতেই শ্লোকটি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় বিধবা-বিবাহ নিষেধক কোন বিধানই পরাশর বচনকে খণ্ডন করতে পারে না। 'পরাশর সংহিতা'কে কেবলমাত্র কলিযুগ ধর্ম নির্ণায়ক হিসেবে অপ্রমাণ করা ছাড়া তাই বিদ্যাসাগর বিরোধীদের কোন উপায় ছিল না। আর 'পরাশর সংহিতা'কে বিশেষভাবে কলিযুগ ধর্ম নির্ণায়ক স্মৃতিগ্রন্থ হিসেবে স্বীকার না ক'রে সাধারণভাবে সকল যুগের ধর্মনির্ণায়ক স্মৃতিগ্রন্থ হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে কলিযুগে বিধবা-বিবাহনিষেধক পুরাণ-প্রমাণ খাড়া ক'রে

সেই সাধারণ রচনাকে খণ্ডন করা চলতো। বিদ্যাসাগর তাঁর বিরোধীদের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুতর্ক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই দৃঢ়ভাবে পুনরায় 'পরাশর সংহিতা'র কলিযুগধর্মনিয়ামকত্ব প্রমাণ করলেন। আরও প্রমাণ করলেন, কোন পুরাণকথা যদি স্মৃতি বচনের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, শাস্ত্র বচন অনুসারে সেক্ষেত্রে পুরাণ প্রমাণ অগ্রাহ্য ক'রে স্মৃতি বচনই গ্রাহ্য হবে; কেবলমাত্র তাই নয়, স্মৃতিবচনের সঙ্গে বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধ দেখা দিলে স্মৃতিবচন অস্বীকার ক'রে বেদবাক্যই তখন গ্রাহ্য হবে। শাস্ত্রানুসারে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বেদই গ্রাহ্য এবং স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে স্মৃতিবচনই গ্রাহ্য হবে ব'লে শাস্ত্রীয় নির্দেশ কেবলমাত্র একটি সাধারণ বিধি নয়, এর পেছনে একটি সমাজতাত্ত্বিক সমস্যারও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় হিন্দুধর্ম বৈদিক চিন্তাজাত, বেদানুসারী এবং একমাত্র বেদকেই প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার করে ব'লে যে প্রচলিত বিশ্বাস, এই বিধান তার বিরুদ্ধবাদী। কারণ, বৈদিক ধর্মানুসারী হ'লে ভারতীয় হিন্দুধর্মে স্মৃতিবচন কখনও বেদ বিরোধী হোত না আর পুরাণ কথাও বেদ বা স্মৃতি বিরুদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতো না। বেদ বাক্যের অভ্রান্ততার প্রচলিত বিশ্বাস সত্ত্বেও বেদবাক্যের বিরোধী চিন্তাও মাথা তুলেছিল ও স্মৃতিশাস্ত্রে সে চিন্তা প্রাধান্য লাভও করেছিল। সেখানেই তা থেমে থাকেনি। পুরাণ কাহিনীতে বেদের বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে আবার স্মৃতি বচনের বিরুদ্ধতাও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী যুগে এই মতান্তরজাত বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যেই আবার নতুন ক'রে বিধান রচনার প্রয়োজন পড়েছিল। শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন ক'রে বিদ্যাসাগর বেদ প্রাধান্যের অলীকতা সম্বন্ধে এই তথ্য উদ্ধার করেছিলেন ব'লেই বাংলাদেশে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দিন শেষ হয়েছিল, সাধারণ শিক্ষিত মানুষ অন্ধ কুসংস্কারের স্থলে ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করার জন্যে যুক্তি বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল। তাই একথা সহজেই বোঝা যায় বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাক্য দিয়ে শাস্ত্র সমর্থন করেননি। শাস্ত্রবাক্যে উদ্ধার ক'রে তিনি শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে উদ্ধার ক'রে মানুষকে সুস্থ যুক্তিবোধের আলোকে আনয়ন করেছিলেন।

'পরাশর সংহিতা' বিশেষভাবে কলিযুগের ধর্মনির্দেশক গ্রন্থ না হ'য়ে সাধারণভাবে সর্বযুগের আচরণীয় এবং অনাচরণীয় বিধিবিধান দানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল ব'লে প্রমাণ করতে না পেরে অনেকে বললেন গ্রন্থটির প্রথম দুই অধ্যায়ে কলিযুগের উল্লেখ আছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তার কোন উল্লেখ

নাই ; তাই এ গ্রন্থকে একান্তই যদি কলিযুগ ধর্মনির্দেশক বলতে হয়, তবে প্রথম দুই অধ্যায় সম্বন্ধেই সে কথা বলা যাবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলি কোনক্রমেই কলি ধর্ম নির্দেশক বলা যাবে না। কলি ধর্ম নিরূপণই যে 'পরাশর সংহিতা' রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তা প্রথম অধ্যায়ের ঋষি বচন, ব্যাসকথন ও পরাশর নির্দেশের দ্বারাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পূর্ববর্তী যুগের টীকাকারগণও গ্রন্থটিকে সেই উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করেছিলেন। 'পরাশর সংহিতা'র প্রধান ভাষ্যকার, বিধবা-বিবাহবিদ্বেষী মাধবাচার্যও সকল কল্পেই কলিযুগের ধর্ম নিরূপণ করাই 'পরাশর সংহিত'ার উদ্দেশ্য ছিল ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। অন্যান্য ভাষ্যকারেরাও স্বীকার করেছিলেন কেবলমাত্র কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই 'পরাশর সংহিতা' সঙ্কলিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর-প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা 'পরাশর সংহিতা'র মূল গ্রন্থের তাৎপর্য, প্রাচীন ভাষ্যকারদের মতামত প্রভৃতি অগ্রাহ্য ক'রে দ্বিতীয় অধ্যায়েই পরাশরের কলিযুগ ধর্মকথনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্যে একটি হীন শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরাশর চারি বর্ণের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির নির্দেশ দান ক'রে লিখেছিলেন, 'চতুর্ণামপিবর্ণানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ,' অর্থাৎ চারি বর্ণের এই হোল সনাতন ধর্ম। তারপর সেই সনাতন ধর্মের অন্যথা করলে কি পাপ হয় তার নির্দেশ ক'রে তিনি লিখেছিলেন,

বিকর্ম কুর্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ ॥

অর্থাৎ, 'দ্বিজসেবা অস্বীকার ক'রে যদি শূদ্রেরা বিকর্ম করে তা'হলে তারা অল্পায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়।'

প্রতিবাদীরা পূর্ব শ্লোকের একছত্র এবং এই শ্লোকটির এক ছত্রকে একত্র ক'রে পরাশরের নামেই একটি নতুন শ্লোক রচনা করলেন,

'ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥'

অর্থাৎ, 'তারা অল্পায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়। চারিবর্ণের এই সনাতন ধর্ম।' স্বসৃষ্টি এই বচনের ব্যাখ্যা ক'রে তাঁরা দেখালেন কলিযুগের অনুরূপ ধর্মের আচরণে লোকে অল্পায়ু হবে এবং নিরন্তর পাপ কাজের আচরণের জন্যে মৃত্যুর পর নরকে পতিত হবে। অতএব কলিকালে চারি বর্ণের এই হোল সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ তারা নিরন্তর পাপ কাজকেই ধর্ম ব'লে গ্রহণ করবে।

প্রতিবাদীদের সৃষ্ট এই কৃত্রিম পরাশর বচনের দ্বারা অতি সহজেই প্রমাণ

করা যায় এখানেই অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষেই পরাশরের কলিধর্ম নির্ণয় প্রয়াস শেষ হয়েছে। তাঁরাও সেই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মতো প্রাচীনপন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্দেশ্যপরায়ণ শাস্ত্রব্যবসায়ীরা যুগ যুগ ধ'রে এমনি ধরণের বিকৃত শাস্ত্রবাক্যের অপব্যাখ্যা ক'রে যুগ, জাতি ও মানবজীবনের প্রচণ্ড ক্ষতি ক'রে এসেছে। এদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সংস্কৃত ভাষা জানেন না আর প্রাচীন হিন্দুধর্মের শাস্ত্রসমূহ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত, তাই তাঁদের প্রতারণা করতে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কোন অসুবিধাই ছিল না। বিদ্যাসাগর তাঁদের এই সুপরিকল্পিত প্রতারণাজাল ছিন্ন ক'রে দিলেন। তিনি প্রকৃত পরাশর বচনের যথার্থ অর্থ ক'রে তাঁদের অসদুদ্দেশ্য প্রকাশ ক'রে দিলেন। তথাকথিত শাস্ত্রকে বিকৃত করার অপপ্রয়াস দেখে সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

বিদ্যাসাগরের প্রত্যুত্তরে কেবলমাত্র 'পরাশর সংহিতা'র প্রথম দুই অধ্যায় মাত্র কলিধর্মনির্ণায়ক মতাবলম্বীদেরই মুখোশ খুলে গেল না, নির্বিচারে শাস্ত্র বাক্য মেনে চলার যুগানুগত প্রবণতাতেও অবিশ্বাসের ফাটল দেখা দিল। চিন্তাশীল মানুষ শাস্ত্র নিয়ে এই ধরণের নীচ শঠতায় শাস্ত্রব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেই সংশয়ান্বিত হ'য়ে উঠলো। যুগ যুগ ধ'রে এই শাস্ত্রানুগত্য মানুষের যে সহজ মানবীয় বৃত্তির গলা টিপে ধরেছিল, এই অবিশ্বাসের রন্ধ্রপথে তা প্রকাশলাভে উন্মুখ হ'য়ে উঠলো। শাস্ত্রবচন সংগ্রহের অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে বিদ্যাসাগর তাই শাস্ত্রকে সমর্থন করেননি, নির্বিচার শাস্ত্রবিধিপালনের স্থানে মানবতাবাদী যুক্তি-বোধের ভিত্তিও নির্মাণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের বিরুদ্ধতায় শাস্ত্রবচনকে বিকৃত করার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। 'পরাশর সংহিতা'র যে বচনটি বিধবা-বিবাহের পরিপোষক ব'লে বিদ্যাসাগর উদ্ধার করেছিলেন, পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রজ্ঞানের আত্মস্ফীতিতে সেই বচনটিকেই বিধবা-বিবাহবিধায়ক না ব'লে বিধবা-বিবাহনিষেধকরূপে প্রমাণ করতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর-উদ্ধৃত পরাশরবচনের দ্বিতীয় চরণের শেষার্ধে 'পতিরণ্যো বিধীয়তে'-র নতুন পাঠ নির্দেশ ক'রে পণ্ডিতেরা বললেন, বিদ্যাসাগর চরণটির বিকৃত পাঠ দিয়েছেন, প্রকৃত পাঠ হবে 'পতিরণ্যো অবিধীয়তে'। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সমাস বা সন্ধির কোন সূত্রেই 'অবিধীয়তে' শব্দটি সিদ্ধ করা যায় না ব'লে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছিলেন।

পরাশরবচনকে বিকৃত করার সর্ববিধ প্রয়াস ব্যর্থ হ'লে বিদ্যাসাগর

প্রতিবাদীরা বচনটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নানাবিধ সন্দেহ উত্থাপন করতে লাগলেন। বচনটিকে কৃত্রিম ব'লে ঘোষণা ক'রে তার প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বললেন, বিধবা-বিবাহের বিধান দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে পরাশর বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলতেন না আর ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধানও দিতেন না। কারণ পুনর্বিবাহের ফলে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের আর সম্ভাবনা থাকে না। তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল উদ্দিষ্ট বচন পরাশরের নয়, হিন্দুধর্মের অধঃপতনকালেই ওই কৃত্রিম বচন 'পরাশর সংহিতা'র মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেই স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে স্ত্রী বা স্বামীর যে শোক বা দুঃখ হবে না, এই ধরণের সিদ্ধান্ত অলীক এবং বাস্তবজ্ঞানশূন্যতার পরিচায়ক। আবার মৃত্যু ভিন্ন অন্যান্য কারণেও স্বামী বা স্ত্রী, স্ত্রী বা স্বামীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেও দুঃখ হবে না বলা অর্থহীন। আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে মেয়েদের ক্ষেত্রে বৈধব্যদশামাত্রেই দণ্ডস্বরূপ। বার বার সেই বৈধব্যদশার আবির্ভাব, পুনর্বিবাহের সম্ভাবনাসত্ত্বেও তাই কোন নারীরই কাম্য নয়। কেবলমাত্র প্রতিপালনের বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বা প্রাকৃতিক যৌনচেতনার কারণে ভর্তা অবলম্বন সুস্থ মানবচেতনার বিরোধী। সেই পাশবিক চিন্তাজগৎ থেকে উঠে এসে হৃদয়, মন, চেতনা প্রভৃতির প্রভাবে মানুষ যে সমাজ বা সংসার সৃষ্টি করেছে সেখানে গ্রাসাচ্ছাদন বা রক্ষণাবেক্ষণই বড়ো কথা নয়, প্রেম বা ভালোবাসা-রূপ একটা হৃদয়গত কারণও বর্তমান থাকে। সেই হৃদয়ভঙ্গজনিত দুঃখও পরাশর উদ্দিষ্ট দণ্ড ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে। আর যে পাঁচটি কারণে নারীর পুনর্বিবাহের বিধি 'পরাশর সংহিতা'য় নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই পাঁচটি কারণে পূর্বস্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে পুনর্বিবাহ করা নারীর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হ'লে কোন নারী ওই সমস্ত কারণে পূর্বস্বামী পরিত্যাগ ক'রে পুনর্বিবাহ করতে পারে, আর ইচ্ছা না হ'লে তা নাও করতে পারে। স্বামী পরিত্যাগের বাসনাহীন কোন নারী অসক্ত স্বামীর নির্দেশে, বংশরক্ষার্থে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করতে পারে। অতএব প্রতিবাদী ব্যক্তিদের উত্থাপিত প্রতিবাদের কোন যথার্থ ভিত্তি নাই।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন শ্লোকের চরণগুলির স্থান পরিবর্তন ক'রে 'পরাশর সংহিতা'র প্রথম দুই অধ্যায় মাত্র কলিধর্মনির্ণায়ক ব'লে প্রমাণ করার মতো একই উপায়ে প্রতিবাদীরা পরাশরের বিধবা-বিবাহবিধায়ক বচন শঙ্খের রচিত, অতএব দ্বাপরযুগের পক্ষে প্রযোজ্য এবং কলিযুগের ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব'লে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এই উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়াসের

যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহবিষয়ক বচনটি যে শঙ্খের নয়, পরাশরেরই রচিত, তা অতিসহজেই প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা তাতে নিবৃত্ত হননি। তাঁরা তখন সেই বচনটি মনুবিরোধী এবং বেদবিরোধী ব'লে অগ্রাহ্য করার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে মনু-বিধি ছিল সত্যযুগের ধর্মশাস্ত্র আর 'পরাশর সংহিতা' হচ্ছে কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র। অতএব কলিযুগের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে মনুর এবং পরাশরের বিধির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে মনুবিধিই অগ্রাহ্য ক'রে পরাশর স্মৃতিকে অনুসরণ করতে হবে। দুই সংহিতার পার্থক্য বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই পার্থক্য দুইযুগের পার্থক্যের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছিল। সত্যযুগের জন্যে বিশেষভাবে রচিত মনুস্মৃতি সত্যযুগের অবসানের পর পরবর্তীযুগের মানুষদের পক্ষে অনুসরণ করা অসাধ্য হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই ভগবান গোতম নতুন ক'রে স্মৃতি রচনা করে-ছিলেন যুগ প্রয়োজনের বাস্তবতা স্বীকার ক'রে নিয়ে। ত্রেতা যুগে গোতম রচিত এই সংহিতাই একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ ছিল। কালক্রমে যুগাবসানে সেই ধর্মবিধিও আচরণের পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে উঠলে শঙ্খ ও লিখিত দ্বাপর যুগানুগত ধর্মশাস্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বাপরাবসানে কলিযুগের প্রারম্ভে তেমনি একই প্রয়োজনে ভগবান পরাশর নতুন ক'রে ধর্মবিধি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই মনুবিধির সঙ্গে পার্থক্যই পরাশরবিধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ; সেটা দোষের নয়, প্রকৃতপক্ষে, সেটাই তার রচিত হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল। কেবলমাত্র এই বিধবা-বিবাহবিধির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও মনুবিধিকে পরবর্তী যুগে বারবার অস্বীকার করা হয়েছে।

আবার আর একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখি, 'পরাশর সংহিতা' মনুস্মৃতির বিরুদ্ধতা না ক'রে তার পোষকতাই করেছে। মনুস্মৃতির যে ইতিহাস 'নারদ-সংহিতা'র প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে দেখি, সর্বভূতের হিতার্থে ভগবান মনু লক্ষ সংখ্যক শ্লোকে ধর্মশাস্ত্র রচনা ক'রে দেবর্ষি নারদকে অর্পণ করেন। দেবর্ষি নারদ সেই ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা ক'রে মানুষের ব্যবহারোপযোগী দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে তার একটি সারসংগ্রহ ক'রে ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। মানুষের শক্তিহ্রাসহেতু সেই সারসংগ্রহও তাদের সাধ্যাতীত উপলব্ধি ক'রে সুমতি আবার চার সহস্র শ্লোকে তার একটি সারসংগ্রহ করেন। সুমতির সেই সারসংগ্রহই মানুষেরা অধ্যয়ন করে। এর থেকে বোঝা যায় 'নারদসংহিতা' 'মনুসংহিতা'রই যুগোপযোগী সারসংগ্রহ মাত্র। 'নষ্টে মৃতে...' প্রভৃতি দিয়ে রচিত 'পরাশরসংহিতা'র বিধবা-বিবাহবিষয়ক শ্লোকটি 'নারদসংহিতা' থেকেই

গৃহীত। 'নারদসংহিতা' 'মনুসংহিতা'রই সংক্ষিপ্ত রূপ ব'লে পরাশরের এই বিধি মূলে মনুরই বিধি ব'লে প্রমাণিত হচ্ছে। পরাশর বচন তাই মনু বচনের বিপরীত কোন বিধি দান করেনি; উপরন্তু, মনুবিধিরই পারিপোষকতা করেছে।

বেদের একটি শ্লোকের অপব্যাখ্যা ক'রে পরাশর বচনকে বেদবিরোধী ব'লে প্রচার করার অপপ্রয়াসও বিদ্যাসাগর সমান দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর নির্দেশিত বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তার প্রতিবাদকল্পে প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সর্ববিধ বক্তব্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ক'রে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ধৈর্যসহকারের শাস্ত্রীয়তা বিচার ক'রে সেগুলি খণ্ডন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসের অপব্যাখ্যা ক'রেই অনেকে শাস্ত্রসাহায্যে মানবিক সমস্যা সমাধানের আপাত বৈপরীত্যের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারচিন্তার হাস্যকরতা লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হয়েছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেই সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত না হ'য়ে স্থিরভাবে বিচার করলে দেখি তিনি শাস্ত্র সমর্থনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পর্যালোচনা করেননি, বরং তাঁর আলোচনার ধারা অনুসরণ করলে আমাদের অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য বিনষ্ট হ'য়ে যায়। তাঁর আলোচনাতেই আমরা জানতে পারি ভারতীয় হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্মানুসারী ব'লে আমাদের সাধারণ ধারণা ভিত্তিহীন। কারণ, পরবর্তীযুগে রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে বেদপরিপন্থী বক্তব্যও সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। আবার পৌরাণিক যুগে স্মৃতির বক্তব্যেরও বিরুদ্ধতা দেখা দিয়েছিল। মনুর চিন্তা ও চেতনা থেকে প্রাণরস আহরণ ক'রে মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল ব'লেই মানুষের নামান্তর 'মানব' হয়েছে বলে প্রচলিত সাধারণ ধারণাও ঠিক নয়। মনু রচিত ধর্মকথা কেবলমাত্র সত্যযুগের পক্ষেই প্রযোজ্য হোত। যুগে যুগে মানুষের ক্ষমতার হ্রাস হেতু নতুন ক'রে ধর্মশাস্ত্র রচনার প্রয়োজন পড়েছিল। সেই প্রয়োজনের ধারায় মনুবিরোধী বক্তব্যও সমাজে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। বিভিন্নযুগের ধর্মনির্ণয়ের জন্যে যে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়েছিল, প্রাচীন পুরাণ ও মহাকাব্যে তার বিরোধী বক্তব্যও সবিস্তারে বর্ণিত হ'তে দেখা যায়। প্রাচীনযুগ থেকে পর্যায়ক্রমে মানুষের ক্ষমতা হ্রাসের যে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ তারও বিরোধী কাহিনী পুরাণে মহাকাব্যে দেখা যায়। বিবাহ বিষয়ে মনুর যে বিধান প্রাচীন সত্যযুগের ঋষিসমাজে তার কোন প্রভাবই দেখা যায় না। মনু পুনর্বিবাহের সম্বন্ধে যে কঠোর বিধান দান করেছেন, তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবস্থাই

সমাজে প্রচলিত থাকতে দেখি। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নারীর সর্বজন-ভোগ্যতা মনুর ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই সমর্থন করে না। দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের সপক্ষে যুধিষ্ঠির প্রাচীনকালের একাধিক প্রসিদ্ধা নারীর বহুপতিত্বের যে উদাহরণ দিয়েছিলেন তা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর বা কলি, কোনকালের ধর্মশাস্ত্রই অনুমোদন করে না। শাস্ত্র বাক্যের এইরকম পরস্পর বিরোধিতা সমাজে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল তার থেকে মুক্তিলাভের জন্যে সমাজ চিরদিনই মহাজননির্দেশিত পন্থাই অনুসরণ ক'রে এসেছে আর মহাজনরা চিরদিনই সমাজের বাস্তব প্রয়োজন বিচার ক'রেই সর্বজনগ্রাহ্য পথেরই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরও তেমনি সমকালীন জীবনে অকাল বিধবা বালিকাদের ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার পাপ থেকে রক্ষা করার জন্যে পুনর্বিবাহের বিধি দিয়েছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের শাস্ত্রানুগত্য লক্ষ্য ক'রে তিনি যে শাস্ত্র-বিচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে যেমনি শাস্ত্রীয় বিধান আবিষ্কৃত হয়েছিল তেমনি শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যবোধের পরিসমাপ্তিরও সূচনা হয়েছিল।

তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিদ্যাসাগরকে যেমন সাহায্য করেছিল, তেমনি শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত সমাজের অপকৌশল ও শঠতাও তাঁকে সাহায্য করেছিল। বিদ্যাসাগরের প্রয়াসেই আমরা জানতে পারলাম নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এই শাস্ত্রব্যবসায়ী সমাজপতিরা সচেতনভাবে শাস্ত্রবাক্যকে বিকৃত করে আর শাস্ত্রবাক্যের বিকৃত এমন কি বিপরীত ব্যাখ্যা দান ক'রে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ব্যাখ্যার সর্বত্রই একটা চরম বিশৃঙ্খলা দেখে স্বভাবতই সাধারণ মানুষ সামাজিক সমস্যার শাস্ত্রীয় সমাধান অপেক্ষা মানবিক সমাধানের সপক্ষেই ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়েছে। বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবন থেকে শাস্ত্র বা শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর রক্তচক্ষু বর্তমানে এমনিভাবেই অন্তর্হিত হয়েছে, প্রাচীন শাস্ত্রের শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়ে উদার বিশ্বচেতনার উন্মুক্ত আলোকে এইজন্যেই আজ সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, তার দৈনন্দিন ব্যক্তিজীবনে তাই স্বার্থপরার্থ, আত্মচিন্তা আর উদারতা যাই থাক না কেন, শাস্ত্রানুগত্যের কোন চিন্তা আজ নেই। এরফলেই সমাজজীবনের ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি সে যেমন অনায়াসেই উপেক্ষা ক'রে যেতে পারে, তেমনি বিশ্বের সর্বপ্রান্ত থেকেই উদ্ভূত উদার মানবতাবাদী চিন্তার শরিক হ'য়ে উঠতে পারে। তার সমাজজীবনের শাস্ত্রীয় সংস্কারসমূহ তাই আজ নির্ভেজাল উৎসবে পরিণত হয়েছে, সেখানে শাস্ত্রের স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত

মঙ্গলকামনাই আজ প্রধান হ'য়ে উঠেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই পরিবর্তনের আলোক দান করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সেই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিশ্লেষণকেই তিনি প্রধানতম উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তীব্র হলাহলজাত প্রতিষেধক দিয়ে বিষক্রিয়ার চিকিৎসার মতো তিনি শাস্ত্রপথেই আমাদের শাস্ত্রশৃঙ্খল মুক্ত করেছিলেন।

৩

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে গ্রন্থরচনার পর বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে যে সমস্ত প্রতিবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের বক্তব্যবিষয়ের অসারতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর কদর্যতাও বিদ্যাসাগরকে পীড়িত করেছিল। 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে তিনি বুঝেছিলেন এদেশে সমাজ-সংস্কারের কথা বলতে গেলে কেবলমাত্র যুক্তিমার্গ অবলম্বন করলেই চলবে না, বক্তব্য বিষয়ের শাস্ত্রীয়তাও প্রমাণ করতে হবে। সেইজন্যেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ের প্রস্তাবনা কালে তিনি নিপুণভাবে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধানানুগ বক্তব্য প্রকাশ ক'রেও তিনি দেখলেন এদেশের শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীয় বক্তব্যও স্বীকার করতে রাজী নয়। প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের বিশুদ্ধিরক্ষায় তাঁদের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শাস্ত্রকে ব্যবহার ক'রে লোকচিত্ত প্রভাবিত করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শাস্ত্রকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করতে অথবা শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের কোন সঙ্কোচ ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর যখন যথাযথ-ভাবে শাস্ত্র উদ্ধার ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিলেন তখন স্বার্থহানির সম্ভাবনায় তাঁরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। শাস্ত্রের বিকৃত উত্থাপনায় সেই শঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আবার সেই শঙ্কাই তার বহিঃপ্রকাশকেও কলুষিত ক'রে অভব্যতার চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। বিধবা-বিবাহ গ্রন্থের প্রতিবাদ পুস্তকগুলি থেকে বিদ্যাসাগরের তাই নতুন উপলব্ধি ঘটেছিল,

'ধর্মশাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আরও বাকী ছিল। বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থরচনার বেশ কিছুকাল পরে যখন তাঁর বহু-

বিবাহ বিরোধী গ্রন্থ প্রচারিত হোল, তখন আবার তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শাস্ত্রব্যবসায়ীরা তাঁর শিক্ষার সম্পূর্ণতাবিধানে অগ্রসর হলেন।

বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতির মাধ্যমে সরকারী অনুকূলতা সৃষ্টি হয়েছিল। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সরকার মানবিকতার বিচার অপেক্ষা শাস্ত্রীয়তার প্রতিই জোর দিতে চাইলে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবিধিমতেই বহুবিবাহের নিরাকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করলেন। প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রব্যবসায়ীরা আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন; অধিকন্তু, এতোদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের সর্বধিক সংস্কার কর্মে প্রবল সহানুভূতির সঙ্গে যাঁরা নিজেদের যুক্ত ক'রেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর তীব্র বিরুদ্ধতা সুরু করলেন। তাঁদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরেই বিদ্যাসাগর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর বহুবিবাহবিরোধী দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন।

বিধবা-বিবাহবিষয়ক পুস্তকের অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগর এবার প্রথম থেকে অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ, এবার তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁর এককালের সহযোগী পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তক আইনপ্রণয়নের জন্যে প্রেরিত আবেদন পত্রে তারানাথ যেমন সাগ্রহে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন, বহুবিবাহনিবারক আইনপ্রণয়নের জন্যেও তিনি তেমনি সমান আগ্রহে স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু পাঁচ ছ'বছর পরে তাঁর মনোভাব অকস্মাৎ পালটে গেল। সংবাদপত্রে পত্র প্রেরণ ক'রে তিনি তাঁর মতপরিবর্তনের কারণ প্রকাশ করলেন,

'এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয়, অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই।'[১]

পূর্বমত পরিত্যাগ ক'রে তারানাথ হঠাৎ যখন বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা উপলব্ধি ক'রে বহুবিবাহনিবারক আইন প্রণয়নের অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করলেন, তখন তিক্তকণ্ঠে তারানাথের সমালোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর লিখলেন,

'বিদ্যাচর্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয় কৃত উদ্যোগের ও নাম-স্বাক্ষরের প্রভাবে, যখন, পাঁচবৎসরে, বহুবিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচারের, অনেক পরিমাণে, নিবৃত্তি হইয়াছে; তখন, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে,

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৭

আর আড়াই বৎসরে, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎসরে, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই।'[১]

বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে তারানাথ সংস্কৃতভাষায় 'বহু-বিবাহবাদ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা ক'রে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক মতের খণ্ডন করতে চাইলেন। তাঁর এই প্রয়াসের সঙ্গে আরও কয়েকজন পণ্ডিত হাত মেলালেন। তাঁদের মধ্যে বরিশালের রাজকুমার ন্যায়রত্ন রচিত গ্রন্থটির নাম 'প্রেরিত তেঁতুল', ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের গ্রন্থের নাম 'বহুবিবাহবিষয়ক বিচার', সত্যব্রত সামশ্রমী রচিত গ্রন্থটি ছিল 'বহুবিবাহবিচার সমালোচনা' আর মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্নের প্রচারিত গ্রন্থটির নাম ছিল 'বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়'। এই প্রতিবাদী গ্রন্থগুলির বিরুদ্ধ বক্তব্যের প্রতিবাদ কল্পেই বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রথমে বিদ্যাসাগর প্রতিবাদী ব্যক্তিদের এবং তাঁদের গ্রন্থাবলীর গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে ভূমিকা রচনা ক'রে পাঠক সাধারণকে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ক'রে নিতে চেয়েছেন।

প্রতিবাদীদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাতেই সংস্কৃতকলেজে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকের চাকরি লাভ ক'রে দীর্ঘকাল সগৌরবে কলকাতার বিদ্বৎসমাজে আপন শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রয়াসে তারানাথ ছিলেন তাঁর অসমসাহসী সহযোগী। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' রচনা ক'রে বিদ্যাসাগর তাঁকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে তারানাথ তাঁকে মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। সেই তারানাথই যখন ভিন্ন যুক্তির পথ ধরলেন, বিদ্যাসাগর তখন যেমন ব্যথিত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁকে সতর্কও হ'তে হয়েছিল।

বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থরচনার অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন এদেশের শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা অপেক্ষা নিজের বক্তব্যের সমর্থনলাভের জন্যেই শাস্ত্রবচন উদ্ধার করতেন; এমন কি, সেই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবচনের বিকৃত ব্যাখ্যা করতেও ইতস্তত: করতেন না। তাই তাঁদের শাস্ত্রব্যাখ্যায় শাস্ত্রমাহাত্ম্য যতোটা না উপলব্ধ হ'ত, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকট হ'য়ে উঠতো শাস্ত্রবচন উদ্ধারকারী পণ্ডিতদের ব্যক্তিচরিত্রের শাস্ত্র-

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড ; পৃ. ৭৭

বিকৃতকারী অসৎ প্রবৃত্তি এবং অঙ্গুলীহেলনে সমাজপরিচালনার অন্ধ ঔদ্ধত্য। বহুবিবাহের পক্ষ সমর্থনকারী পণ্ডিতদের প্রতিবাদ পুস্তকের যোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদানের পূর্বে তিনি তাই সেই পণ্ডিতদের চরিত্র সম্বন্ধেও পাঠকসাধারণকে সচেতন ক'রে দিয়েছেন।

প্রথমেই তারানাথ তর্কবাচস্পতির কথা ধরা যাক, 'তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে, ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; কিন্তু, সর্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া, সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে কখনও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী শক্তি নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তদীয় বহুবিবাহবাদ পুস্তক এই কয়টি কথা অনেক অংশে, সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে।'

তারপর রাজকুমার ন্যায়রত্নের কথা, 'শুনিয়াছি, ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ; তদ্ভিন্ন, অন্য অন্য শাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তিনি, একমাত্র জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ-কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।'

ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নে বৈশিষ্ট্য হোল, 'স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মত, উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন। তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বা গর্বিত বাক্যপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি, শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন।'

সত্যব্রত সামশ্রমীর কথায় দেখি, 'সামশ্রমী মহাশয় অল্পবয়স্ক ব্যক্তি; অল্পকাল হইল, বারাণসী হইতে, এদেশে আসিয়াছেন। নব্য ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেন, এই বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তক পাঠে, কোনও ক্রমে, তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না। তাঁহার বয়সে যতদূর শোভা পায়, তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক।'

গঙ্গাধর কবিরত্নও কম নন, 'কবিরত্ন মহাশয় ব্যাকরণে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায় তাঁহার জাতিধর্ম নহে ; এবং তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি ধর্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কবিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে, একপ্রকার অনধিকার চর্চা হইয়াছে ; এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, নিতান্ত অসঙ্গত বলা হয় না।'

বিরুদ্ধবাদীদের গ্রন্থসমূহ আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর তাঁদের এই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সপ্রমাণ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন ক'রে শাস্ত্রালোচনায় তাঁদের অযোগ্যতাই জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি তাঁর বক্তব্য বিরোধীপক্ষের যুক্তিজাল খণ্ডনের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন। বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকে কিন্তু তিনি প্রতিবাদকারীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের আপাতবিরোধ তুলে ধ'রে জনসমক্ষে তাঁদের হাস্যাস্পদও ক'রে তুলেছেন। এমনিভাবেই তাঁদের প্রভাব বিনষ্ট ক'রে সাধারণ মানুষের জীবনে যুক্তির উদার আলোকে মানবতাবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিরচনাই ছিল বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরনির্ণীত ত্রিবিধ বিবাহব্যবস্থার অলীকত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের বিধির সমালোচনা ক'রে আর যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের সপক্ষে নানা শাস্ত্রীয়বিধি বচনের প্রমাণ উদ্ধার ক'রে রতিকামনাস্থলে অসবর্ণা বিবাহবিধির খণ্ডনেরও চেষ্টা করেছিলেন।

তারানাথের সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর কোন শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ না ক'রে তারানাথের শাস্ত্রজ্ঞানের সমালোচনা ক'রে মনু বচনের বিকৃত পাঠ অনুসরণজাত ভ্রান্তির প্রতি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি মাধবাচার্য, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেশ্বর ভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিব্যাখ্যাতাদের আলোচনা উদ্ধৃত ক'রে তারানাথের অনুসৃত মনু বচন যে বিকৃত তার দৃঢ় প্রমাণ দিলেন। ত্রিবিধ বিবাহবিধির অসারতা প্রমাণ ক'রে তারানাথ গৃহস্থাশ্রমকে 'কাম্য' ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর দেখালেন, অশেষ ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র মিতাক্ষরা অনুসরণ ক'রেই তারানাথ গৃহস্থাশ্রমের 'কাম্যত্ব' আবিষ্কার করেছেন। তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার ফাঁকিই এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। বিবাহ মাত্রই কাম্যবিবাহ ব'লে তারানাথ 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক' বিবাহকে অস্বীকার ক'রে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের সপক্ষে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর

হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে তারানাথের শাস্ত্রজ্ঞান আর ব্যাকরণজ্ঞানের ত্রুটি নির্দেশ ক'রে তাঁর বক্তব্যকে হাসির উপাদানে পরিণত করলেন।

অন্যান্য প্রতিবাদীদের বক্তব্যেও নতুন কিছু ছিল না। বিদ্যাসাগর অতি সহজেই তাঁদের বক্তব্য খণ্ডন করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানের অগভীরতা প্রমাণ ক'রে বহুবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে তাঁদের কথা বলার যোগ্যতা সম্বন্ধেই জন মনে সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলেন। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বিদ্যাসাগর এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এদেশে যারা সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিল, তাদের বোধোদয়ের জন্যে তিনি প্রথম থেকেই নানা যুক্তি প্রমাণ, প্রামাণ্য শাস্ত্রবচনের উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ বা প্রয়োজন অপ্রয়োজনের নিরিখে সমাজকে বিচার করতো ব'লেই তাদের কাছে যুক্তি প্রমাণ বা শাস্ত্রবচন কিছুই গ্রাহ্য ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত সমাজের বুক থেকে তাদের উৎখাত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থে তাঁর সেই প্রয়াসের সামান্য পূর্বাভাস পাওয়া যায়, বেনামী ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল।

৪

শাস্ত্রবিচারকালে বিদ্যাসাগর যতোই শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন, ততই তাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলে যেতে লাগলো। অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যাদের সম্মতি আদায়ের জন্যে তিনি শাস্ত্রসাগর মন্থন ক'রে ফেলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সে প্রয়াস বিচার করার কোন যোগ্যতাই তাঁদের নেই। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে তাঁরা শুধু অকারণ বিষোদ্গার ও কটূক্তি বর্ষণ স্বরু করলেন। তখন অত্যন্ত পরিহাসরসিক ভঙ্গীতে বিদ্যাসাগর কয়েকটি ব্যঙ্গ বক্রোক্তিপূর্ণ পুস্তিকা রচনা ক'রে বিরুদ্ধবাদীদের হাস্যকর জ্ঞানবুদ্ধিকে পদে পদে আরও হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে চাইলেন।

বহুবিবাহের সপক্ষে তারানাথ তাঁর 'বহুবিবাহবাদ' গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন ব'লে সাধারণ মানুষ তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে নি। তার ফলে বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থের 'তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে' বিদ্যাসাগর তাঁর মতের ভ্রান্তিনির্দেশ ক'রে নিজ ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যেমন সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি বেনামী ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে তাঁর সংস্কৃত

জ্ঞানের ওপর বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত ক'রে অসংস্কৃতজ্ঞ জনসাধারণের কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলারও সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর বহুবিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। যে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল 'উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লিখিত 'অতি অল্প হইল' ব্যঙ্গরচনা। এই দু'টি বিপরীতধর্মী গ্রন্থে শাস্ত্রবিধি নিয়ে বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চোখে পড়ে, তেমনি অন্যদিকে ফাজিল ফোকড় ভাইপোর জ্বালা ধরানো ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচনাতেও আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয়। একদিকে তারানাথের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে প্রমাণ বিশ্লেষণ, অন্যদিকে তাঁর ব্যাকরণজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে উদাহরণ নিদর্শন। এই দ্বৈত-প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু একটি-ই—এই সাঁড়াশী আক্রমণে বিপর্যস্ত ক'রে তারানাথকে গুরুতর অসঙ্গতিপূর্ণ একটি হাস্যাস্পদ চরিত্রে পরিণত ক'রে জনমানসে তাঁর সর্ববিধ প্রভাব বিলুপ্ত করা, তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে গুরুত্বলাভের প্রতিকূল একটি লঘু পরিবেশ ও ঔদাসীন্যবোধ সৃষ্টি করা। বিদ্যাসাগর যে এই প্রয়াসে প্রভূতপরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিলেন, পর পর অনেকগুলি ব্যঙ্গ রচনার আত্মপ্রকাশে সে কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

'বাচস্পতি প্রকরণে'-র দশটি পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর তারানাথের' 'বহুবিবাহ-বাদে'-র দশটি প্রধান সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন, আর 'অতি অল্প হইল' পুস্তিকায় ভাইপো দশটি উদাহরণে তারানাথের সংস্কৃত রচনার ব্যাকরণ বিভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন। 'বাচস্পতি প্রকরণে' তারানাথের স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞানের দৌড় নির্ণীত হয়েছে আর 'অতি অল্প হইল'-তে তাঁর সংস্কৃতভাষাজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যাকরণের অধ্যাপকের কাছে স্মৃতিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রত্যাশিত না হ'লেও রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের দ্বারদেশে দৌবারিকের মতো প্রথম প্রবেশার্থীর ভাষাজ্ঞান বিচার ক'রে যিনি প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতেন, সেই বৈয়াকরণের ব্যাকরণ বিভ্রান্তি ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। ভাইপোর লেখনী তাই ব্যঙ্গবিদ্রূপে খরসান হ'য়ে উঠেছে,

'সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে! তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি; আমার সমান কে আছে; আমি বই সংস্কৃত আর কে জানে? যাঁহারা বিশেষ জানেন তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত; তাঁর মুখের যত জোর, বিদ্যার জোর তত নয়'।[১]

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪২

খুড়োর সম্বন্ধে তাই ভাইপোর চরম সিদ্ধান্ত হোল,

'বলিতে কি, খুড়া আমার বড় নির্বোধ; অকারণে আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া, বহি লিখিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে, এ ফেসাৎ ঘটিত না'।[১]

খুড়ো বই লিখতে গিয়ে কি ফেসাৎ ঘটিয়েছেন জানার জন্যে খুড়োর লেখা বইটি খুলেই ভাইপোর চক্ষুস্থির। যে খুড়োর ব্যাকরণবিদ্যার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হ'য়ে, বিদ্যাসাগর পদব্রজে কালনা গিয়ে তাঁর প্রশংসাপত্রাদি এনে তাঁকে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই খুড়োই সংস্কৃত লিখতে গিয়ে ভূরি ভূরি ব্যাকরণ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন দেখা গেল। বিষণ্ণ চিত্তে ভাইপো দেখলেন,

'খুড়ো মনের সাধে, দেদার ভুল লিখিয়াছেন। যদি কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি, সাহস করিয়া, অর্থাৎ বিদায়ের আশায় বিসর্জন দিয়া, খুড়র ভুলের বিচার করিতে বসেন, এবং লিখিয়া, আর্যাবর্তরীতিসংস্থাপনীসভার সাহায্য লইয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন; পুস্তকখানি খুড়র পুস্তক অপেক্ষা, অনেক বৃহৎকার হয়, সন্দেহ নাই।'[২]

খুড়োর প্রতিটি ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বিশালাকৃতি গ্রন্থ মুদ্রণের সঙ্গতি না থাকায় বেচারা ভাইপোকে কয়েকটি মাত্র ভুল নির্দেশ ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে হোল। কিন্তু সেইটুকুতেই খুড়োর ব্যাকরণ বিদ্যার জারিজুরি প্রকাশ হ'য়ে গেল। সংস্কৃত লিখতে গিয়ে খুড়োর 'বিলক্ষণ ছরকট' করা দেখে ভাইপো ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন যে, 'বাবাজী যত জারি করেন, লেখাপড়ায় তত দখল নাই।'

খুড়ো সংস্কৃত সাহিত্যের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথিতযশা অধ্যাপক, কিন্তু সংস্কৃত লেখাতে অন্বয় ও ব্যতিরেকের রূপ দেখাতে গিয়ে প্রথমার স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার যে কেন করলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী তার কোন হেতুই নির্দেশ করা যায় না। তাই প্রকৃত কথা বলতে গিয়ে নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই ভাইপোকে বিরূপ মন্তব্য করতে হোল এবং খুড়োর ভুল সংশোধন ক'রে দিতে হোল। খুড়ো লিখেছিলেন,

'বিজাতীয়সংস্কারকরণযোগ্যত্বাৎ অসতি চ স্বত্বে তদসম্ভবাৎ ইত্যন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যাং' ইত্যাদি।

---

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩

২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৬

ভাইপো সংশোধন ক'রে দিলেন,

'বিজাতীয়সংস্কারকরণযোগ্যত্বম্, অসতি চ স্বত্বে তদসম্ভব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্' ইত্যাদি।

'যুক্তি' শব্দের পরিবর্তে 'তদ্' শব্দ প্রয়োগ ক'রে খুড়ো লিখেছিলেন 'তদনবলম্ব্য'; কিন্তু 'যুক্তি' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তাই 'তদনবলম্ব্য' না লিখে স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ প্রয়োগ ক'রে লেখা উচিত ছিল 'তামনবলম্ব্য'। ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ, তাই অপপ্রয়োগ।

খুড়ো 'ঘূর্ণমান' বা ঘূর্ণ্যমান না লিখে 'ঘূর্ণায়মান'-এর মতো ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সর্বসম্মত নিত্যত্বের কথা বলতে গিয়ে খুড়ো আবার লিখেছিছিলেন, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমস্য সকলসম্মতসৈব নিত্যত্বেন'; তা কিন্তু নিতান্ত আনাড়ির রচনা হয়েছিল, কারণ তার দ্বারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সর্বসম্মত নিত্যত্বের অর্থপ্রতীতি ঘটেনি। লেখা উচিত ছিল, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমস্য নিত্যতায়া এব সকলসম্মতত্বেন'।

এমনি ক'রে খুড়ো রচনা থেকে দশটি বাছা বাছা ভুল দেখিয়ে দিয়ে ভাইপোকে উপদেশ দিলেন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণ বড় খল শাস্ত্র, চিরকাল উপাসনা করিলেও, প্রসন্ন হন না,' তাই, 'সংস্কৃতয় যার ভাল দখল নাই, তার সংস্কৃত লেখা ঝকমারি। অতএব খুড়োমশাই যেন আর সংস্কৃত ভাষায় কিছু না লেখেন।

ভাইপোর সদুপদেশে খুড়োর কিছুটা চৈতন্যোদয় হোল। সংস্কৃত ভাষায় 'বহুবিবাহবাদ' গ্রন্থ রচনা ক'রে গুণিজনসংবর্ধনা লাভ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন ফাজিল ছোকরা ভাইপোর ডেঁপোমিতে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিই বরবাদ হবার জোগাড় হয়েছে। তিনি তখন সর্বজনবোধ্য বাংলা ভাষাতে ভাইপোর সমালোচনার উত্তর দিয়ে তাঁর বিভিন্ন প্রয়োগের যাথার্থ্য নির্ণয়ে অগ্রসর হলেন। ফলে আবার ভাইপোকে কলম ধরতে হোল। ওই একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে 'আবার অতি অল্প হইল' পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে তিনি দেখালেন নিজের প্রয়োগবিধির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে গিয়ে খুড়ো বেচারি আরো বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। 'ঘূর্ণায়মান' স্থলে 'ঘূর্ণমান' বা 'ঘূর্ণ্যমান' লেখার জন্যে ভাইপো যে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, তার উত্তরে খুড়ো লিখলেন,

''ঘূর্ণ' ধাতু অকর্মক, তাহার কর্ম নাই। যে ধাতুর কর্ম নাই, তাহার, কর্মণিবাচ্যে প্রয়োগ করা 'শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার' মত বলা হইয়াছে।'

ভাইপো দেখালেন খুড়োমশাই তাঁর 'শব্দস্তোমমহানিধি' নামক অভিধানে

'ঘূর্ণ' ধাতু সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ঘূর্ণ ভ্রমণে তুং উভং সকং সেট্' অর্থাৎ, ঘূর্ণধাতু ভ্রমণাত্মক, তুদাদিগণীয়, উভয়পদী, সকর্মক, ইট্‌যুক্ত। খুড়ো নিজের গ্রন্থে যা লিখেছিলেন, নিজেই তার প্রতিবাদ করছেন ; অর্থাৎ নিজের গ্রন্থের ত্রুটি নিজেই প্রচার করছেন। খুড়োর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসরণ ক'রে ভাইপো তাই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের ব্যবসা ক'রে খুড়ো নিজের অর্থলালসার নিবৃত্তিকল্পে জ্ঞানপিপাসু মানুষের সর্বনাশে উদ্যত হয়েছেন।

ভাইপোর সংস্কৃতজ্ঞানের ত্রুটি নির্দেশ ক'রে খুড়ো তাচ্ছিল্যসহকারে লিখেছিলেন, 'যে ব্যক্তি ভাইপোস্য এই মত অশুদ্ধ প্রয়াগ ক'রে তাহার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল না।' প্রত্যুত্তরে খুড়োর উত্তর দেওয়ার মতো বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নির্দেশ ক'রে ভাইপো 'ভাইপোস্য' প্রয়োগের ব্যাকরণশুদ্ধি দেখিয়ে দিলেন, 'ভাইপোস্য' এই প্রয়োগটি দু'টি সংস্কৃত পদে গঠিত। 'ভাইপঃ' 'অস্য' এই দুই পদে সন্ধি হইয়া 'ভাইপোস্য' প্রয়োগটি সিদ্ধ হইয়াছে। ভা শোভা, ইঃ কামঃ, অভিলাষ ইতি যাবৎ, তৌ পাতি রক্ষতি ইতি ভাইপাঃ, তস্য ভাইপঃ। 'সন্ধিস্তু পুরুষেচ্ছয়া'—এই ব্যবস্থাবশতঃ, লেখকের ইচ্ছাবিরহহেতু, 'ভা' 'ই' এই দুয়ের সন্ধি হইল না। ইহার অর্থ এই, অস্য কিনা খুড়স্য, ভাইপঃ শোভাভিলাষ-রক্ষিতুঃ, অর্থাৎ খুড়র, পাণ্ডিত্যশোভার ও প্রতিপত্তিলাভবাসনার রক্ষাকর্তার। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' সমুদয়ের অর্থ, খুড়র উপযুক্ত পাণ্ডিত্যশোভা ও প্রতিপত্তিলাভবাসনার রক্ষাকর্তা কোন ব্যক্তির।'

খুড়ো তাঁর উত্তর পুস্তিকায় একস্থানে অনুযোগ করেছিলেন, 'ভাইপো মহাত্মার আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি যে ইনি আমাকে এত কটূ গালি প্রদান করিয়াছেন।' এর উত্তর দিতে গিয়ে ভাইপোর ব্যঙ্গবিদ্রূপ আরও উতরোল হয়ে উঠেছে। ব্যাকরণের ভুল প্রয়োগ নির্দেশ করায় ভাইপোর ব্যঙ্গোক্তিকে খুড়ো মশাই গালি হিসেবে গ্রহণ করায় ভাইপো আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছেন। কারণ, গালি দেবার জন্যে ভাইপোকে অত কষ্টমেহনত করতে হ'ত না। তারজন্যে সদাশয় খুড়ো মশাই এতো অধিক ও সর্বজ্ঞাত কারণ ছড়িয়ে রেখেছেন যে, গালি দিতে চাইলে ভাইপোকে অনেক কম কষ্ট করতে হ'ত। যেমন, পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর এক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ বিদায়ের অধ্যক্ষতার সুযোগে খুড়ো মশাই কতকগুলো ঘড়া বিক্রী ক'রে দিয়েছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে সন্দেশের সরা বিলোতে গিয়ে, একজনকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয় জেনে, খুড়ো মশাই তার হাত থেকে সরা কেড়ে নিয়ে পরের ধনে পোদ্দারি করেছিলেন এবং নিজের পদমর্যাদা ভুলে গলায় গামছা দিয়ে

তাকে প্রহার করেছিলেন। সেই উপলক্ষেই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের ফর্দে তিনি, বিদ্যাসাগরের বিপক্ষীয় অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বপক্ষীয় রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামে আট টাকা ধার্য করলে, বিদ্যাসাগর তা সংশোধন ক'রে বারো টাকা করে দেন। ন্যায়রত্ন সেই বারো টাকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করলে তারানাথ অম্লানবদনে বিদ্যাসাগরের ওপর দোষ চাপিয়ে দেন। কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ তখন তারানাথকে ধমক দিয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ ক'রে দিলে তারানাথ চুপসে গেলেন, যেন জোঁকের মুখে নুন প'ড়ে গেল।

বিদ্যাসাগরের নামে এই ধরণের কলঙ্ক রটানোর চেষ্টা করলেও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাতেই সংস্কৃত কলেজে তাঁর চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা এতোই বহুল প্রচারিত ছিল যে, তিনি কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারেননি যে, তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি সকল কিছুর মূলেই ছিলেন বিদ্যাসাগর।

খুড়োর এই অহেতুক বিদ্যাসাগর-বিরোধিতায় অনেকেই তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর বিদ্যার গভীরতা সম্বন্ধেও অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে। তাই ভাইপো তাঁকে আর অধিক বিদ্যা প্রকাশ না করার জন্যে পরামর্শ দিলেন। ভাইপোর কথায় খুড়োর সুবুদ্ধিরই উদয় হোক, অথবা পাকপাড়ার ঘটনার মতো আরো নানা ঘটনা ভাইপোর ঝুলিতে থাকতে পারে ভেবেই হোক, খুড়ো মশাই একেবারে চুপ ক'রে গেলেন।

বহুবিবাহবিরোধী কোন আইন প্রণয়নে ভারতসরকারের অনিচ্ছা লক্ষ্য ক'রে প্রাচীনপন্থী শাস্ত্র ব্যবসায়ীর দল চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। কেবলমাত্র বহুবিবাহ ব্যাপারেই নয়, বিধবা-বিবাহ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত অপ্রমাণ করার জন্যে তারা আবার নবোদ্যমে কোমর বেঁধে লাগলো। এ-ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের সর্ব-প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রজনাথ বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের প্রায় কুড়িবছর পরে ফাঁকা আসর মাৎ করার জন্যে সচেষ্ট হ'য়ে উঠলেন। 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশনে ব্রজনাথ বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় সেই বক্তৃতা প্রকাশিত হ'লে ভাইপো আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোর সহযোগিতায় একজন 'তত্ত্বান্বেষী'র আবির্ভাব ঘটলো। তারানাথকে নিশ্চুপ ক'রে দিয়ে ভাইপো যখন তাঁর নতুন খুড়ো ব্রজনাথের গুণ সংকীর্তন সুরু করলেন, সহযোগী তত্ত্বান্বেষী তখন যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার বিবিধ বৈশিষ্ট্য বিচার ক'রে

তার সম্পাদক তারানাথ মুখোপাধ্যায়কে বিবিধ সম্বোধনে অভিহিত করলেন। ভাইপোর প্রয়াস 'ব্রজবিলাস' নামে এবং তত্ত্বান্বেষীর অনুসন্ধিৎসা· 'বিধবা-বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' নামে একই সঙ্গে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হোল।

বিধবা-বিবাহবিরোধী দ্বিতীয় গ্রন্থে এককালে বিদ্যাসাগর প্রতিবাদী পণ্ডিতদের বক্তব্য গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু এতোদিন পরে ব্রজনাথ যখন 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র প্রবর্তনায় নতুন ক'রে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন, তখন বিদ্যাসাগর দেখলেন ব্রজনাথের বক্তব্যে যুক্তিও নেই শাস্ত্রীয়তাও নেই, আছে কেবল গগনচুম্বী অহমিকা। বাংলাদেশের প্রধান সমাজের প্রধান স্মার্ত হিসেবে শাস্ত্রীয় হোক অশাস্ত্রীয় হোক, নিজ বক্তব্য প্রকাশের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিসচেতনতা তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিহীন ও অসংবদ্ধ ক'রে তুলেছিল। এক্ষেত্রে তাই বিদ্যাসাগরের নতুন কোন বক্তব্য বা করণীয় ছিল না, তাই ভাইপোকে আবার আসরে নামতে হোল।

বাংলার ধর্মাকাশে নতুন খুড়োর উদয়ে উপযুক্ত ভাইপো চঞ্চল হ'য়ে উঠে নব উদ্যমে নবীন ভাষায় খুড়ো মহোদয়ের চরিত্রকীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন। পাঁচটি উল্লাসে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে ভাইপোর নৃত্যোন্মত্ত লেখনী এক অভিনব ব্রজায়ন মহাকাব্য রচনা ক'রে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মমহিমার নিভন্ত শিখার পলতেটি যেন উসকে দিলেন। নবসৃষ্ট এই চরিত মহাকাব্যের নাম দেওয়া দেওয়া হোল 'ব্রজবিলাস'।

বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যবস্থাপত্রে ব্রজনাথ যে সমস্ত শাস্ত্রবিধির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন 'ব্রজবিলাসে' তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেবলমাত্র শাস্ত্র কথার সাহায্য নিয়েই ভাইপো ক্ষান্ত হ'তে পারলেন না। কারণ, ভাইপো বুঝেছিলেন প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে বিদ্যাসাগর নিরূপিত সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বিধবা-বিবাহবিধির বিরুদ্ধে নতুন ক'রে প্রতিবাদ উত্থাপন করতে যে-সব মহাত্মার মনে সামান্যতমও দ্বিধা বা সংকোচ জাগেনি, কেবলমাত্র শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা সেই মহাত্মাদের নিবৃত্ত করা যাবে না, তাঁদের জন্যে আর একটু কড়া 'ডোজে'র ওষুধ দরকার। শাস্ত্রবিধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাই সেই মহাত্মাদের চরিত্রবিধি বহির্ভূত মাহাত্ম্য কাহিনীও জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাইলেন। 'যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভা'র বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ফতোয়া জারি ক'রে নতুন খুড়ো ব্রজনাথ সেই মহাত্মাদের অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ

করায়, ভাইপো তাঁর অলৌকিক কীর্তিকাহিনীর দিকেই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর দুই স্ত্রীর পৌত্রদের মধ্যে শ্রাদ্ধাধিকার নিয়ে বিরোধ বাধলে নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজনাথের কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হোল। মৃত জমিদারের গুরু, প্রখ্যাত পণ্ডিত জানকী-জীবন ন্যায়রত্নের ব্যবস্থানুযায়ী এক পত্নীর উপনীত পৌত্র শ্রাদ্ধ কার্য সম্পন্ন করলে, অন্য পত্নীর অনুপনীত পৌত্রেরা ঘুষ দিয়ে ব্রজনাথের বিধান আদায় ক'রে আবার শ্রাদ্ধ করলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের হ'য়ে বিদ্যাসাগরের সম্মতি আদায় করতে এসে ব্রজনাথ নিজের মুখেই অম্লানবদনে স্বীকার করলেন যে, প্রথম শ্রাদ্ধের বৈধতার ব্যবস্থাপত্রে তিনিও ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরকারী। হতবাক বিদ্যাসাগরের বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও জানালেন যে ব্যবস্থা দেবার সময় 'বচন-ফচন' দেখার সময় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, বাংলাদেশের প্রধান সমাজ নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত পরম মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা দেন না, যে বেশি টাকা দেয় তার পক্ষেই তিনি ব্যবস্থা দেন ; আবার আরো বেশি টাকা পেলে অবলীলাক্রমে নিজের পূর্বপ্রদত্ত বিধির প্রতিবাদ ক'রে নতুন ব্যবস্থা দান করেন। ব্রজনাথের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ক'রে 'উপযুক্ত ভাইপো' শাস্ত্র ব্যবসায়ী পাষণ্ড পণ্ডিত সমাজ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তুলতে চাইলেন। এইসব অর্থলোলুপ, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরাই সেদিন বাঙালী হিন্দুসমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল। এদেরই শাস্ত্রবিরোধী বিধিবিধানের ফাঁসে রুদ্ধকণ্ঠ বাংলার হিন্দুসমাজে নারীর চরমতম অবমাননার বেদীর ওপর সমাজশাসনের প্রেতনৃত্য মনুষ্য-মর্যাদাগর্বের মাথায় পদাঘাত ক'রে চলেছিল। এদের বিরুদ্ধেই ছিল বিদ্যা-সাগরের আজীবন সংগ্রাম, এদের প্রভাব নিঃশেষ করাই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শনের অন্যতম প্রেরণা, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর লেখনী তাই ছিল ক্লান্তিহীন।

এদিকে 'উপযুক্ত ভাইপো' যখন নতুন খুড়োর দফা নিকাশ করতে ব্যস্ত, ওদিকে 'তত্ত্বান্বেষী' তখন খুড়োর খোঁয়াড় 'যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভা'র ভিত্তি নড়াতে নিযুক্ত। নলডাঙার জমিদার প্রমথভূষণ দেবরায় বিদ্যাসাগরের বিধি অনুসরণ ক'রে কয়েকটি বিধবার বিবাহ দিলে 'যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভা' সেই অনাচার থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। ধর্ম পুনঃসংস্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য

অঙ্গীকার ক'রে সে-সভার উৎপত্তি হয়েছিল আর ধর্মের ওপর আঘাতকারী আততায়ীকে নিরস্ত করার সদম্ভ প্রয়াসই ছিল তার অবশ্য কর্তব্যকর্ম। সে-যুগে বিদ্যাসাগরই ছিলেন সেই আততায়ী। তাই বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে পণ্ডিতদের সমবেত তালঠোকার ঐকতানে মুখরিত সভামণ্ডপে হিন্দুধর্মের যখন নাভিশ্বাস উঠছিল, তখন পণ্ডিত নামধারী এই হস্তিমূর্খদের মাথায় তত্ত্বের অঙ্কুশ প্রহার ক'রে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যেই 'উপযুক্ত ভাইপো'র উপযুক্ত সঙ্গী 'তত্ত্বান্বেষী' সচেষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিনয় পত্রিকা' নামে উল্লিখিত 'বিধবা-বিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী-সভা বিষয়িনী' পুস্তিকায় 'তত্ত্বান্বেষী'র সেই প্রয়াসেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নামক দুই বিশালকায় খুড়োকে ধরাশায়ী ক'রে উপযুক্ত ভাইপো একটু বিশ্রামের অবসর খুঁজছিলেন। খুড়োদ্বয় ধরাশায়ী হ'লেও তাঁদের একাধিক সহচর কিন্তু ওৎ পেতে বসেছিলেন। ভাইপোকে ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় বিশ্রামরত দেখে তাঁরা এবার মাথা চাড়া দিলেন। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নবদ্বীপনিবাসী মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পন্থা অনুসরণ ক'রে 'বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে বিদ্যাসাগর-কৃত শাস্ত্রব্যাখ্যার বিরুদ্ধতা করলেন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন এই সমস্ত পণ্ডিত যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, শাস্ত্র-বচনের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না, কেবলমাত্র নিজেদের অজ্ঞতা আর দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হ'য়ে অকল্যাণকর দেশাচারকেই সমর্থন ক'রে যান। তাই তাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হবার তাঁর আর কোন প্রবৃত্তি ছিল না। তখন ধরাশায়ী খুড়োদের এই নতুন সহচরের মোকাবিলা করার জন্যে বাধ্য হ'য়েই কলম ধরতে হোল 'ভাইপো সহচর'কে। মধুসূদন স্মৃতিরত্নের বিধবা-বিবাহবিরোধী গ্রন্থটি নবদ্বীপেরই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন এবং বেলপুকুরের আর একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন আদ্যোপান্ত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। তিন পণ্ডিতের চূড়ামণিযোগে আবির্ভূত বিধবা-বিবাহনিষেধক গ্রন্থটির প্রণেতা ও প্রেরণাদাতারা সকলেই ছিলেন 'রত্ন'—স্মৃতি-রত্ন, বিদ্যারত্ন আর ন্যায়রত্ন। এই রত্নগুলির বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্যে 'ভাইপো সহচর' যে রত্নপরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টমাসে প্রকাশিত হোল ভাইপো সহচর প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা'।

বিধবা-বিবাহবিষয়ে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রব্যাখ্যার অভ্রান্ততা প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছিল। কিন্তু নবোদ্গতশৃঙ্গ রত্নত্রয়ী সেই অভ্রান্ত শাস্ত্র-

ব্যাখ্যার কঠিন ভিত্তিমূলে শৃঙ্গাঘাত ক'রে তাকে অস্বীকার করার হাস্যকর প্রয়াস চালালে 'ভাইপো সহচর' তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন অপপ্রয়াসে শাস্ত্রবিধির কোন ক্ষতি হয়নি, বরং তাদেরই শিং ভেঙে গিয়েছে, অর্থাৎ, পাণ্ডিত্যের জারিজুরি বেরিয়ে পড়েছে।

'রত্নপরীক্ষা'র ছয়টি পরিচ্ছেদে 'ভাইপো সহচর' স্মৃতিরত্নের পাঁচটি সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি ও অসারতা প্রমাণ ক'রে স্মৃতিরত্নের পক্ষে মারাত্মক একটি তথ্য উদ্ঘাটন করলেন। স্মৃতিরত্ন তাঁর গ্রন্থটি সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের কাছে অনুকূল মতামতের আশায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একটি দীর্ঘ চিঠিতে মহেশচন্দ্র তাঁর মতামত তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের বিষয়ে কোন মত বা সিদ্ধান্ত সমর্থন করতেন, তাঁর চিঠি থেকে তা জানা না গেলেও স্মৃতিরত্নের মূর্খতার আস্ফালনে তিনি এতোই উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, মন্তব্যপ্রকাশে তাঁর পক্ষে শালীনতার সীমা রক্ষা করাও সম্ভব হয়নি। 'পতিরণ্যো বিধিয়তে' অন্ত্যক পরাশরবচনটি বিধবা-বিবাহবিষয়ক নয়, নিয়োগ-প্রথাবিষয়ক ব'লে স্মৃতিরত্ন যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন,

'বিধবাবিবাহ ঘৃণিত ব্যাপার বলিয়া তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে গিয়া অতীব পবিত্র, সাধুজনসমাদৃত নিয়োগ ব্যবস্থা প্রচার করিয়া, জগতের, বিশেষতঃ, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের আপনি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ঘরের কুলবধূকে অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে ; ঘরের বৌ ঘরে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে, অথচ জ্যেষ্ঠভ্রাতার পিণ্ডের সংস্থান হইবে। ইহারই নাম 'গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকে, পিতৃলোকের তৃপ্তি'। সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইলেও অনেকে, বিশেষতঃ, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা উহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। আপনি নিজে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই বোধ হয় পরাশরবচনের এই সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।'[১]

'ব্রজবিলাসে' 'ভাইপোস্য' কৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতিবাদ ক'রে স্মৃতিরত্ন তাঁর গ্রন্থে যে পাঁচটি সিদ্ধান্ত করেছিলেন মহেশচন্দ্র তার বিরূপ সমালোচনা ক'রে লিখেছিলেন,

'আপনি পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া ভাল করেন নাই ; দেশীয় পণ্ডিতদিগকে

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৯-৯০

পুনরায় 'ভাইপোস্য' দ্বারা অপদস্থ হইতে হইবে। 'ভাইপোস্য'র দ্বিগুণ অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে এজন্য বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম।'[১]

ব্রজনাথের পতনে ব্যথিত হ'য়ে 'ভাইপো' আর আসরে অবতীর্ণ হননি বটে, কিন্তু 'ভাইপো সহচর' তাঁর 'রত্ন পরীক্ষা' গ্রন্থে 'ভাইপো'র আরব্ধ কাজ সমাপন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। 'ভাইপো সহচর' মহেশচন্দ্রের চিঠিটি জোগাড় ক'রে 'রত্নপরীক্ষা'র সঙ্গে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। 'ভাইপো সহচরে'র যুক্তিবিচার বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের চেয়ে মহেশচন্দ্রের এই চিঠিতেই রত্ননিধনে বেশি কাজ হয়েছিল। এর সাহায্যেই 'ভাইপো সহচর' অতি সহজেই রত্ন তিনটির মূল্যহীনতা ও অসারতা প্রমাণ করেছিলেন। মহেশচন্দ্রের চিঠিটি তাই তাঁর পরীক্ষাপদ্ধতির অভ্রান্ততা প্রমাণ ক'রে কুশিক্ষিত শাস্ত্রব্যবসায়ী স্মার্তদের দন্তবিস্ফারিত মুখ-মণ্ডলে প্রচণ্ড চপেটাঘাতে শূন্যগর্ভ তর্জনগর্জনের সমাপ্তি ঘটাতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিল।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে মানবতার আজীবন পূজারী এই মহাপুরুষ শেষজীবনে কিছুটা পরিমাণে মানববিদ্বেষী হ'য়ে পড়েছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন থেকে সুরু ক'রে বিদ্যাসাগর আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছ থেকেই অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার এতো অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যে, তথাকথিত ভদ্রলোকদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু কার্মাটাঁড়ের সরলপ্রাণ সাঁওতালদের মধ্যে তিনি যতোই শান্তির অন্বেষণ করুন না কেন, মানবহিতব্রতের মহান সাধনা থেকে তিনি কোন দিনই পশ্চাদপসরণ করেননি। মানুষের অমানুষিক আচরণ তাঁর ব্যক্তিজীবনকে তিক্ততায় যতোই ভরিয়ে দিক না কেন, তাঁর কর্মজীবনে সে-তিক্ততা সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা-প্রচারের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যমিশ্রিত একটা ঔদাসীন্যবোধ বজায় রাখলেও সেই অপপ্রচার যখন ব্যক্তি ছেড়ে সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, জরাজীর্ণ রোগক্লিষ্ট শরীরেও তিনি তখন সেই দুরভিসন্ধির মুখোস খুলে দিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। এই বেনামী ব্যঙ্গ রচনাগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের মানবহিতব্রতী জীবনযজ্ঞের সেই স্থির লক্ষ্যই প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজ-সংস্কারমূলক রচনাগুলির মধ্যে যুক্তিবিচার থেকে শাস্ত্রবচন হ'য়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের ক্রমপরিণতির সঙ্গে তাল রেখে তাঁর

১ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৪-৯৫

ভাষাভঙ্গীও গুরুগম্ভীর মন্থরতা থেকে ঝর্ণাধারার উপলব্যথিত উচ্ছলতায় পরিণতি লাভ করেছে। আত্মপ্রত্যয়-সমন্বিত অধিকারবোধ নিয়ে তিনি ভাষাকে প্রয়োজনমতো নানা কাজে ব্যবহার করেছেন, ভাষাও মন্ত্রমুগ্ধ পালিতের মতো তাঁর আজ্ঞা বহন ক'রে সর্বদিকেই গতিবিস্তার করেছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর ওপর অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল ব'লেই অনায়াসস্বাচ্ছন্দ্যে বিদ্যাসাগর তাকে আপন প্রয়োজন মতো নানা কাজে নানারূপে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর সচেতন উদ্দেশ্যসিদ্ধির সফল সহায়তার পথেই বাংলা ভাষাও তার সাহিত্য-শৈশবের অস্ফুট কলকাকলি থেকে যৌবনের প্রত্যয়নিষ্ঠ উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও অপরোক্ষ প্রয়াসে বিদ্যাসাগর তাই একটি দৃঢ় সুনিশ্চিত আসন চিহ্নিত ক'রে গেছেন।

ছয়

'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'

১

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বাংলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস সুরু হ'লেও, গদ্যের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব বাংলাদেশে কোনদিনই অস্বীকৃত হয়নি। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা বা পত্রবিনিময়ে অথবা চুক্তিপত্ররচনা বা আইন-আদালতের কার্যপরিচালনায় গদ্যের ব্যবহার ছিল সর্বব্যাপক। কেবলমাত্র তাই নয়, সাহিত্যিক ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে কাব্যের মাধ্যমই সর্বজনস্বীকৃত হ'লেও সেই কাব্যের ভাষা গদ্যের ভিত্তিভূমিতেই গ'ড়ে উঠেছিল। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে যে পয়ার ছন্দের একাধিপত্য, দেববন্দনা থেকে সুরু ক'রে গণিতশিক্ষার সূত্র রচনা পর্যন্ত যে পয়ারছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হোত, সেই পয়ারছন্দের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় পদ্যরীতির ছদ্মবেশে গদ্যরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই তার সর্বব্যবহারক্ষম স্থিতিস্থাপকতার মূল কারণ, তাই যে পয়ার প্রচলিত গদ্যরীতির যতো সন্নিকটবর্তী হোতো, তার জনপ্রিয়তাও ততোই বেড়ে যেতো।

গদ্যরীতির ভিত্তিভূমিতে গ'ড়ে উঠে তার থেকেই অবিরত জীবনীরস সংগ্রহ করলেও পয়ারকে সরিয়ে দিয়ে গদ্যভাষা কোনদিনই সাহিত্যের দরবারে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন পর্বে সাহিত্য ছিল শ্রুতির বস্তু, পাঠের বস্তু নয়। এই শ্রুতিধর্ম তাকে মুখস্তমুখীন করেছিল আর মুখস্তের প্রয়োজনেই তার মধ্যে ছন্দ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনিবার্যভাবে। কিন্তু সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির বাইরে যখনই লেখনী ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত, সর্ব সাধারণের উপভোগের জন্যে নয়, ছোট ছোট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির জন্যে কিছু জানানোর প্রয়োজন হোত, তখন পয়ারের চেয়ে গদ্যের মাধ্যমই প্রাধান্য লাভ করতো। মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে এই গদ্যরচনার ব্যাপক নিদর্শন আজ দুর্লভ, কারণ সাহিত্যের জগতে তখন গদ্যের ব্যবহার স্বীকৃতি লাভ করেনি ব'লে ক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে সে-গদ্য অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, সাহিত্যের চিরন্তনত্বের খাতিরে কেউ তাদের ধ'রে রাখার চেষ্টা করেনি। তবু অসচেতন

প্রয়াসে যে দু'একটি গদ্য নিদর্শন আমাদের কাল পর্যন্ত রক্ষিত হ'য়ে এসেছে, তাদের মধ্যে আমরা যেমন মধ্যযুগের বাঙালীর কথ্যভাষার কিছু প্রমাণ পাই, মধ্যযুগীয় কাব্যভাষার ভিত্তিভূমিটিও তেমনি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

এই ধরণের প্রাচীন গদ্যনিদর্শনের মধ্যে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে পুরানো লেখাটি ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের, অহোমরাজকে লেখা কামতারাজের একটি চিঠি। কামতারাজ নরনারায়ণ অহোমরাজ চুকম্‌ফাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন বিবদমান দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তিস্থাপনের শুভেচ্ছা প্রকাশ ক'রে,

'লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি।'

কামতারাজের এই চিঠির উত্তরে অহোমরাজ যে চিঠিটি লিখেছিলেন, কিছু কিছু অসমীয়া বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, আধুনিক বাঙালীর কাছে তাও বেশ সহজবোধ্য,

লিখনং কার্যঞ্চ। অত্র কুশল। তোমার কুশলবার্তা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হৈলোঁ। আরু যে লিখিছা প্রীতিবৃক্ষ অঙ্করিত সে যে তোমার আমার সাহ্লাদেত বৃদ্ধিক পায়া ফলিত পুষ্পিত হৈবার খান যি কহিছ ই গোট বিশেষ। কিন্তু তোমার আমার প্রীতিগোট যি-হত হস্তে ঘটিছে সমস্তে জান। সেইরূপ মর্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব ফলিত পুষ্পিত কিসক ন-হৈব। আমরা পূর্ব অভিপ্রায়তে আছি।'

কামতারাজের চিঠিখানিতে বক্তব্যবিষয় সহজ সরল ভাষায় স্পষ্টভাবে সাবলীলগতিতে প্রকাশিত হয়েছে। অহোমরাজের চিঠিটিতেও এই গুণগুলি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। লেখকের বিচিত্র মনোভঙ্গী সেখানেও ভাষার মধ্যে বিভিন্ন মোচড় এনে তাকে আপন বক্তব্যের যথার্থ দর্পণ ক'রে তুলেছে। এই চিঠিগুলি পাওয়া না গেলে বিশ্বাস করাই যেতো না যে চারশ' বছর আগেকার বাংলা গদ্য এমন প্রাণবান, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক হ'তে পারে।

এই গদ্যভাষার ওপর নির্ভর ক'রেই মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যিক ভাষা গ'ড়ে উঠেছিল। নানা কারণে, বিশেষভাবে চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের দু'কূল-প্লাবী বন্যায় বাংলাদেশের সর্বপ্রান্ত যখন ভেসে গিয়েছিল, তখন সেই সাহিত্যিক ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে এক বিপুল কলেবর বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই সাহিত্যের বহুল প্রচার ও অনুশীলন তাকে লোক মুখের ভাষা সম্বন্ধে

ক্রমশ নিরপেক্ষ ক'রে তুলে আপন মহিমায় ভাস্কর ক'রে তুলেছিল। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে ষোড়শ শতাব্দীর কথ্যভাষার ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠা সেই কাব্যভাষাই সাহিত্যিক ভাবপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা কোন একটি স্থানে চিরদিন থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বাংলাভাষাও তা পারেনি। তার মধ্যেও ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমে হোল অন্ত্যস্বর লোপ, তারপর মধ্যস্বরও লুপ্ত হোল, তখন দুইএ মিলে দেখা দিল দ্বিমাত্রিকতা, অবশেষে অপিনিহিতি, অপশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির আবির্ভাব ঘটেছিল। কথ্যভাষার এই পরিবর্তন কিন্তু সাহিত্যিকভাষাকে প্রভাবিত করতে পারেনি, সে ভাষা পূর্ববৎ আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এগিয়ে চলতে থাকে। ফলে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত কথ্যভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক ভাষার যে যোগ ছিল, তা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় এবং সাহিত্যিকভাষা মূলহীন একটি স্বতন্ত্র কৃত্রিমভাষা ব'লে পরিগণিত হ'তে থাকে।

সাহিত্যিকভাষা তার সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে কথ্যভাষা থেকে প্রাণরস আহরণ ক'রে সমৃদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সাহিত্যে মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে তা যখন একমাত্র লেখ্যভাষা হ'য়ে দাঁড়ালো তখন সে সর্ববিধ গদ্যরচনাকে প্রভাবিত ক'রে বিকৃত ক'রে তুললো। গদ্য লেখার প্রয়োজনে কলম ধরলেই তখন তৎসম শব্দের ভারে, ফারসী শব্দের ব্যবহার বাহুল্যে, জটিল সমাস ও আড়ষ্ট রচনারীতির প্রভাবে প্রচলিত কথ্যভাষা এক দুর্বোধ্য কৃত্রিমভাষায় পরিণত হোত। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুর্বিপাক ছিল না। কারণ, পয়ারের উচ্ছ্বাসহীন নিস্তরঙ্গপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে বাংলা কাব্যভাষা তখন একটি অনায়াসসাধ্য মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল। বহুশতাব্দীর অনুশীলনের ফলে পয়ার তখন একটা সহজ মসৃণতা লাভ করেছিল। মুখের ভাষার সঙ্গে ছন্দের অক্ষর ও পদের এমন একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছিল যে চিন্তার প্রকাশমাত্রই তা সহজ সাবলীলগতিতে পয়ারের বাঁধাপথে অনায়াসে মুক্তিলাভ করতো। ফলে, মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে পয়ারের মাধ্যমে দুরূহতম দার্শনিক চিন্তাও যখন সহজবোধ্য সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে গদ্যমাধ্যমে একটা সাধারণ চিঠিও তখন অস্পষ্ট দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে।

কাব্যভাষার পক্ষে একটা সুবিধা ছিল যে, সারাদেশ জুড়ে একটি মাত্র সাহিত্যিকভাষার প্রচলন থাকায় সর্বত্রই যেমন তার অনুশীলন হ'ত, তেমনি সবর্বত্রই তা সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হ'য়ে গিয়েছিল। গদ্যভাষার কিন্তু সে

সুবিধে ছিল না। বিভিন্ন উপভাষাগত পার্থক্য যেমন ছিল, তেমনি উপভাষা-গুলির মধ্যেও আবার বৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গী ছিল। আধুনিক যুগে যেমন শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সচেতন বাঙালীমাত্রেরই একটা স্ট্যাণ্ডার্ড চলিত ভাষায় কথোপকথনের প্রবণতা গ'ড়ে উঠেছে, সে-যুগে এমন কোন কেন্দ্রীয় চলিতভাষা ছিল না। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাগুলিই ছিল সে অঞ্চলের একমাত্র চলিত ভাষা, সাধারণ মানুষ সেই ভাষাতেই আপনাপন বক্তব্য প্রকাশ করতেন। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা ব্যবহার করতেন বৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি উপভাষার। বৃত্তিগত সেই ভাষাগুলির পরিচয় দিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন,

'আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিনপ্রকার বাঙ্গালা প্রচলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দ্দু মিশান থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক বিষয়ীলোক ছিলেন। তাঁহাদের বাঙ্গালায় উর্দ্দু ও সংস্কৃত দুই মিশান থাকিত।[১]

নবাবী আমলে সাহিত্য তথা শিক্ষা-দীক্ষার তিনটি আশ্রয় ছিল,—নবাব দরবার, জমিদারশ্রেণী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়। এই তিনটি ভিন্ন চরিত্র ও রুচির আশ্রয় অনুযায়ী তিন ধরণের বাংলা কথ্যভাষা গ'ড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে এই তিনশ্রেণীর কথ্য বাংলা ভাষার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই তিনটি শ্রেণীর সঙ্গে একটি পাশ্চাত্য মিশনারী পদ্ধতির বাংলাভাষাও মধ্যযুগের বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ পরিধিতে বিস্তৃতির উপায় অন্বেষণ করেছিল। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ'-এ সে ভাষার রূপটি ধরা আছে। এই চাররকম ভাষাভঙ্গীর মাধ্যমেই মধ্যযুগে বিশেষভাবে যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে, বাঙালী নিজের মনোভাব লিপিবদ্ধ করতো। এভাষার সঙ্গে তখনই চলিত ভাষার আত্মিক যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, প্রচলিত কথ্যভাষাকে পরিত্যাগ ক'রে এভাষা সাহিত্যিক ভাষার অনুকরণ ক'রে তখনই সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে। ভাষাগুলির কিছু উদাহরণ নিলে দেখি,

উর্দ্দুপ্রধান বাংলা: 'কাজী হাফেজ মহাম্মদ আরজী হইল জাহের করিলক যে পরগণে জয়মুজাল দরুন মোজে কোকা ও ঘোষবাটী জমা খারিজে বঞ্জর

১ 'বাঙ্গালা ভাষা,' হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার।

১৪ চর্দ্দ বিঘা বাগ লাগাইতে হুকুম হইয়াছে কোকাতে ১৮ বিঘা ঘোড়া-চড়াতেও তিন বিঘা পরআনা ১১৩৩ সাল ৭৮ দাগে হইয়াছে তাহাকে ঘোষকার প্রজায়া ও মোড্যাচার প্রজারা আরজী হইল যে আমাদের গরু চরাইতে আর জানা নাই।' রচনাকাল ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

সংস্কৃতপ্রধান বাংলা: 'পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেয়ার জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্‌বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতশাহি মনসবদার সমেত গৌড় মণ্ডলে আশীয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া সধর্ম্মউপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্‌বিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্দিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত এবং সোনার গ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্ম অধীকারি ও বৈরাগি বৈষ্ণব সোলআনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবৎশাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোস্বামীদিগের ভক্তিসাস্ত্র হইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসনী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয় মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয়া সংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। আমরাও দিলাম।' রচনাকাল ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

বিষয়ী লোকের বাংলা: 'গরিব বাঙ্গালি লোকের দুঃখবিমোচনকারণ এবং তাহাদিগের সুখতপত্তি নিমিত্ত্যে যে নক্‌সা আমরা তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত গৌরনর জানরেল কওসলে জ্ঞাত করিতেছি ইহাতে কোন বিষয়ে আমাদিগের বিবেচনার ও লিখিবার ত্রুটি ও ভুল হইয়া থাকে তাহার যাহাতে ভাল হয় সাহেবেরা বিবেচনা করিবেন এবিষয়ে সম্পূর্ণ কারণ আমাদ্দিগে হইতে মেহনত ও তরদ্দুদ যে তক দরকার হইবেক তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ইহার ইঙ্গরেজিতে তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি এজন্যে বাঙ্গালা লিখিয়া দিলাম'। ইতি— সন ১১৯৪ সাল তেরিখ ১৫ আশাড়—

মিশনারী বাংলা: 'অপূর্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপি না; অথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এই ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গে যাইবার তাহান কৃপায়'। মুদ্রণকাল ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

এই চার রকম গদ্য নিদর্শন সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাগদ্যের নিতান্ত

কেজো রূপের নিদর্শন। সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে এগুলি রচিত হয়নি তাই সর্বসাধারণের বোধগম্যতার প্রতি এগুলিতে সামান্যতমও মনোনিবেশ করা হয়নি। যথেচ্ছভাবে বিদেশীশব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নানা পারিভাষিক শব্দও এগুলিতে নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি যে কেবল আধুনিক যুগেই দুর্বোধ্য, তা নয়, সমকালীন পয়ারের স্বচ্ছতার সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারি, এগুলি সে যুগেও সর্বজনবোধ্য ছিল না। কামতারাজ-অহোমরাজের চিঠিগুলিও সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি, কিন্তু সেগুলির সহজবোধ্যতার কারণ হোল তাদের ভিত্তি ছিল সমকালীন কথ্যভাষার ওপর। তারপর বাংলা কথ্যভাষার যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালের গদ্য লেখকেরা তার প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেননি। পূর্বতন যুগের কথ্যভাষার ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠা সাহিত্যিক ভাষা থেকেই তাই গদ্যের উপকরণ আহরণ করেছিলেন তাঁরা, তার ওপর সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শব্দের নির্বিচার ব্যবহার তো ছিলই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখের ভাষার প্রভাব সর্বত্রই যে এড়ানো গিয়েছিল তা নয়। সাহিত্যিক ভাষার ছন্দ ভেঙ্গে গদ্যের প্রবহমানতা আনতে গিয়ে এই যুগের গদ্য লেখকদের অনেক ক্ষেত্রেই কথ্যভাষার কাঠামোটিই গ্রহণ করতে হয়েছিল, হয়তো বা অসচেতনভাবেই। তাই বাংলা গদ্য ভাষার কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রমানুসারী স্বাভাবিক বিন্যাস এখানে কোথায়ও লঙ্ঘিত হয়নি, কেবল মাত্র মিশনারীদের গদ্য রচনায় তার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। ইউরোপীয় ভাষার গদ্যরীতির প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরামচিহ্নাদির ব্যবহারে সেই গদ্য রচনায় কিছুটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেশে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই চার ধরণের গদ্য ভাষা-ভঙ্গীতেও পরিবর্তন দেখা দিল। নবাব দরবারের প্রাধান্য লুপ্ত হওয়ায় উর্দু-প্রধান বাংলাভাষা তার মর্যাদা হারালো, প্রাচীন জমিদার-শ্রেণীর পুনর্বিন্যাসের ফলে বিষয়ী লোকের ভাষাতেও পরিবর্তন সূচিত হোল আর পৃষ্ঠপোষকহীন ব্রাহ্মণ্যসমাজ সংস্কৃতিহীন নব্যবাবুদের তোষামোদে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ায় সংস্কৃত-প্রধান বাংলাও বিকৃত হ'য়ে গেল। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরূপতার ফলে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ব্যাহত হ'য়ে পড়ায় মিশনারীদের ভাষাও অব্যবহারে অর্থহীন হ'য়ে পড়লো।

২

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবযুগের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরে এসে নবাব দরবারের লোক, ভূস্বামী-অনুগৃহীত লোক আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন বর্ণগত শ্রেণী বৈষম্যের স্থানে নতুন এক অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে বাধ্য হোল। প্রাচীন বর্ণগত শ্রেণীবৈষম্যের এই একাকারের মধ্যে তিন ধরণের পুরানো গদ্য-ভাষাভঙ্গীও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটি একাকারের ভাষাকে পথ ক'রে দিল আর সেই ভাষার লেখ্যরূপটি প্রথম রূপ লাভ করলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের লেখনী চালনায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অর্ধশতাব্দীব্যাপী কার্যকালের মধ্যে প্রথম দশকটিই বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছিল আর সেই অধ্যায়টির প্রধান রূপকার ছিলেন উইলিয়ম কেরী।

বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পূর্ব থেকেই কেরী সাহেব শ্রীরামপুর মিশনের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার প্রয়াসকে কেন্দ্র ক'রে বাংলাভাষা, বাংলা গদ্য রচনা এবং বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষেই কেরীকে বাংলাভাষার মূল প্রবণতা নিয়ে অনেক চিন্তা করতে হয়েছিল। তার ফলে, কেরী বাংলাভাষা সম্বন্ধে দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ; একটি হোল, সংস্কৃত ভাষার অফুরন্ত ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের সঙ্গে আত্মিক যোগ হেতু বাংলাভাষায় বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর অনন্ত সম্ভাবনা, আর অন্যটি হোল লোকমুখের ভাষার বহুজনবোধ্যতার ভিত্তিতেই সাহিত্যক গদ্য রচনার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় কেরী লিখেছিলেন,

'The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other language of India ; ···fourfifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded wtih such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of The Most Expressive And Elegant Languages of The East.'

খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেলের বঙ্গানুবাদকালে কেরী বাংলা গদ্যভাষার সর্বজনবোধ্যতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই লোক মুখের ভাষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। আবার দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও আলাপ পরিচয়ের জন্যে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সেই ভাষা শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কেরীর আকর্ষণ ও ইংরেজ সরকারের প্রয়োজনের ফল হিসেবেই ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত বাংলা কথ্য ভাষার সংকলন গ্রন্থ 'কথোপকথন।'

কেরী যখন এমনিভাবে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার আত্মিক যোগ এবং লোক মুখের ভাষার ভিত্তিতেই তার সর্বজনবোধ্যতার মূল আবিষ্কার করেছিলেন, তখন তাঁরই প্রবর্তনাতে গদ্য রচনা করতে গিয়ে রামরাম বসু বাংলাভাষার সংস্কৃতপ্রাণতার সঙ্গে তার শব্দভাণ্ডারে নবাগত আরবী ফারসী শব্দের অবিরোধ উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে। তাই সংস্কৃত প্রভাব অনুযায়ী পদগঠন, পদান্বয় ও স্তবকবিভাগ ক'রেও তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বিচারে ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। বিষয় অনুযায়ী বাক্যে শব্দব্যবহারের বিভিন্নতা এনে রামরাম গদ্যকে আরও প্রাণবন্ত করেছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও কেরীর মতো বাংলাভাষার সংস্কৃত প্রাণতা উপলব্ধি করেছিলেন,—'সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা, এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্বোত্তমা সংস্কৃতভাষাবাহুল্যহেতুক।' মৃত্যুঞ্জয়ের এই উপলব্ধি আধুনিক যুগের বিচারেও যথার্থ ও সার্থক ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে। শোভন ও সুপ্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারপ্রাচুর্য বাংলা-ভাষাকে বিষয়ানুসারী মনোভাব প্রকাশের যথোপযুক্ত বাহন ক'রে তুলেছে। বাংলাভাষার ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কৃত থেকে আহৃত শব্দাবলীই আজ বাংলাভাষাকে সর্ববিধ মনোভাব প্রকাশের উপযুক্ত ক'রে তুলেছে। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডারের সংযোগসেতুটি আবিষ্কারের ফলেই আজ বাংলাতে প্রয়োজনীয় যে কোন শব্দই সংস্কৃত থেকে নির্বিচারে গৃহীত হ'য়ে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে; বাংলাভাষায় ব্যবহৃত কোন সংস্কৃত শব্দই আজ আর প্রয়োগদুষ্ট ব'লে মনে হয় না। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার এই সংযোগ সেতুটি মৃত্যুঞ্জয়ই প্রথম স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। কেরী সাহেবের উপলব্ধি তাঁর লেখনীতেই প্রথম রূপলাভ করেছিল। ভারতীয় ভাষারাজ্যের সর্বত্রব্যাপ্ত পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষার এই অন্তর্নিহিত সংস্কৃতপ্রাণতা

আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। কেবলমাত্র তাই নয়, বাংলাভাষার রীতি প্রকৃতি, তার প্রকাশ ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি খুব নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তার ফলেই বাংলাভাষার তিনটি পৃথক প্রকাশভঙ্গী তাঁর কাছে খুব সহজেই প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর এই কৃতিত্বের বিচার ক'রে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,

'প্রবোধ চন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, কথ্যরীতি, সাধুরীতি ও সংস্কৃতরীতি। কথ্যরীতি প্রধানতঃ কতকগুলি লোক প্রচলিত গল্পের বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বইখানার অধিকাংশ সাধু-রীতিতে লেখা। সংস্কৃত রীতির ব্যবহার কেবল সংস্কৃত হইতে আক্ষরিক ভাবে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক ও আলঙ্কারিক বর্ণনাতেই।...আসলে এই রীতি কেবল বিদেশী ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের বা তত্ত্বের সার সংগ্রহ জানাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। কথ্য এবং সাধু উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনাকুশলতা দেখাইয়াছেন।'[১]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকদের এই প্রয়াসে বাংলা গদ্য-ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহৃত হ'লেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে অন্তরের কোন গভীরতর অনুভূতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তাঁরা গদ্য-রচনায় অগ্রণী হননি। চাকরি রক্ষা, পারিতোষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আর কেরীর প্রত্যক্ষ প্রবর্তনার জন্যেই তাঁরা গদ্য-রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই তাঁদের গদ্য রচনা ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠেনি। ফলে, সে গদ্য-রচনা কোন বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করতে পারেনি। তাঁদের নিজস্ব কোন বক্তব্য ছিল না ব'লে ব্যক্তিগত স্বভাব পার্থক্যের জন্যে যেটুকু পার্থক্য থাকা সম্ভব তার বেশি তাঁদের গদ্যের মধ্যে আর কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁদের গদ্য-রচনায় তাই কোন 'স্টাইল' গ'ড়ে উঠতে পারেনি। বাংলা গদ্য রচনায় সেই 'স্টাইলে'র প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল রামমোহনের রচনায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকদের কাছে ভাষাটাই ছিল মুখ্য, বক্তব্য ছিল গৌণ। কিন্তু রামমোহন একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবেই নবগঠিত গদ্য ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়মের গদ্যরচয়িতাদের পাঠক ছিল বিদেশী সিভিলিয়ান ছাত্ররা, কিন্তু রামমোহন বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তের সাক্ষর বাঙালীসমাজকে উদ্দেশ্য ক'রেই তাঁর গ্রন্থাবলীর অবতারণা করেছিলেন। স্বরচিত গদ্য ভাষাকে সামনাসামনি বুঝিয়ে দেবার তাঁর কোন সুযোগ ছিল না।

তাই গদ্য-রচনা ক'রেই তিনি মুক্ত হননি, সেই গদ্য বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বাংলা ভাষার প্রকৃতি নির্ণয় ক'রে নিয়েছিলেন,

'প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয় এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারে না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।'[১]

এরপর তিনি বাংলা গদ্য পাঠের পদ্ধতি নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন,

'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইএর বিবেচনা বিশেষমতে করিতে হয় যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন কোন নামের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু একবাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়াশব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়াশব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্বাহ শব্দের অন্বয় হয় অর্থাৎ করিয়া যেখানে ২ বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না।'[২]

এখানে রামমোহনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখি প্রথমত, বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের দীনতা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তার যোগসূত্র

১ 'অনুষ্ঠান', বেদান্তগ্রন্থ
২ 'অনুষ্ঠান', বেদান্তগ্রন্থ

আবিষ্কার ক'রে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আশান্বিত হ'য়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত, বাংলা গদ্যভাষায় কোন শাস্ত্র বা কাব্য আজও লেখা হয়নি ব'লে দু'তিন বাক্যের অন্বয় ক'রে যথার্থ অর্থবোধক গদ্য রচনা করা যায় না। ভাষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কিন্তু সে ভাষায় গদ্য রচনা দুষ্কর, এই বিপরীত উপলব্ধির ভিত্তিতেই রামমোহনের গদ্য-রচনা গ'ড়ে উঠেছিল। তাই তাঁর রচিত গদ্য-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ঘটেছিল। সেই বাহুল্যের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি লিখেছিলেন,

'যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্পশ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।'[১]

বাংলাভাষায় দু'তিন বাক্যের অন্বয় ক'রে যথার্থ অর্থবোধক গদ্য-রচনার যে প্রতিবন্ধকতা রামমোহন গদ্য লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, এখানে তার থেকে উত্তরণের সূত্রও আহৃত হ'তে দেখি। সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন শিষ্টজনের ভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সহায়তাতেই সার্থক বাংলা গদ্য ভাষার উদ্ভব সম্ভব ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেই রামমোহন বাংলা গদ্যভাষা সৃষ্টিতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের পরিচয় রেখে গেছেন। রামমোহনের এই কৃতিত্বের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন,

'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন'।[২]

কোনরকমে প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে দেবার দিকেই সাধারণ আটপৌরে জীবনের কথ্য ভাষার প্রধান ঝোঁক থাকে। সেই প্রয়োজন মেটানোর মূল উদ্দেশ্যটিকে সম্বল ক'রেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীরা গ্রন্থরচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের প্রয়াস তাই কোনদিন কথ্যভাষার প্রয়োজন মেটানোর অতিবাস্তব পরিধিকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অথচ কথ্যভাষায় প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন যতোই মিটুক না কেন, গদ্যভাষায় কথ্য-ভাষার প্রতিচ্ছবি আঁকলে তা' ক্লান্তিকর হ'য়ে পড়ে। কেবলমাত্র শব্দ-ব্যবহার ও পদান্বয় সম্বন্ধের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেই গদ্যের মধ্যে সাহিত্যিক গুণের বিকাশ ঘটে। কেরী, মৃত্যুঞ্জয় আর রামমোহন, তিনজনেই এক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে বাংলাভাষায় শব্দ আমদানী করার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

১ 'অনুষ্ঠান', বেদান্তগ্রন্থ

২ 'বঙ্কিমচন্দ্র,' আধুনিক সাহিত্য

করেছিলেন। রামরাম বসু যেমন বিষয়ানুযায়ী শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় তেমনি বিষয়ানুযায়ী ভাষা-রীতি ব্যবহারের সার্থকতা আবিষ্কার করেছিলেন। পদান্বয় সম্বন্ধের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও, কেরীসাহেব কথ্যভাষার প্রতি একটা আত্মিক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন, আর রামমোহন নিজে ব্যবহার করতে না পারলেও বুঝেছিলেন শিষ্ট জনের কথ্যভাষাই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত গড়ার কাজে উপযুক্ততম সামগ্রী।

৩

বিখ্যাত পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্‌হো'-র একস্থানে আছে রাজা মিলিন্দ রথে আরোহণ ক'রে ভদন্ত নাগসেনের কাছে উপস্থিত হ'লে কথা প্রসঙ্গে তিনি রাজাকে রথের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা ক'রে ঈশ, অক্ষ, চক্র, রজ্জু প্রভৃতির মধ্যে কোনটি রথ জানতে চাইলেন। উত্তরে রাজা বললেন সেগুলির কোনটিই রথ নয়; তাদের সমবায়ে এবং সকলের সুসম্বদ্ধতার দ্বারাই রথের প্রতীতি জাগ্রত হয়। বাংলা গদ্য ভাষার ক্ষেত্রেও দেখি সংস্কৃতের সঙ্গে আত্মিক যোগ, সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারের সুযোগ-সুবিধা, কথ্য ভাষার রীতিবৈচিত্র্য প্রভৃতি কোনটিই গদ্য ভাষার সার্থক নিদর্শন গ'ড়ে তুলতে পারেনি, অথচ তাদের সকলের সুসম্বদ্ধতার দ্বারাই সার্থক গদ্যসাহিত্য গ'ড়ে তোলা সম্ভব ছিল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাজটুকু করার জন্যেই বিদ্যাসাগর অমর হ'য়ে আছেন। তাঁর এই কাজটুকুর ফলেই বাংলা গদ্যের কাঁচা ভাষায় শ্রী ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে রূপের আবির্ভাব ঘটেছিল।

সাহিত্যিক প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে এই রূপের অবতারণা ক'রে তাকে শ্রীময়ী ক'রে তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে 'কলানৈপুণ্য' ব'লে অভিহিত করেছেন। অসাধারণ কলানৈপুণ্যবোধের দ্বারাই 'ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন'।[১] বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই গদ্যরচনার সচেতন প্রয়াস সুরু হ'লেও সেখানে গদ্যের উপাদানগুলি ছিল বিশৃঙ্খল জনতার মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। জনতার দ্বারা শুধু হট্টগোল

১ 'বিদ্যাসাগর-চরিত', চারিত্রপূজা

বাড়ে, কিন্তু যুদ্ধজয়ের জন্যে প্রয়োজন সুশৃঙ্খল সৈন্যদলের। তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও কেবল উপকরণ বাহুল্য ঘটলে তা সৌন্দর্য-সৃষ্টির পরিবর্তে ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত গতি রুদ্ধ ক'রে দেয়, কারণ সুষম শৃঙ্খলাবোধ থাকলেই সাহিত্য সার্থকনামা হ'য়ে উঠে। বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগর সেই শৃঙ্খলা এনেছিলেন। তিনি, 'বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নবনব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধ জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।'[১]

বাংলা গদ্য ভাষার বিশৃঙ্খল জনতাকে সুশৃঙ্খল সৈন্যদলে পরিণত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রথমে তার পক্ষে সর্বভার সহনক্ষম একটি ভিত্তিভূমির অন্বেষণ করেছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃত বাগ্ধারা প্রধান কৃত্রিম ও আড়ষ্ট বাক্যকথন প্রণালী পরিত্যাগ করেছিলেন, আবার কথ্য ভাষাভঙ্গীর অমার্জিত ও অসংস্কৃত রীতি ও কেবলমাত্র কাজ চালানোর সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করেননি। শিষ্ট সাধারণের কথ্যভাষাভঙ্গীর কাঠামোর ওপর সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারের বর্ণাঢ্য আবরণ দান ক'রে তিনি বাংলা ভাষাকে 'অক্ষয় ভাবজনীনরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য' হবার যোগ্যতা দান করেছিলেন।

কেরী সাহেব বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তের কথ্য ভাষার উদাহরণ আহরণ করলেও সেগুলির মধ্যে রূপ ও রীতিগত ঐক্যের কোন সন্ধান পাননি। বিদ্যাসাগর তাঁর অনন্যসুলভ প্রাতিভ দৃষ্টির দ্বারা সেই রূপ ও রীতির সাধারণ ভিত্তিটি অধিকার ক'রে তার ওপরই বাংলা গদ্যভাষাকে স্থাপন করেছিলেন। আচার্য সুনীতিকুমারের একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা সেই ঐক্যসূত্রটি উপলব্ধি করতে পারি। 'বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'য় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কথ্যভাষার একটি নিদর্শনলিপি প্রদান করেছেন,

কলকাতা ও ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল : তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাড়ীর কাছে যেমনি পৌছুলো, ওমনি নাচ-গান বাজনার শব্দ শুনতে পেলে। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলে—এসব

---

১ 'বিদ্যাসাগর-চরিত', চারিত্রপূজা

ব্যাপার হ'চ্ছে কেন ? তাতে চাকর ব'ললে—আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, তাই আপনার বাবা তাঁকে ভালোয় ভালোয় ফিরে পেয়েছেন ব'লে নাচ-গান খাওয়ান-দাওয়ান ক'রছেন।

মানভূম অঞ্চল : ঐ লোকটার বড়ো বেটা তেখ্‌নে ক্ষেতে গেলছিলো, সে ফিরৃতি সময়ে যখ্‌নে আপনাদের ঘরের পাশ হাব্‌ড়ালো, তখ্‌নে নাচ-বাজ্‌নার ধুম শুনতে পায়েঁ একজন মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্‌ যে এসব কিসের লিয়ে হচ্ছে রে ? মুনিশটা ব'ললেক—তুমার ভাই আইছেন্‌ ন, এহাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াছেন, কেন্‌ন উহাকে ভালায় ভালায় পাওয়া গেল্‌ছে।

উত্তর-বঙ্গ অঞ্চল : তখন তার বড় বেটা পাতার বাড়ীৎ আছিল্‌। পাছোৎ তাঁর আস্‌তে আস্‌তে বাড়ীর কাছোৎ ধায়া নাচ-গানের শোর শুনবার পাইল। তখন তাঁয় একজন চেঙ্গরাক্‌ ডাকেয়া পুছ করিল্‌—ইগ্‌লা কি ? তখন তাঁয় তাক্‌ কৈল্‌—তোর ভাই আইচ্চে, তোর বাপ তাকে ভালে ভালে পায়্যা একটা বড় ভাণ্ডরা ক'রচে।

ঢাকা-মাণিকগঞ্জ অঞ্চল : তার বর' ছাওয়াল তখন মাঠে আছিলো। সে বারীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্‌লো, ততই বাজনা আর নাচ শুইন্‌বার লাইগ্‌লো। তারপর একজন চাকরেরে ডাইকা জিগ্‌গাসা কৈল্লো—ইয়ার মানে কি ? সে কৈলে—তোমার ব'াই আইচে তারে ব'ালে-আলে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওয়া দিচেন।

শ্রীহট্ট অঞ্চল : হি সময় তার বড় পুয়া ক্ষেতে ছিল। হে বাড়ীর ধার আইলে নাচ-গানের শব্দ হুন্‌ল। হে একজন চাকররে ডাইক্যা জিধাইল্‌—এ হকল (ইতা) কিয়র ? হে তা'রে ক'ইল,—তোমার ব'াই বাড়ীৎ আইছে, এর লাইগা তোমার বাপ বড় খানি দিছইন্‌, কারণ তারে ভালা-আপ্তা ফির‍্যা পাইছইন্‌।

চট্টগ্রাম অঞ্চল : 'তার বড় পোয়া বিলৎ আছিল। তে যয়ন্‌ ঘরর কাছে আইল্‌, তয়ন্‌ নাচন্‌ বাজন্‌ হুনিল'। তে তার একজন গাউররে ডাই জিজ্ঞাইল যে কি হইয়ে ? তে তারে কইল—আঁাওনার বা'ই আস্তে, আঁাওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে এক নিঅঁন্ত্রণ দিয়ে।

বরিশাল অঞ্চল : হে কালে হের বড় পোলা কোলায় আছিল। হে বাড়ীর কাছে যাইয়া বাজনা নাচনা হুনিতে পাইয়া একজন চাহর ডাকিয়া জিগাইল যে এয়া কি ? সে কৈল—তোমার বা'ই আইছে, আর তোমার বাপ মস্ত খানা যোগার হরছে। কারণ ছোট পোলা ব'া-ব'ালাইতে পাইছে।

বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তে প্রচলিত এই কথ্যভাষাভঙ্গীর রূপ ও রীতির বিচার করলে দেখি, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রমানুসারে বাংলা বাক্যগঠনরীতির যে স্বাভাবিক বিন্যাস, মানভূম থেকে শ্রীহট্ট অঞ্চলের কথ্যভাষায় কোথায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই রীতিগত ঐক্য উপলব্ধি করলে রামমোহনকে আর পাঠপদ্ধতির নির্দেশ দিতে হোত না বা রামরাম-মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাও দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠতো না। পার্থক্য কেবলমাত্র আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে এবং শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ পদ্ধতিতে। এখন এই পার্থক্য দু'টি দূর করতে পারলেই একটি সর্ববঙ্গীয় গদ্যভাষারীতি সৃষ্টি করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শব্দাবলীর ব্যবহার করেছিলেন। ক্ষেত, পাতার বাড়ী, মাঠ, বিল, কোলা প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে 'ক্ষেত্র'; ছেলে, বেটা, ছাওয়াল, পুয়া, পোলা প্রভৃতির পরিবর্তে 'পুত্র'; চাকর, মুনিশ, চেঙ্গরা, গাউর, চাহর প্রভৃতির পরিবর্তে 'ভৃত্য'—ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে একই বক্তব্য একই ভাষায় মানভূম থেকে শ্রীহট্টের মানুষের পক্ষে বোধগম্য ক'রে প্রকাশ করা চলে।

বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরীরা বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের সুযোগ সম্বন্ধে অবহিত হ'লেও সর্বাঞ্চলগ্রাহ্য ভাষারীতিটি ঠিক ধরতে পারেননি। তাই তাঁদের সংস্কৃত-শব্দ-ব্যবহার অনেক স্থানে ভূষণ অপেক্ষা দূষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীরা বাংলাভাষার বাক্যকথনপ্রণালী সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ছন্দপ্রধান কাব্যকবিতাগুলিও সর্ববিধ ভাবপ্রকাশক্ষম বাক্যগঠনে তাঁদের সাহায্য করতে পারেনি। ফলে, কিছুটা বাধ্য হ'য়েই তাঁদের মধ্যে কেউ বা সংস্কৃত আবার কেউ বা আরবী-ফারসী রীতির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা বাক্যকথন-প্রণালীর সঙ্গে সংস্কৃত বা আরবী-ফারসীর বাক্যগঠনপ্রণালীর পার্থক্য দুস্তর। তাই তাঁদের লিখিত গদ্য অনেকস্থানেই দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছিল এবং কোন ক্রমেই সর্বজনবোধ্য গদ্যভাষা হ'য়ে উঠতে পারেনি। তার ওপর নির্বিচার সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার, অনাবশ্যক সমাসবাহুল্য আমদানি এবং সচেতনভাবে কথ্য-ভাষার পদ পরিহার করায় সে ভাষা চিরদিনই বাঙালীর পক্ষে দুর্বোধ্য হ'য়েই রইলো। নিজের আশু প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে রামমোহন এই ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হ'লেও এভাষার দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না, তাই এই ভাষার বোধ সৌকর্যার্থে তিনি পাঠ পদ্ধতির নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তাঁর নিজের রচনাও সর্বদা এই কৃত্রিম ভাষার অনিবার্য অস্পষ্টতা এড়াতে পারেনি।

গদ্য লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাই সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। পূর্বসূরীদের কৃত্রিম ঐতিহ্য পরিত্যাগ ক'রে তিনি বাংলাদেশের শিষ্টজনকথিত সর্বজনবোধ্য কথ্যভাষাকেই তাঁর গদ্যভাষারীতির মূল কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করলেন। আর তার ফলেই বাংলা গদ্যভাষার সর্বপ্রধান যে ত্রুটি, সেই দুর্বোধ্যতার অবসান ঘটলো, লিখিত গদ্যভাষা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'য়ে উঠলো, বাংলা গদ্য সাহিত্যে অজস্র সহস্রবিধ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হোল। বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিলে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির এই সহজবোধ্যতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে :

'একদা, রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতচিন্তার ভার দিয়াছেন। আত্মসুখে নির্বৃত হইয়া, তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; আমি কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছি।'

—বেতাল পঞ্চবিংশতি, রচনাকাল ১৮৪৭ খ্রীঃ

'পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইলষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না, অনন্তর, পঞ্চম মাইলষ্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইলষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইলষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।'

—বিদ্যাসাগর-চরিত, প্রকাশকাল ১৮৯১ খ্রীঃ

'ইতিপূর্বে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে, বড় জাঁকের একটা শ্রাদ্ধ হয়েছিল। খুড় আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বিদায়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পণ্ডিত মানুষ, অধ্যক্ষ হইলেন, ভালই; কিন্তু অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া, কাঁসারির মত, কতকগুলি ঘড়া বিক্রয় করিলেন। এক্ষণে সকলে বলুন, রাজবাড়ীতে এরূপ ঘড়া বিক্রয়, খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম হয়েছে কিনা; এবং সেজন্য, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো দুঃখিত হইয়া ও অপমানিত বোধ করিয়া, উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।'

—আবার অতি অল্প হইল, রচনাকাল ১৮৭৩ খ্রীঃ

সাহিত্যিক ও কথ্য ভেদে বাংলাসাহিত্যে দু'টি গদ্য ভাষারীতি প্রচলিত—

সাধু ও চলিত। প্রাচীন কালে বাংলাদেশে সাহিত্যিক ও মৌখিক ভাষায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষারীতির ওপর ভিত্তি ক'রে সর্বজন গ্রাহ্য একটি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার রীতিতেই আধুনিক সাধুভাষা গ'ড়ে উঠেছে। চলিত ভাষার আধারও পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষা। পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষাভঙ্গী নানা ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের পর বর্তমানে যে-রূপে এসে দাঁড়িয়েছে, বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তের শিষ্টজন তাকেই চলিত ভাষা হিসেবে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সাধু ও চলিত ভাষা, তাই, একই উৎস, পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার প্রাচীন ও আধুনিক রূপ, থেকে জাত ব'লে ভাষারীতিতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপে। সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের যে প্রাচীন রূপ গৃহীত, তা হোল তাদের পূর্ণরূপ। অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন ধারা পেরিয়ে আধুনিক কথ্যভাষায় সেগুলি যে সংক্ষিপ্তরূপে পরিণতি লাভ করেছে, চলিতভাষায় সেগুলিই গৃহীত হয়েছে। আধুনিক যুগে সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটলেও চলিত ভাষাতেও তার ব্যবহারে কোন বাধা সৃষ্ট হয়নি। তবে চলিত ভাষাতে তদ্ভব পদের এবং সমাসের স্থানে কথ্য ইডিয়মের দিকেই বেশি ঝোঁক দেখা যায়। সাধু ও চলিত রীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যাসাগরের ভাষায় পুরোপুরি বর্তমান। উপরে উদ্ধৃত তাঁর রচনাংশগুলিকে তাই অতি সহজেই সাধু থেকে চলিতে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়া যায়। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতির অবস্থানের সামান্য মাত্রও পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবলমাত্র সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপটি পরিবর্তন ক'রে নিলে এগুলি চলিতভাষার রচনা ব'লে গ্রহণ করতে কোন বাধা থাকে না। বিষয়বস্তু অনুযায়ী বেতাল কাহিনীর গাম্ভীর্য আবার 'অতি অল্প হইল'-র লঘু স্বর যে কোন আধুনিক লেখকের রচনাতেও থাকতে বাধ্য, তা না হ'লে, সাধু কি চলিত কোন রীতিতেই বক্তব্য সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে না। কথ্যভাষার শিষ্টরূপের ভিত্তিতেই তাঁর ভাষার কাঠামো গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে, অতি সহজেই তা সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিবর্তনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিক চলিত ভাষার জন্মদান করেছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর পরিমার্জনা লাভ ক'রেও বাংলা সাহিত্যিক চলিতভাষা আজও তাই বিদ্যাসাগরী ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক হারায়নি; তার 'সাধু' আবরণের মধ্যে 'কথ্য' প্রাণের উপস্থিতিই তাকে আজও সজীব ক'রে রেখেছে। বিদ্যাসাগরী ভাষার চর্চা তাই শিক্ষিত শিষ্ট বাঙালীর কথ্যভাষার পরিশীলিত রূপটিরই চর্চা।

বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুসরণ তাই কোন এক বিশেষ ব্যক্তিত্বচিহ্নিত সাহিত্যিক ভাষার অনুকরণ নয়, বাংলাদেশের কথ্যভাষাভঙ্গীরই পরিমার্জিত করণ। বিদ্যাসাগরী ভাষার সঙ্গে বাঙালীর প্রাণস্পন্দনের এই যোগটির পরিচয় দিয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন,

'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষারীতি অনুসরণ করলে লেখক ক্ষুদ্রতর বঙ্কিমচন্দ্র হ'য়ে ওঠে। ··রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির প্রভাব সম্বন্ধে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রীতির অনুকরণে কোন লেখক ক্ষুদ্রতর বিদ্যাসাগর হ'য়ে উঠেছে ব'লে জানিনে। এ রীতিটা সার্বজনীন পথের মতো, যে কেউ চলতে পারে এবং যথা সময়ে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ারও সম্ভাবনা।'[১]

লোকমুখের স্বাভাবিক বাক্য কথন প্রণালীর ওপর নিজস্ব গদ্য ভাষা ভঙ্গীর কাঠামো গ'ড়ে তুলে বিদ্যাসাগর তার সৌন্দর্যসম্পাদনের জন্যে বক্তব্য বিষয়ের প্রয়োজন অনুসরণ ক'রে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র সংস্কৃত শব্দের ওপরই নির্ভর করেননি, লোক মুখের ভাষায় ব্যবহৃত ছোট বড়ো নানারকম অসংস্কৃত শব্দাবলীরও বহুল ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীতে এমনি বহু অসংস্কৃত শব্দের সুষম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তাঁর অসমাপ্ত লৌকিক শব্দ সংগ্রহ প্রচেষ্টাতেও লৌকিক শব্দের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ প্রমাণ করে। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোন ভাষায় সর্ববিধ বিষয়ের প্রকাশ ক্ষমতা নির্ভর করে তার শব্দ ভাণ্ডারের সঞ্চয়ের ওপর। সেইজন্যেই তিনি তৎসম ও দেশি শব্দের বিপুল ঐশ্বর্যে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমকালীন সমালোচকেরা বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত শব্দ সম্ভারের সংস্কৃত আধিক্য দেখে যেমন বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি তাঁর লৌকিক শব্দ ব্যবহারেও শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন। সেদিন তাঁরা কেউই বুঝতে পারেননি যে, 'সস্কৃত শব্দ ও লোকমুখের শব্দের যথযথ সমন্বয়ে ভাষাদেহে যে স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাংলা ভাষায় যা হচ্ছে, তার প্রবল ও আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের কলমে।'[২] বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিও বিদ্যাসাগর-প্রতিভার এই দিকটি উপলব্ধি করতে পারেননি, তাই 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ ক'রে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা

গোড়ায় খারাপ ক'রে গেছেন'[১] ব'লে মন্তব্য করতে তাঁর বাধেনি। অথচ ভাষায় শব্দ ব্যবহার পদ্ধতির সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল,

'তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সেপক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভুদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।'[২]

উপদেশ দানের ক্ষেত্রের এই উদারতা কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিম রক্ষা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে কোথায় যেন তাঁর একটা 'এ্যালার্জি' ছিল। বিদ্যাসাগরের কোন কৃতিত্বই তিনি কোনদিন প্রসন্নমনে স্বীকার করতে পারেননি। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বিদ্যাসাগর কোথায় অযথা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ক'রে বাংলা ভাষার ধাতটা খারাপ ক'রে দিয়েছেন তার কোন প্রমাণ না দিয়েই তিনি নির্বিচার মন্তব্য করেছেন।

বিদ্যাসাগরের ভাষার বিরূপ সমালোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও কয়েকপদ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ভাষার দুর্বোধ্যতার উদাহরণস্বরূপ তিনি বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' গ্রন্থের 'সর আইজাক নিউটন' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

'পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা তিনি একটা পুরান বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ির শঙ্কু, বাক্স মধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলা ববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।' হরপ্রসাদ এই উদ্ধৃতির পর মন্তব্য করেছেন, 'ইংরেজী পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অগাধ পণ্ডিত ছিলেন; ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ওপর

১ পুরাতন প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমলের উক্তি পৃ. ৪৬

২ 'বাঙ্গালা ভাষা', বিবিধ প্রবন্ধ

তিনি অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না তিনি সেইসব গ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়' 'সহজপাঠ' বা Aesop's Fables-এর ভাষায় রচনা করেছিলেন। তা করা সম্ভবও ছিল না, কারণ গ্রন্থগুলির বক্তব্যবিষয়ই ছিল জটিল। সেই জটিল বক্তব্য প্রকাশে ভাষার মধ্যেও জটিলতা আসতে বাধ্য। কিন্তু হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগরের বক্তব্য বিচার না ক'রেই তাঁর ভাষার সমালোচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের ভাষার সমালোচনা নয়, বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটির সমালোচনা। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই বিদ্যাসাগরের শব্দ-ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা ক'রে দিয়েছে বলে মনে হয়,

'ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষা সৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃতভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃতশব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজেই গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হ'য়ে যায়নি।··· বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয়নি।'[১]

শিষ্ট কথ্যরীতির ভিত্তিতে তৎসম ও দেশি শব্দ সম্ভারের সাহায্যে বিদ্যাসাগর যে ভাষা সৌধ গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার গঠনশৈলী অর্থাৎ পদবিন্যাস-রীতিতেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ লেগে আছে। বাঙালীর শিক্ষাবিধি প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি বিদ্যার ওপর জোর দিলেও বাংলা ভাষার ওপর তাদের প্রাধান্য কখনও স্বীকার করেননি। বাংলা ভাষার প্রয়োজনে তার ভাষাদেহ নির্মাণের জন্যেই তিনি সংস্কৃতকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন আর বাংলা ভাষার মাধ্যমে আহৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্যেই ইংরেজিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ভাষাদেহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত বা ইংরেজি পদবিন্যাসের অনুকরণে তিনি বাংলা ভাষায় একটি কৃত্রিম বাক্য গঠন প্রণালী সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। তিনি এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশে যখন একটা বিশেষ ভাষা প্রচলিত আছে, তখন নিশ্চয়ই তার একটা বিশিষ্ট পদবিন্যাস-রীতিও আসে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে হ'লে, যে পদ্ধতি বা কৌশলই

১ 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', চারিত্র পূজা

অবলম্বন করা হোক না কেন, সেই বিশিষ্ট পদবিন্যাসরীতিটির ওপরই তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তিনি তাই-ই করেছিলেন। শুধু তাই-ই করেননি, সেই বিশিষ্ট পদবিন্যাস রীতিটিকে প্রচুর পরিমার্জনা ক'রে তার মধ্যে ঔৎকর্ষের চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন। এই ভাষা পরিমার্জনায় ইংরেজি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ক'রে তিনি কেবল পাঠক সাধারণের গ্রন্থপাঠের সুবিধাই করেননি, আপন সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের গভীরতা ও সুশিক্ষিত মননের তীক্ষ্নতার পরিচয় ব্যক্ত ক'রে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিককেই আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম পাশ্চাত্য বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেননি। কিন্তু তাঁর জীবনের বহু কর্ম যেমন তাঁর দ্বারা সূচিত না হ'য়েও তাঁর প্রচেষ্টাতেই সার্থক হ'য়ে উঠেছিল, তেমনি বিরামচিহ্নের তিনি প্রথম ব্যবহার না করলেও তাঁর রচনাতেই সার্থকতা লাভ ক'রে বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের একটি মানদণ্ড গ'ড়ে উঠেছিল। সাধু ভাষায় দীর্ঘবাক্যের যে পদগঠনরীতির অভাবে রামমোহনকে গদ্যপাঠের নিয়মবিধি রচনা করতে হ'য়েছিল, বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনাতেই সেই পদ গঠনরীতির আদর্শ প্রথম গ'ড়ে উঠলো। সেই আদর্শের মূলগত প্রকৃতি বিচার ক'রেই তিনি বিরামচিহ্নের ব্যবহারবিধিও গ'ড়ে তুলেছিলেন। বিরামচিহ্ন ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের এই বৈশিষ্ট্য বিচার ক'রেই ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,

'সাধুভাষায় কমনীয় রচনার কোনো আদর্শ না থাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে সাধু ভাষায় দীর্ঘ বাক্যের syntax ঠিক হয়নি। সে আদর্শ, সাক্ষাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য আর পরোক্ষ সাধারণ লেখকদের জন্য মুখ্যত বিদ্যাসাগর এবং গৌণত অক্ষয়কুমার দত্ত ধ'রে দিয়েছিলেন।...বিদ্যাসাগর ছেদচিহ্ন ব্যবহার syntax অনুযায়ী বিশ্লেষণ এমনভাবে করেছেন, যাতে মূল ক্রিয়ায় বা কর্তার সঙ্গে দূরান্বিত পদের সম্পর্ক সহজে বোঝা যায়। এবং এই কারণেই তিনি নীচু ক্লাশের পাঠ্যগুলিতে অজস্রভাবে কমা-সেমিকোলন ব্যবহার করেছিলেন।'[১]

বাঙালীর মুখের ভাষার ভিত্তির ওপর তারই বিশেষ পদবিন্যাসরীতি অনুসরণ ক'রে, তৎসম ও দেশি শব্দের সহযোগে এবং ইংরেজি বিরামচিহ্নের সহায়তায় বিদ্যাসাগর যে গদ্য ভাষার জন্মদান করেছিলেন, তাকেই তাঁর প্রধান কীর্তি ব'লে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছেন। বক্তব্যবিষয়কে সহজ, সরল ও

সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্যে বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত রীতিতে তাঁর সাহিত্যিক রসবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই রসবোধের জন্যেই তিনি ব্যাকরণ বিধিকে, প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা স্থাপনের মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে, তাকে সুন্দর, নমনীয় ও চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

'গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।'[১]

পূর্ববর্তী কয়েকজন গদ্য রচয়িতার রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রচনার তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা অতি সহজেই উপলব্ধি করি বিদ্যাসাগরের শিল্পীমানসের কলানৈপুণ্যে, পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে বাংলা ভাষার এই আত্মপ্রকাশ, কি বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী ছিল!

[ক] যে কালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাৎ হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল একারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহৎগোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহাদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ঝকড়া লডাই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।—

—রামরাম বসু, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'; ১৮০১ খ্রীঃ

[খ] অবিরত মনস্তাপতাপিত ভাক্তত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষদিগের এবং প্রতারকপ্রতারণাস্বরূপ মহাধূমান্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় অন্ধ তৎসংসর্গী জীববিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠমাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত, চিরচিন্তিত, স্বকপোলকল্পিত নানা বাগাড়ম্বরিত, মন্বাদিবচনতাৎপর্যার্থবহিষ্কৃত, স্বানুচরজীবসমাজসন্তোষার্থ রচিত, অন্তঃসাররহিত, অল্পবুদ্ধি জনগণের আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ, উত্তরাভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টচিত্ত কৃতকৃত্য হইলাম।

—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 'পাষণ্ডপীড়ন', ১৮২৩ খ্রীঃ

---

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত', চারিত্রপূজা

[গ] খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রসঙ্গে বিজ্ঞব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষাতে প্রকাশিত গ্রন্থ বিরুদ্ধবাদি হইলে ইহাকে সামান্য বিষয় কহিতে পারি না হিন্দুকুলোদ্ভব পণ্ডিতেরা জাত্যাভিমানে ও মাৎসর্য্যে উন্মত্তবৎ হইয়া শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদির বিপরীত শাস্ত্র দেখিলে অহঙ্কারপূর্বক তুচ্ছ করতঃ প্রায় দৃষ্টিও করেন না, ভারতবর্ষের বহির্ভূত নানাদেশের ভাষা ধর্ম রীতি ইত্যাদি সমস্ত নিবেদন না করিয়াও হেয়জ্ঞান করেন এই নিমিত্ত তাঁহাদের অন্য দেশীয় পদার্থ ও বস্তুজ্ঞান অত্যল্প থাকাতে কোন বিষয়ের সত্যমিথ্যা শীঘ্র করিতে পারেন না এবং অভিমানপূর্বক আপনাদিগকে সকল বিষয়ে পারদর্শী বোধ করিলেও বাস্তবিক বিদ্যার প্রসঙ্গে তাঁহারা নিতান্ত খর্ব···

—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্য স্থাপন ও মিথ্যানাশন,' ১৮৪১ খ্রীঃ

এই উদ্ধৃতি তিনটিতে একজন ফারসীনবীস, একজন সংস্কৃতজ্ঞ এবং একজন ইংরেজি শিক্ষিত লেখকের রচনার নিদর্শন দেখানো হয়েছে। অতি স্বাভাবিক-ভাবেই এখানে পর্যায়ক্রমে ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজি বাক্যগঠন প্রণালীর প্রাধান্য রচনাংশগুলিকে আকীর্ণ ক'রে তুলেছে। বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন ব'লে এগুলি বাংলা গদ্য ভাষা হ'য়ে উঠতে পারেনি। এগুলির সঙ্গে তুলনায় অতি স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের ভাষারও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়,

'উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব সেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্ক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।'

—'বেতালপঞ্চবিংশতি,' ১৮৪৭ খ্রীঃ

রামরামের গদ্য রচনা যেখানে ফারসী শব্দ ও আড়ষ্ট বাক্যগঠন প্রণালীর দ্বারা কণ্টকিত, কাশীনাথের রচনায় সেখানে অনাবশ্যক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সমাসাড়ম্বরের উৎকট আতিশয্যে মূল বক্তব্য পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত; কৃষ্ণমোহনের রচনায় এইসব দোষ কেটে গেলেও, বাংলা বাক্যকথন প্রণালীর স্বাভাবিক ছন্দঃস্রোত উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি ইংরেজি বাক্যগঠনরীতির অন্ধ-

অনুকরণে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা জানি, বক্তব্যবিষয়ের ভাববৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রে গ'ড়ে ওঠা বাগ্‌রীতির স্বাচ্ছন্দ্য যে রচনায় সামান্যতমও ক্ষুণ্ণ হয় না, তাই সার্থক রচনা আর স্বতোৎসারিত স্বাভাবিক ছন্দঃস্রোত সেই সার্থকতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাতেই সেই পরিচয় প্রথম প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছিল। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র উদ্ধৃতাংশটি পাঠ করলে মনে হয় কেউ যেন সরল ভাষায় সহজরীতিতে আপন বক্তব্য সুশৃঙ্খলভাবে গুছিয়ে নিয়ে গল্প বলছেন! ফারসী শব্দের আতিশয্য নেই, সমাসাড়ম্বর বা সংস্কৃত বাক্যগঠনরীতির দৌরাত্ম্য নেই অথচ কথ্যভাষার অমার্জিত কর্কশতাও বর্জিত হয়েছে। তাই একথা বলতে আজ আর বাধা নেই যে বিদ্যাসাগরের লেখনীকে আশ্রয় ক'রেই বাংলাভাষাতে সর্বজনবোধ্য সর্বজন অনুসরণযোগ্য একটি স্বচ্ছ সরল গদ্যরীতির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

সাত

'আদিকবির প্রথম কবিতা'

১

প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানোর আশু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলম ধরেছিলেন ব'লে বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই ছিল পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষার্থী বালকদের উপযোগিতাকে মনে রেখে অতি সচেতনভাবে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁর এই গ্রন্থরচনাপ্রয়াস তাই রসসৃষ্টির দৈবপ্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়নি। কিন্তু তাহ'লেও তাঁর এই গ্রন্থগুলি সাহিত্য-গুণবর্জিত হয়ে নীরস নীতিশিক্ষামাত্রে পর্যবসিত হয়নি, প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে রচিত হ'লেও তাদের গুণগত উৎকর্ষও কম নয়।

শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের উপযোগিতা অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক-গুলিকে এমনিভাবে সাজিয়ে নেওয়া চলে,

বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ	প্রকাশকাল	১৮৫৫ খ্রীঃ
বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ	”	১৮৫৫ খ্রীঃ
কথামালা	”	১৮৫৬ খ্রীঃ
বোধোদয়	”	১৮৫১ খ্রীঃ
আখ্যানমঞ্জরী [প্রথম ভাগ]	”	১৮৬৮ খ্রীঃ
আখ্যানমঞ্জরী [দ্বিতীয় ভাগ]	”	১৮৬৮ খ্রীঃ
আখ্যানমঞ্জরী [তৃতীয় ভাগ]	”	১৮৬৩ খ্রীঃ
জীবনচরিত	”	১৮৪৯ খ্রীঃ
চরিতাবলী	”	১৮৫৬ খ্রীঃ
বাঙ্গালার ইতিহাস-দ্বিতীয় ভাগ	”	১৮৪৮ খ্রীঃ

এই ক্রম অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তকগুলির আলোচনা করলে, মাতৃভাষা শিক্ষা এবং তার মাধ্যমে নীতিবোধ ও চরিত্রগঠন বিষয়ে—বিদ্যাসাগর যাকে শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য ব'লে বিশ্বাস করতেন—তাঁর পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসের সার্থকতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা যায়।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখিত একটি প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'translations' এবং 'Compilation of very good primers' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছিলেন, 'We deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius'; সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবিধ মন্তব্য বাংলা সাহিত্যের দরবারে অক্ষয় সম্পদরূপে পরিগৃহীত হ'লেও পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে এবং পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই মন্তব্য যে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত হয়নি তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তকগুলির আলোচনায় আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি পাঠ্যপুস্তকরচনায় কি বিরাট প্রতিভার প্রয়োজন এবং কি বিরাট প্রতিভা নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর আপাততুচ্ছ পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

প্রথমেই 'বর্ণপরিচয়' দু'টির কথা ধরা যাক। ছাপার অক্ষরে বর্ণপরিচয় শ্রেণীর গ্রন্থের আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের দেশে শিশুদের বর্ণপরিচয় শিক্ষাদানের কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'ত না। শিশুর হাতে খড়ি দিয়ে শিক্ষক মহাশয় প্রথমে ক, খ, গ, প্রভৃতি কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দিতেন; তারপর সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং 'ক্য', 'ক্ক', 'স্ক' প্রভৃতি সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লেখাতেন তালপাতায়; তারপর 'সিদ্ধিরস্তু' ব'লে অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি স্বরবর্ণ শিক্ষা দেওয়া হ'ত; স্বরবর্ণ শিক্ষার পর 'বানান' নামে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগে স্বরবর্ণের আকার-পরিবর্তনপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। স্বরবর্ণের পূর্বে 'সিদ্ধিরস্তু' শব্দের ব্যবহারের জন্যে আধুনিককালের অনেক গবেষক অনুমান করেন প্রাচীনকালে শিশুদের বর্ণ পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, বর্তমানকালের মতো প্রথম যুগে স্বরবর্ণই প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, কিন্তু বিশুদ্ধ স্বরবর্ণে অধিক বাক্যের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অসুবিধা থাকায় পরবর্তীকালে কোন সময়ে ব্যঞ্জনবর্ণই প্রথমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি গৃহীত হয়। কিন্তু প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী স্বরবর্ণ শিক্ষার পূর্বেই 'সিদ্ধিরস্তু'-র ব্যবহার চ'লে আসতে থাকে।

উনিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকে আধুনিক পদ্ধতিতে বর্ণমালা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশনা সুরু হয়। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ হোল রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে কেবলমাত্র বর্ণ ও বানানশিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষার জন্যও পাঠ সংযোজিত হয়েছিল। এর বহুদিন পরে 'স্কুলবুক সোসাইটি' থেকে 'বর্ণমালা,

প্রথম ভাগ' আর 'বর্ণমালা, দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচীনপদ্ধতির অনুসরণে এই গ্রন্থদুটিতে যে বর্ণবিন্যাস-প্রণালী নির্ণীত হয়েছিল তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিচয় ছিল না, গ্রন্থ-দুটিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণীভেদ পর্যন্ত ভালো ক'রে দেখানো হয়নি, ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে পাঠ সুরু করা হয়েছিল। প্রথমশিক্ষার্থী শিশুর কাছে এ প্রণালী কোনক্রমেই সহজবোধ্য ছিল না। সেই অসুবিধা দূর করার জন্যেই হিন্দু-কলেজের 'বাংলা পাঠশালা'র সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ করেন 'শিশুসেবধি বর্ণমালা'-র প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগ আর 'শিশু-সেবধি বর্ণমালা-'র দ্বিতীয় সংখ্যা। কিন্তু এতেও শিশুদের বর্ণশিক্ষাপ্রণালীর কোন উন্নতি লক্ষিত হয়নি ; কারণ, 'স্কুলবুক-সোসাইটি-'র গ্রন্থমালার অপেক্ষা এগুলি কোন উচ্চপর্যায়ের গ্রন্থ ছিল না। প্রাচীন পদ্ধতির কণ্ডূয়নের মধ্যেই এইসব শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচয়িতারা এমনিভাবে যখন আবর্তিত হচ্ছিলেন, তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হ'য়ে শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ-জগতে এক নবীন দিগন্তের সূচনা করেছিল। বীঠন সাহেবের অনুরোধে তাঁর বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্যে প্রকাশিত 'শিশুশিক্ষা'র তিনটি খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রীঃ, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খ্রীঃ) শিশুশিক্ষার জগতে একটি বৈজ্ঞানিক আদর্শ-স্থাপন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরকে আবার বর্ণপরিচায়ক গ্রন্থ রচনার জন্যে কলম ধরতে হয়েছিল ; কর্মজীবনের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে, স্কুল পরিদর্শনের পথে, পালকীতে ব'সে, বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে হয়েছিল। কেন যে বিদ্যাসাগরকে তা করতে হয়েছিল, গ্রন্থ দুটির আলোচনা করলেই আমরা তার কারণ খুঁজে পাবো।

'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে', বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালাকে প্রচলিত উচ্চারণ বিধি এবং বাংলা ভাষার বর্ণবিশেষের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নতুনভাবে সজ্জিত করেছেন। প্রচলিত ষোল স্বর এবং চৌত্রিশ ব্যঞ্জন নিয়ে গঠিত বাংলা বর্ণমালাকে তিনি আমূল সংস্কার করেছেন। বাংলায় দীর্ঘ-'ৠ'-কার আর দীর্ঘ-'ৡ'-কারের প্রয়োগ নেই, তাই অনাবশ্যক ভারবোধে তিনি এই বর্ণদু'টি বর্জন করেছেন। বিশেষ অনুধাবন ক'রে তিনি দেখেছিলেন, 'অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না ; এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে

পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুতে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে।'[১] পদের মধ্যে বা অন্তে থাকলে 'ড', 'ঢ' আর 'য' উচ্চারণে 'ড়', 'ঢ়' আর 'য়'-তে পরিণত হয়, তখন আকারে এবং উচ্চারণে 'ড', 'ঢ', 'য'-এর সঙ্গে 'ড়', 'ঢ়', এবং 'য়'-এর যথেষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে 'তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।'[২] 'ক' আর 'ষ' মিলে সংযুক্তবর্ণ 'ক্ষ'-এর সৃষ্টি করে তাই তিনি 'ক্ষ'-কে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ব'লে গণনার রীতি পরিত্যাগ করেছেন।

'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ'-এর ষষ্টিতম সংস্করণে বিদ্যাসাগর বর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রচলিত উচ্চারণের ত্রুটি নির্দেশ ক'রে এবং সঠিক উচ্চারণের নির্দেশ দান ক'রে তিনি লিখেছেন,

'প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা 'অ', 'আ' এই বর্ণস্থলে 'স্বরের অ', 'স্বরের-আ' বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল 'অ', 'আ' এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।'[৩]

বিদ্যাসাগরের এই উপদেশ বাংলাদেশের সর্বত্র গ্রহণ করা হয়নি। ঔদাসীন্য বা অজ্ঞাতবশতঃ আজও বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে প্রথম বর্ণপরিচয়ের সময় শিশুদের 'স্বরের-অ', 'স্বরের-আ' বলেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

'যে সকল শব্দের অন্ত্যবর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।'[৪]

অকারন্ত শব্দগুলি বাংলা উচ্চারণে অধিকাংশ স্থলেই হলন্ত উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক উচ্চারণ শাস্ত্রমতে একে 'বিকৃত অ-কার' উচ্চারণ বলা হ'য়ে থাকে। নতুন শব্দসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে গিয়ে একেবারে প্রারম্ভ থেকে এই উচ্চারণ বিধি যাতে শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষার ধারায় অঙ্গীভূত হ'য়ে যায় সেজন্যেও বিদ্যাসাগর তৎপর ছিলেন। 'বর্ণপরিচয়' রচনা কালেই এই উচ্চারণের ভ্রান্তি এবং তার সংশোধনে ঔদাসীন্যও তাঁর চোখে পড়েছিল, "অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের

১ বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ—প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

২ বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ—প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

৩ বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ—ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

৪ বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ—ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

অনুসরণ না করিয়া তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অ-কারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।"[১] —এই ভ্রমনিরসনের উদ্দেশ্যেই তিনি উচ্চারণবিধি নির্দেশ ক'রে অকারান্ত শব্দগুলি তারকা চিহ্নিত (*) ক'রে দিয়েছিলেন। যার ফলে শিক্ষাদানকালে এই দু'টি পৃথক উচ্চারণ পদ্ধতি বালক বালিকাদের শিখিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য হয়। 'বর্ণপরিচয়, প্রথমভাগে' বিদ্যাসাগর কর্তৃক উদাহৃত শব্দগুলি বিচার করলেই এর সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। 'অচল' 'অধম' শব্দ দু'টি বাংলা উচ্চারণে অ-কারান্ত পরিত্যাগ ক'রে হলন্তে পরিণত হয়েছে। শিশু মনের স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতা শব্দদু'টিকে প্রচলিত উচ্চারণরীতি অনুযায়ী উচ্চারণ না ক'রে স্বরান্ত উচ্চারণ করতে পারে। বিদ্যাসাগর তাই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'বিজ্ঞাপনে' গুরুমশাইদের এই বিষয়ে অবহিত হ'তে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং পাছে তাঁদের কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তাই নিজের উদাহৃত অকারান্ত শব্দগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়, প্রথমভাগ'-এর এই বিজ্ঞাপন দু'টি অধিকাংশ গুরুমশাই-এর কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় অংশ ব'লে বিবেচিত হওয়ায় উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠেনি, তাই 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রতিটি উদাহৃত শব্দই, নির্বিচারে অকারান্ত উচ্চারিত হ'য়ে চলেছে।

'বর্ণযোজনা' শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সতর্কভাবে একটি বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করেছেন। স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে 'অ' ব্যতীত অন্যান্য 'স্বর'-গুলি বাংলা শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে দু'রকমভাবে ব্যবহৃত হয়। শব্দের প্রারম্ভে তারা স্বাধীনভাবে অবিকৃতরূপেই ব্যবহৃত হয়; যেমন—'অনন্ত', 'আশঙ্কা', 'ইচ্ছা', 'ঈশ্বর' ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের অভ্যন্তরে বা শেষে ব্যবহৃত হ'লে আপন আপন উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তারা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যায়; যেমন 'কাকলী', 'তরণী', 'মধুসূদন', 'সর্বৈব' ইত্যাদি। 'অ'-কারও আবার শব্দের শেষে আপন উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সর্বদা বজায় রাখতে পারে না, হলন্ত উচ্চারণে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়।

'অ'-কার ব্যতীত অন্য স্বরগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর একটি সহজবোধ্য সরল পন্থা অবলম্বন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'আ'-কার নেওয়া যাক। প্রথমে যে দু'টি বিভিন্ন আকারে 'আ'-স্বর ব্যবহৃত হ'তে পারে, তিনি তার রূপ দেখিয়েছেন—'আ', 'া'। তারপর

১ 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ'—ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'লে 'আ'-কার কেমনভাবে ব্যবহৃত হবে, তিনি তার রূপ নির্দেশ,—ক আ কা। ম আ মা। এমনিভাবে বিদ্যাসাগর 'ঔ'-কার পর্যন্ত স্বরবর্ণের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যোজনারীতি ও প্রয়োগবিধির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। অনুস্বর, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর যোজনা বিধিরও তিনি একই উপায়ে পরিচয় দিয়েছেন; তবে স্বরবর্ণগুলির সঙ্গে এদের পার্থক্য হোল, এরা শব্দ-সংযোগে আপন আপন রূপ পরিবর্তন করে না।

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'তে গিয়ে স্বরবর্ণগুলি কেবল নিজেদের আকারই পরিবর্তন করে না, উ, ঊ, আর ঋ-কার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যঞ্জনবর্ণের আকারও পরিবর্তিত ক'রে দেয়। সেক্ষেত্রে স্বর এবং ব্যঞ্জন দুইবর্ণের রূপই পরিবর্তিত হ'য়ে যায় এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন রূপ সৃষ্ট হয়। যেমন,—'গু'ণ, প'শু', ব'হু' 'হৃ'ত। 'র' ব্যতীত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে 'উ' 'ঊ' একরকম রূপলাভ করে, যেমন—'কুল' 'দূর'; 'র'-এর ক্ষেত্রে কিন্তু তারা অন্য একটি নতুন রূপলাভ করে, যেমন –'করুণা', 'অপরূপ'।

বর্ণযোজনাবিধি আপাত দৃষ্টিতে যতোই সহজ ব'লে মনে হোক না কেন, সুকুমারমতি শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। শিক্ষাদান পদ্ধতির সামান্য ত্রুটি বা নীরসতার জন্যে কোমল শিশুমনে বিকৃত যোজনা পদ্ধতি গভীর ছাপ ফেলে দেয়। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেও বানান পদ্ধতি সম্বন্ধে তার স্পষ্ট কোন ধারণা গ'ড়ে ওঠে না, এই অস্পষ্টতা বানানের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটায়। আধুনিক ছাপাখানার কল্যাণে বর্ণযোজনার ক্ষেত্রে সংযুক্তবর্ণের রূপে সরলতা আনয়নের নানারকম চেষ্টা হ'লেও বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত পদ্ধতিকে অস্বীকারের উপায় নেই। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরীয় রীতির আকার প্রকরণই বাংলাভাষার প্রধানতম অবলম্বন বলা চলে।

বর্ণযোজনার জ্ঞান দৃঢ়তর করার জন্যে বিদ্যাসাগর যে সমস্ত দৃষ্টান্ত আহরণ করেছিলেন তার মধ্যে তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমদিকে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগের বিবিধ ও বিচিত্র নিয়মের পরিচয় দিয়ে উদাহরণের মধ্যে তিনি শব্দগুলিকে স্বর-ব্যঞ্জনের যোগ ও ক্রম অনুসারেই সাজিয়েছিলেন। অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি; যেমন, 'অধিকার,' 'আলোচনা, 'কৌতূহল', 'পারলৌকিক', 'পারিতোষিক'। এখানে দৃষ্টান্তগুলি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শব্দমাত্র, পরস্পরের সংযোগে কোন অর্থবহ বাক্য বা

বাক্যাংশের মধ্যে তাদের একত্রিত করা হয়নি। বর্ণযোজনার পাঠ সাঙ্গ ক'রে তবেই তিনি বিভিন্ন শব্দযোগে বাক্যাংশগঠনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন 'প্রথম পাঠ' থেকে।

বর্ণযোজনার ঢেউ ঠেলে এসে শিশু এক নতুন তটে উপস্থিত হয়েছে; সেখানকার অচেনা পরিবেশ তার মনে পাছে ভয়ের সঞ্চার করে, সতর্কভাবে বিদ্যাসাগর তাই তার অতি পরিচিত ক্ষুদ্র প্রকৃতিজগৎ থেকে উপাদান আহরণ ক'রে দুইবর্ণের দু'টি শব্দের যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশ তৈরী করেছেন, যেমন,—'বড় গাছ।' 'ভাল জল।' 'লাল ফুল।' 'ছোট পাতা।' গাছ, জল, ফল, পাতা—এই পরিচিত বর্ণগুলির মাধ্যমেই শিশু প্রথম তার শব্দ ভাণ্ডারের সঞ্চয় গ'ড়ে তোলে; সেখানে 'বড়', 'ভাল', 'লাল', 'ছোট' প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রকৃতিজগতের অপার বিস্ময় বোধকে প্রকাশের সুবিধা দান ক'রে তার মনোজগতে অস্পষ্টতার কুহেলিজাল ধীরে ধীরে অপসারিত করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দগুলির দীর্ঘায়িত উচ্চারণের বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই শিশুর জিভের জড়তা প্রথম ভাঙ্গতে থাকে। এই পরিচিত শব্দগুলির নিয়মনিষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে 'প্রথম পাঠ' থেকে 'অষ্টম পাঠে'র দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে, একটি আশ্চর্য জগতের অর্থবহ রূপ শিশু মানসে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে।

'নবম পাঠ' থেকে পূর্ণ বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তিন চারটি শব্দযোগে গঠিত এই বাক্যগুলিও শিশুর অপরিচিত জগতের বস্তু নয়। বাক্যাংশের নানা উদাহরণ তার মনে অর্থবহ পূর্ণ বাক্যের জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, তারই সূত্র ধ'রে এই বাক্যগুলির আবির্ভাব। যেমন, 'আমি মুখ ধুইয়াছি।' 'মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে?' 'রাখাল সারাদিন খেলা করে।' প্রতি 'পাঠে' ধীরে ধীরে বাক্যের দৈর্ঘ্য বেড়ে বেড়ে 'ত্রয়োদশ পাঠে' কিছুটা জটিল অর্থবহ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে, একমুখী সরলবাক্য বিভিন্নমুখী জটিল বাক্যে পরিণত হয়েছে। যেমন,—'কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়াছে।' 'তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।' 'উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।'

'চতুর্দশ পাঠ' থেকে বিদ্যাসাগর একাধিক বাক্য সংযোগে একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেমন,—'আর রাত্রি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া

কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে, পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন ; নূতন পড়া দিবেন না।' এখানে সত্ত পাঠ্যভ্যাসকারী একটি শিশুর প্রভাতী কর্তব্য সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর তার সব কাজকর্মকে বিদ্যাভ্যাসের অভিমুখী ক'রে আলোচনা করা হয়েছে। আরও একটি আশ্চর্যের বিষয় হোল, শিশুমনের পাঠ্যভ্যাস প্রবণতাকে একটি নতুন দিক থেকে বিচার ক'রে শৈশব থেকেই তার মনে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত ক'রে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বর্ণপরিচয়ে'র পর বর্ণযোজনার কাঁটা মাড়িয়ে যে শিশু 'পাখী ডাকিতেছে', 'ফল ঝুলিতেছে' প্রভৃতি অর্থবহ বাক্যাবলীর মধ্যে চোখে দেখা পরিচিত জীবন পরিধির প্রাত্যহিক প্রকৃতিজগৎকে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে উপস্থিত হ'তে দেখে অবাকবিস্ময়ে ভ'রে উঠেছে, আরও নতুন কিছুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করা তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু পড়া বলতে না পারলে গুরুমশাই নতুন পাঠ দেবেন না, সেই অনাস্বাদিত জগৎ সুদূরেই থেকে যাবে। পড়ানোর গুণে এই মনোভাব শিশুর মনে যতো বেশি গেঁথে দেওয়া যাবে, ততোই তার মনে অধ্যয়নস্পৃহা বেড়ে যাবে। তখন তার কাছে নতুন পড়া না দেওয়াই একটি শাস্তি ব'লে মনে হবে। এই শিশুমনো-বিশ্লেষণে বিদ্যাসাগর যে কতদূর সার্থকতা অর্জন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিচারণেই তার পরিচয় পাওয়া যায়,

'আমারও শিক্ষা সেই সময় সুরু হইল, কিন্তু সেকথা আমার মনেও নাই।'

'কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" তখন "কর খল" প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, "জল, পড়ে পাতা নড়ে।" আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে, তখন বুঝতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।'[১]

সে-যুগে এদেশে ওদেশে সর্বত্রই যখন 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ' আর 'spare the rod and spoil the child' নীতিই বাল্যশিক্ষার প্রধানতম

১ 'শিক্ষারম্ভ' জীবনস্মৃতি

উপায় ব'লে স্বীকৃত ছিল, বিদ্যাসাগর তখন সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষাদান পদ্ধতির সূচনা করতে চেয়েছিলেন। শারীরিক তাড়নার মাধ্যমে যে শিক্ষা তা শিশুর মনে ভয় জন্মিয়ে তার পশুবৃত্তিকেই জাগ্রত ক'রে তোলে ; তখন যেটুকু সে শেখে, তা ভয়ে শেখে, জানার আকর্ষণে তার শিক্ষা পূর্ণ হয় না। সে শিক্ষা তাই তার মনের উপরিতলে ভেসে বেড়ায়, অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে না ; ফলে, ভয়ের কারণ বিদূরিত হ'লে সে শিক্ষাও ভেসে যায়। কিন্তু জানার আকর্ষণে, ভালোবাসার মাধ্যমে যদি শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়, তবে তার মূল প্রবেশ করে শিশুর চৈতন্যের গভীরতম প্রদেশে ; রবীন্দ্রনাথের মতোই শৈশব জীবনের ওপার থেকে ভেসে আসা তার মধুর সৌরভ হৃদয়াকাশকে মেদুর ক'রে তোলে।

'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র 'চতুর্দশ' থেকে 'অষ্টাদশ পাঠ' পর্যন্ত বিদ্যাসাগর তাই যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে কোথাও শারীরিক নির্যাতনে শিশুর পাশবিক চেতনাকে জাগ্রত করার অপপ্রয়াস নেই, তার মানবিক বৃত্তির উজ্জীবনেরই সার্থক প্রচেষ্টা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই 'পাঠ'গুলিতেই শিক্ষক মশাই-এর জবানীতে পাঠে অমনোযোগী দুষ্ট প্রকৃতির বালকের দুরন্তপনার কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক মহাশয় তাকে শাস্তি দেবার ভয় দেখিয়েছেন, কিন্তু সামান্যতমও শারীরিক তাড়নার উল্লেখ করেননি। তাঁর শাস্তি প্রদান সর্বদাই বালকের মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্মানবোধকে জাগ্রত ক'রে তোলার প্রয়াসে সার্থক হ'য়ে উঠতে চেয়েছে। যেমন 'ষোড়শ পাঠে' দেখি, রাম পড়ার সময় গোল করেছিল, শিক্ষক মশাই তাই তাঁকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন, 'তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না'। 'সপ্তদশ পাঠে' নবীনের অপরাধ আর একটু গুরুতর, সে পথে ভুবনকে গালি দিয়েছিল। শিক্ষক মশাই-এর কণ্ঠস্বর তাই একটু বেশি কড়া, 'তুমি ছেলেমানুষ, জান না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভালো নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।' 'অষ্টাদশ পাঠে'র গিরিশ অকারণে স্কুল কামাই করেছে, পড়তে না এসে সারাদিন রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করেছে, বাড়িতেও অনেক উৎপাত করেছে। এই বোধ-হয় তার প্রথম অপরাধ তাই শিক্ষকমশাই তাকে কেবলমাত্র সতর্ক ক'রে ছেড়ে দিলেন, 'আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।'

শারীরিক শাস্তিবিধানকে বিদ্যাসাগর যে কতদূর ঘৃণা করতেন তা তাঁর

জীবনের একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়। একবার তিনি শুনলেন যে, তাঁর মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখার প্রধান শিক্ষক একটি ছেলেকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি এতোই উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন যে, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পদব্রজেই স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রধানশিক্ষক মহাশয়কে পদচ্যুত করলেন। লঘু পাপে গুরুদণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। শিক্ষকদের একযোগে পদত্যাগের হুমকীতেও তিনি বিচলিত হলেন না। সত্যাই তাঁরা পদত্যাগ করলে, তিনি নতুন শিক্ষক নিয়োগ করলেন, তবু একজন শিক্ষকের যে আচরণ তাঁর অপরাধ ব'লে মনে হয়েছিল, তার সঙ্গে কোন আপোষে রাজি হলেন না। ছাত্রদের অশিষ্টতাকেও তিনি কোনদিন ক্ষমা করেননি। প্রয়োজনে সংস্কৃত কলেজ ও মেট্রোপলিটান কলেজের অনেক ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার ক'রেও দিয়েছিলেন। অবশ্য ছাত্রদের ক্ষেত্রে দেখি তারা অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চাইলে তাঁর রাগ প'ড়ে যেতো সহজেই।

মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মধ্যে 'knowledge of an ancient sage', 'energy of an Englishman' আর 'heart of a Bengali mother'-এর সুষম সমন্বয়ে গঠিত একটি আশ্চর্য মহামানবকে আবিষ্কার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা, পাণ্ডিত্য আর কর্মক্ষমতা আজ বাংলাদেশে উপকথায় পরিণত হয়েছে, তাঁর সত্তর বৎসরব্যাপী জীবনকাহিনী হৃদয়বত্তা, পাণ্ডিত্য আর কর্মপ্রেরণারই বিচিত্র ইতিহাস বলা চলে। তার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত করুণাধারা সমানবেগে প্রবাহিত হ'য়ে দেশ ও জাতির জীবনকে অভিষিক্ত ক'রে 'বিদ্যাসাগরে'র সঙ্গে সঙ্গে সেদিন তাঁকে 'করুণাসাগরে'ও পরিণত করেছিল। এই করুণার উৎসমুখকেই মহাকবি মধুসূদন বাঙালী মায়ের হৃদয়ের উপমেয় ব'লে অভিহিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই হৃদয় কিন্তু কেবল-মাত্র দয়া ও দানের প্রবাহপথেই নিঃশেষিত হয়নি, মায়ের মতোই অসীম মমতা আর অতলান্ত ভালোবাসা নিয়েই তিনি বাংলাদেশের শিশুসমাজকে হাত ধ'রে বর্ণপরিচয়ের পথে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের শাশ্বত মহিমায়।

'উনবিংশ' ও 'বিংশ পাঠে' বিদ্যাসাগর গোপাল ও রাখালের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এবারের 'পাঠ' দু'টি তুলনায় একটু দীর্ঘ। এখানে তিনি কেবলমাত্র উপদেশাত্মক অনুচ্ছেদ রচনা করেননি, উপদেশকে একটি কাহিনীর

মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। গল্প শোনার প্রবৃত্তি শিশুমনের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। ঘুমপাড়ানি গানের যুগ পেরিয়ে শিশু যখন প্রথম কথা বলার, কথা শোনার আর কথা বোঝার যুগে উপস্থিত হোল, অমনি তার ফরমাস হোল গল্প বলার। তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় গল্প সেই রাজপুত্রের গল্প, নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, মানুষখেকো রাক্ষসদের পাহারা এড়িয়ে যে রাজপুত্র ঘুমপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যায়। তারপর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙায়, ভীষণযুদ্ধে রাক্ষসদের প্রাণ ভোমরাকে হত্যা ক'রে রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে নিয়ে আসে আপন রাজ্যে। এই রূপকথার গল্পটির মধ্যেও একটি সুন্দর উপদেশ আছে, নানা দুঃখকষ্ট স্বীকার ক'রে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করলে তবেই প্রার্থিত বস্তু বা বিষয় লাভ করা যায়। শিশুমন দুঃখকষ্টকে ভয় পায় না, বরং দুঃখকষ্টের তীব্রতা যতো বাড়ে, বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণও ততো বেড়ে যায়। কারণ, তার স্থির বিশ্বাস সব কষ্টের শেষে বাঞ্ছিত ফল-প্রাপ্তি ঘটবেই। এই বাঞ্ছিত ফললাভের প্রত্যাশায় দুঃখকষ্ট অস্বীকারের অনিচ্ছাকেই বিদ্যাসাগর 'উনবিংশ' ও 'বিংশ পাঠে' কাজে লাগিয়েছেন। একটি আদর্শ সংসারের মাতাপিতার শতধারে ঝ'রে পড়া ভালোবাসার অমৃত-মন্দাকিনী শিশুমনকে অভিষিক্ত ক'রে সর্বদাই সজীব ক'রে রাখে, তাঁদের কাছ থেকে সামান্যতম অনাদরও তার প্রাণে শেলের মতো বাজে। যদি শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় মাতাপিতার এই ভালোবাসাই তার জীবনে রূপকথার রাজকন্যার মতো, সামান্য মনোযোগ ও একাগ্রতার কষ্ট সহ্য ক'রে তুমি যদি লেখাপড়া না শেখো, তাহ'লে তাঁরা তোমাকে আর ভালোবাসবেন না; তখন রাজ-কন্যাকে লাভ করার জন্যে রাজপুত্রের কষ্ট স্বীকারের মতো সেও আর কষ্ট-স্বীকারে কুণ্ঠিত হবে না। 'উনবিংশ পাঠে'র গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, মন দিয়ে লেখাপড়া করে, তাই তার মা বাবা তাকে খুব ভালোবাসেন। পাঠ-শালাতেও সে মন দিয়ে গুরু মশাইয়ের কাছে পাঠ নিয়ে থাকে। তারপর বাড়ি ফিরে 'পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে কাপড় ছাড়িয়া, হাতমুখ ধোয়।' তারপর? তারপর 'গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়।' এই শেষবাক্যটিতে বিদ্যাসাগর কেবল গোপালের সুবোধ চরিত্রেরই পরিচয় প্রদান করেননি, গোপালদের উদ্ভব উৎস অসচ্ছল অথচ সচেতন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীসমাজের একটি অতি বাস্তবচিত্রও এখানে সংহত-রূপে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যাসাগরের একালীন একজন চরিতব্যাখ্যাতা বর্ণপরিচয়' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,

"আমরা ভুলে যাই যে 'বর্ণপরিচয়' নিছক বাংলা বর্ণেরই পরিচয় নয়, প্রকৃতি পরিচয়ও। বিদ্যাসাগর এই দুই পরিচয়েরই সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন 'বর্ণ-পরিচয়ে'র মধ্যে। আরও একটি তৃতীয় পরিচয়ও ছিল গোপাল ও রাখালের কাহিনীর মধ্যে। তাকে 'সমাজ পরিচয়' বলা যেতে পারে।"[১]

"গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়।"—এই বাক্যটিতে বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের নিঃস্ব জীবনযাত্রার মূল প্রেরণাটি বাঙময় হ'য়ে উঠে সেই সমাজ পরিচয়টিকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম শাশুড়ীর মুখে নববধূ ফুল্লরার গুণের পরিচয় দিতে প্রথমেই বলেছিলেন, বধূর প্রধান গুণ হোল,

'যেদিনে যতেক পায় সেদিনে তাহাই খায়
দেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।'

যে সংসারে 'দেড়ি অন্ন' থাকে না, সেখানে এর চেয়ে বড়ো গুণ আর কি হ'তে পারে যে, যা জোটে তাই খেয়ে বধূ হাসিমুখে সাংসারিক কর্তব্য পালন ক'রে চলে? দুঃখ তো আছেই, কিন্তু তাই ব'লে কেবলমাত্র দুঃখের পিছনে সব মনোযোগ নিয়োগ করলে দুঃখের তো পরিসমাপ্তি ঘটে না, মাঝখান থেকে জীবনের সব রস শুকিয়ে যায়। দুঃখকে স্বীকার ক'রে দুঃখজয়ী জীবনযাত্রা অনুসরণ করাই বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত এই সমাজের প্রধানতম প্রবর্তনা। সেই পথে চলতে চলতে হঠাৎ এক একবার তাদের মধ্যেই আবির্ভূত হন এমন এক একজন মহামানব, যাঁদের প্রভায় সারা দেশ আলোকিত হ'য়ে ওঠে, যাদের উদ্দেশ্যে কবিকণ্ঠের বন্দনাগান ধ্বনিত হয়ে ওঠে,

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে',

ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে,

"কী পুণ্য নিমেষে তব / শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা, / প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এলো প্রত্যুষের বিভা।"

সংসারের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে মায়ের অপ্রচুর ভাণ্ডারে যা আছে তাই দিয়েই অরণি সৃষ্টি ক'রে মানবযজ্ঞের হোমাগ্নিশিখাকে দেহাধারে লালনের বাণীই বিদ্যাসাগরের জীবনবাণী। গোপালের কাহিনীতে সেই মরণজয়ী প্রাণের বীজই বপন করতে চেয়েছেন তিনি। তাই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' কেবলমাত্র বর্ণমালা পরিচয়েরই

[১] বিনয় ঘোষ-'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' 'তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ পৃ. ৩২৩

একটি সাধারণ গ্রন্থ নয়, বাংলাদেশের জীবনচেতনার গভীর মূল থেকে রস আহরণ ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে তার প্রাণসত্তা। অথচ জীবনের ক্ষেত্রে দেখি,

"বর্ণপরিচিত যাঁরা, তাঁরা হয়তো 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে একথা ভেবে দেখেননি, ভাববার অবকাশও পাননি। বিদ্যার দুর্গম সাধনপথে যাত্রা ক'রে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তারপর পাঁচবছর বয়সের অন্যান্য বাল্যস্মৃতির সঙ্গে 'বর্ণপরিচয়'-স্মৃতিও আমাদের মন থেকে মুছে যায়। জীবনের যাত্রাপথে কত কাক ডাকে, কত পাখী ওড়ে, কত জল পড়ে, কত পাতা নড়ে। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়ে'র কথা পরে আর মনে পড়ে না।"[১]

'বর্ণপরিচয়' কিন্তু তাতে বিলুপ্ত হয় না, নতুন মানুষকে বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে বিশ্বপরিচয়ের দীক্ষা দিতে দিতে আবার নতুন জীবনযজ্ঞের আয়োজনে মেতে ওঠে।

'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ' প্রকাশের দু'মাস পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ'। এই দ্বিতীয় ভাগে প্রধানতঃ যুক্তব্যঞ্জনের দৃষ্টান্তগুলি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমভাগে বিস্তারিতভাবে স্বরবর্ণযোজনার নিয়মবিধি ও দৃষ্টান্তের পরিচয় দেবার পর বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় ভাগে অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যঞ্জনবর্ণসংযোগের একটি অভিনব বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করেছেন। সংযুক্তবর্ণকে তিনি 'ফলা বানান' ও 'মিশ্রসংযোগ বানান' এই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমে 'ফলা বানান' শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি 'য'-ফলা, 'র'-ফলা, 'ল'-ফলা, 'ব'-ফলা, 'ণ'-ফলা, 'ন'-ফলা ও 'ম'-ফলা, এই সাতরকমের ফলা বানানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ 'য'-ফলা-র কথা ধরা যাক। 'য'-ফলার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে তিনি 'য'-ফলার লেখ্য-রূপটি প্রদর্শন করেছেন—'য'-ফলা—য ্য। তারপর ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিটি বর্গের যে বর্ণগুলির সঙ্গে 'য'-ফলার ব্যবহার প্রচলিত তাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যেমন 'ক'-বর্গের ক্ষেত্রে,

ক য ক্য ঐক্য বাক্য মাণিক্য।
খ য খ্য মুখ্য অখ্যাতি উপাখ্যান।
গ য গ্য ভাগ্য যোগ্য আরোগ্য।

এরপর তিনি 'চ'-বর্গের উদাহরণ দেখিয়েছেন। 'ক'-বর্গের উচ্চারণে

১ বিনয় ঘোষ-'বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ', তৃতীয় খণ্ড ; পৃ. ৩১৯-২০

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাঁচটি বর্ণের মধ্যে কেবলমাত্র 'ক', 'খ' ও 'গ'-এর সঙ্গেই 'য'-ফলার ব্যবহার সুপ্রচলিত। 'শ্লাঘ্য' শব্দে 'ঘ'-এর সঙ্গে 'য'-ফলার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতার জন্যেই বোধ হয়, বিদ্যাসাগর, 'ঘ'-বর্ণে 'য'-ফলা যোগের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেননি।

'চ'-বর্গের উচ্চারণে দেখি,

চ য চ্য বাচ্য বিবেচ্য পদচ্যুত।

জ য জ্য রাজ্য বিভাজ্য জ্যোতিষ।

'চ'-বর্গের বর্ণগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'চ' এবং 'জ'-এর সঙ্গে 'য'-ফলার ব্যবহার আছে। 'ছ', 'ঝ' এবং 'ঞ'-র সঙ্গে 'য,-ফলার ব্যবহার যে অপ্রচলিত সেই জ্ঞান থাকলে বানানবিভ্রাটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যেমন 'ঝ'-এর সঙ্গে 'য'-ফলার ব্যবহার নেই, কিন্তু 'সহ্য', 'বাহ্য', 'লেহ্য' প্রভৃতি শব্দগুলির উচ্চারণে একটা ক্ষীণ 'ঝ'-ধ্বনির আবির্ভাব ঘটে এবং প্রথম শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে 'ঝ্য' ব্যবহারের একটা প্রবণতা আসতে পারে। কিন্তু 'চ-বর্গের বর্ণগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'চ' ও 'জ'-এর সঙ্গে 'য'-ফলার ব্যবহার সিদ্ধ, এই জ্ঞান থাকলে সেই ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। ঠিক তেমনিভাবে জানা যায় 'ট'-বর্গের ও 'ত'-বর্গের প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে 'য'-ফলার ব্যবহার সিদ্ধ। 'প'-বর্গের মধ্যে 'প', 'ভ', 'ম'। 'য'-বর্গের মধ্যে 'য', 'ল', 'ব', 'শ'। 'ষ', 'স', 'হ'-বর্ণের সঙ্গেও 'য'-ফলার ব্যবহার আছে। অন্যদের সঙ্গে 'য'-ফলা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এমনি একটি নিয়ম প্রস্তুত ক'রে কেবলমাত্র সেই নিয়মের মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর, 'য'-ফলার বানান শিক্ষা দিতে চাননি। তিনি প্রধানতঃ দৃষ্টান্তের ওপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন। আবার দৃষ্টান্ত আহরণ করতে গিয়ে তিনি এমন সব শব্দ গ্রহণ করেছিলেন যাদের পরপর উচ্চারণে কোন অর্থাগম না হ'লেও একটি অপূর্ব ছন্দঃস্রোতের আবির্ভাব ঘটে, যা শব্দশিক্ষার্থী বালকের কানে ধ্বনিত হ'য়ে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। ফলে, তার পক্ষে শব্দটি মনে রাখা সহজ হয় এবং লেখার সময় এই স্মৃতি যথেষ্ট সহায়ক হ'য়ে ওঠে। যেমন,

প য প্য রৌপ্য আলাপ্য আপ্যায়িত।

ব য ব্য নব্য দিব্য তালব্য অব্যাহতি।

এই সমস্ত শব্দের বানানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া কিন্তু বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত ছিল না। বানানের বৈচিত্র্য দেখিয়ে সেই বিচিত্র বানানপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। 'বিজ্ঞাপনে' স্পষ্টভাবে এই উদ্দেশ্য প্রকাশ ক'রে তিনি লিখেছিলেন,

"সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে; শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগমাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরুশিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।"[১]

'ঐক্য', 'বাক্য', 'মাণিক্যে'র অর্থ নিয়ে দণ্ডপাণি গুরুমহাশয় শিশুপালবধের উদ্দেশ্যে পাছে বালকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তাই বিদ্যাসাগরের এই সতর্কবাণী। আবার 'ঐক্য', 'বাক্য', 'মাণিকে'র অর্থবোধ শিক্ষকের পক্ষে দুর্বোধ্য না হ'লেও আর একটু অগ্রসর হ'য়ে 'নিষন্ন বিষন্ন ষন্নবতি', কি 'মুদ্গার উদ্গার মদ্গুরে', গুরু শিষ্য উভয়েরই অর্থভারে অবনতপৃষ্ঠ হবার সম্ভাবনা। ফল, ভারলাঘবের জন্যে গুরুমহাশয়ের এমন অর্থদান, যার সচলতা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে নানা বাধা আসতে বাধ্য। তাই বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা, 'শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক'।

ফলা বানানের পর একই উপায়ে বিদ্যাসাগর 'রেফ-র- ´-' এবং দুই ও তিন অক্ষরের মিশ্রসংযোগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। সর্বত্রই একটি চিত্তাকর্ষক বানানবিন্যাসরীতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে ছোট ছোট সরল শব্দ দিয়ে সুরু ক'রে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ জটিল শব্দের পরিমাণ বেড়েছে। যেমন,

শ্রম বিশ্রাম আশ্রিত শ্রীমান
গুল্ম শাল্মলী উল্মুখ।
হর্ষ বিমর্ষ বর্ষা বার্ষিক।
আনন্দ মন্দির সিন্দূর সন্দেহ।
হস্ত নিস্তার আস্তিক নিস্তেজ।
সম্প্রীত সম্প্রতি . সম্প্রদায়।

বিশেষভাবে নির্বাচিত শ্রুতিমধুর শব্দগুলির উচ্চারণে যে ধ্বনিরস উৎপন্ন হয়, মুগ্ধ বালকহৃদয় তারই আকর্ষণে বারবার আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শব্দগুলিকে কণ্ঠস্থ করে; অজানা শব্দসম্ভারের গুরুগম্ভীর ছন্দঃস্রোত ধ্বনিমাধুর্যে মণ্ডিত হ'য়ে তার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়।

কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের উপলবিস্তীর্ণ পথে অবিরাম পদচারণায় শিশুমন ক্লান্ত হ'য়ে উঠতে পারে এবং আপন হৃদয়ের সহজাত প্রেরণায় শিক্ষা করার বিদ্যাসাগরীয় তত্ত্বটি তখন বাধাগ্রস্ত হ'তে পারে। কেবলমাত্র তত্ত্বনির্দেশেই নয়, তত্ত্বের

[১] 'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ', প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রয়োগরীতিগত এই বাধাবিঘ্ন সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগর সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। 'বিজ্ঞাপনে' তাই তিনি লিখেছিলেন,

'ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐসকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক-মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।'[১]

'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয়ভাগে' এই রকম দশটি পাঠ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই দশটি পাঠ একই আকারের বা প্রকারের নয়। 'প্রথম', 'দ্বিতায়' এবং 'তৃতীয় পাঠে' ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যাচিহ্নিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদে কয়েকটি বাক্যের সংযোগে গঠিত উপদেশ দান করা হয়েছে। 'চতুর্থ পাঠ' থেকে প্রত্যক্ষ উপদেশের পরিবর্তে এক একটি কাহিনীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সেই উপদেশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়েছে। কাহিনীগুলি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ এবং তুলনায় জটিল হ'য়ে উঠেছে। 'তৃতীয় পাঠ' থেকে শিরোনাম ব্যবহার ক'রে মূল বক্তব্যটি পাঠার্থী বালকের কাছে পূর্বাহ্ণেই তুলে ধরা হয়েছে। পাঠগুলির উদ্দেশ্যমূলক ভূমিকায় ধীরে ধীরে প্রয়োগ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম দিকে তাদের উদ্দেশ্য যেখানে অধীত বানানবিদ্যার বিশুদ্ধি পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ, শেষের দিকের পাঠগুলিতে সেই উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হ'য়ে বিশুদ্ধ উপদেশাত্মক মনোভাবই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে তাই কাহিনী সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়া হয়নি, কিন্তু শেষের দিকে বানানবোধ ব্যতিরিক্ত একটি গল্পরসের আবির্ভাব ঘটেছে। পাঠগুলির বিস্তৃত পরিচয় নিলে এগুলির পিছনে বিদ্যাসাগর মানসের কোন প্রেরণা কার্যকরী ছিল, তা উপলব্ধি করতে পারা যায়।

'প্রথম পাঠ'টি সন্নিবিষ্ট হয়েছে য-ফলা বানানপ্রকরণের পরেই। সচেতন-ভাবে বানানশিক্ষার জন্যেই বানানশিক্ষা করতে গিয়ে বালকের মনে একটা বিরূপতার ভাব জাগতে পারে। ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দঃস্পন্দ সে বিরূপতার পরিমাণ হ্রাস করলেও তা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করতে পারে না। এমন কি অধীত বাক্যগুলির সম্বন্ধেও তার প্রসন্নতার ঘাটতি ঘটে। অথচ সেই 'য'-ফলা বানান-শিক্ষার যাথার্থ্য পরীক্ষাও প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কৌশলে এই দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক:

য-ফলা বানানের দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় শব্দটি হোল 'বাক্য'। বিদ্যাসাগর-

১ 'বর্ণপরিচয়', দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

নির্দিষ্ট পন্থায় শব্দটির গঠন মাত্রই বালককে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অর্থ তখনও তার অনায়ত্ত। এই অর্থাতীত ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দটি বালককে বিমুগ্ধ করলেও তার বোধের অতীত হ'য়েই রইল। লাভ হোল কেবলমাত্র বানানশিক্ষা। বিদ্যাসাগর 'প্রথমপাঠে'র প্রথম অনুচ্ছেদে 'বাক্য' শব্দটির অর্থশিক্ষা দিলেন তিনটি পরস্পর অর্থসমন্বিত বাক্যগঠন করে,

'কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না।
কুবাক্য কহা বড় দোষ।
যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।'

তিনটি বাক্যে বিদ্যাসাগর 'বাক্য' শব্দটি কোথাও ব্যবহার করেননি, তিনি, ব্যবহার করেছেন 'কুবাক্য'। তাই বালকের স্মৃতিজাত 'বাক্য' শব্দটি ব্যবহৃত না হওয়ায় উদাহৃত বাক্যগুচ্ছে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে বালকের মনে কোন সচেতনতা আসে না, একটা অর্থসমন্বিত নতুন বাক্যগুচ্ছের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। অথচ 'কুবাক্য' শব্দটির অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশটির বানান ও উচ্চারণ তার কাছে অপরিচিত নয়। পাঠগুলি সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর শিক্ষকমশাইকে অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে বলেছেন। সেই নির্দেশানুযায়ী বালক জানতে পারে কুবাক্যের অর্থ মন্দ কথা, কু=মন্দ; বাক্য=কথা; এখন অধীত বানানটি অর্থ সমন্বিত হ'য়ে বালকের মনে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোল। তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উপদেশ লাভ হোল 'কুবাক্য কহা বড় দোষ'। কিন্তু এই দোষের ফল স্বরূপ কোন শারীরিক শাস্তি নয়, যে শাস্তি তার ভাগ্যে জুটবে তা' তার আত্মসম্মানের পক্ষে যথেষ্ট হানিকর,—'যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না'। 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগে'র অনুসৃত নীতি অনুযায়ী এখানেও দেখি বিদ্যাসাগর বালকের সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে যেন বলতে চান, মন্দকথা বললে, শারীরিক নিপীড়ন নয়, তার থেকেও বড়ো শাস্তি, সকলের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে।

এমনি পরোক্ষভাবে পরিচিত বানানের শব্দগুলির অর্থ শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর উপদেশ দানেরও ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষক মহাশয়ের কাছে অর্থ ও তাৎপর্য শিক্ষার পর প্রথম পাঠে বালকেরা শিক্ষা করে :

১। 'যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।'

২। 'যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসেনা।'

৩। 'যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভালবাসেনা, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে।'

৪। 'যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।'
৫। 'পিতামাতার কথা না শুনিলে তাঁহারা তোমায় ভালবাসিবেন না।'
৬। 'যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।'

'দ্বিতীয় পাঠে'ও বানান জানা শব্দের অর্থজ্ঞানের মাধ্যমে উপদেশ-দানের পর 'তৃতীয় পাঠ' থেকেই শব্দার্থ শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম ক'রে উপদেশদানের পরোক্ষ উদ্দেশ্যেরই প্রাধান্য ঘটেছে। 'তৃতীয় পাঠে' 'সুশীল বালক' শিরোনামায় বিদ্যাসাগর সুশীল বালকের দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন। এ যেন কোমলমতি শিশুমনে বিদ্যাসাগরের অভিনব 'দশোপদেশ-মালা' (Ten Commandments) সঞ্চার ক'রে দেবার অভিনব প্রয়াস। এই দশটি গুণ হোল,—'পিতামাতার প্রতি ভক্তি,' 'পাঠে মনোযোগ,' 'ভ্রাতাভগিনীর প্রতি ভালবাসা,' 'মিথ্যাচারের প্রতি ঘৃণা,' 'অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ', 'কটুবাক্য পরিহার', 'চৌর্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা', 'আলস্য পরিহার,' 'কুসঙ্গ পরিহার,' এবং 'গুরুর প্রতি ভক্তি'। পরবর্তী পাঠগুলিতে বিভিন্ন বালকের কাহিনীর মাধ্যমে এই উপদেশমালাকেই বিদ্যাসাগর গল্পে গেঁথে প্রকাশ করেছেন। 'বর্ণপরিচয়' রচনার পিছনে কেবলমাত্র বর্ণজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ নির্ণয়ই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না, বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এর মধ্যে বালক তার চরিত্র নীতিরও প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করবে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন এবং চরিত্র গঠনের মাধ্যমে যথার্থ মনুষ্যসৃষ্টি, শিশুপাঠ্য 'বর্ণপরিচয়ে'র মধ্যেও বিদ্যাসাগরের সে বক্তব্য সর্বত্রই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'তৃতীয় পাঠে'র দশোপদেশমালার দ্বিতীয় উপদেশ 'পাঠে মনোযোগে'র কথাই 'চতুর্থ' ও 'পঞ্চম পাঠে'র যাদব ও নবীনের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞের মতে রসসৃষ্টি সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হ'লেও পরোক্ষে তা নীতি শিক্ষাও দিয়ে থাকে। সাহিত্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মাবধি, গল্প কাহিনীর মধ্যে শিশু অনাবিল আনন্দ লাভের মাধ্যমে অনাবিল নীতিজ্ঞানও লাভ ক'রে থাকে। শিশুমনের এই প্রবণতাকে বিচার ক'রে তার মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গুরুসম্মিতভাবে নয়, মাতৃসম্মিতভাবে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদান-রীতি তাই দণ্ডপাণির চণ্ডনীতি অবলম্বন করেনি, মায়ের ভালোবাসার অমৃতনির্ঝর ধারাই তার মূল প্রেরণাদায়িনী ছিল। আট বছরের ছেলে যাদব আর ন'বছরের ছেলে নবীনের কাহিনীতে সেই রীতিতেই তিনি পাঠে অমনোযোগী হওয়ার

কুফল ও যথার্থ পাঠাভ্যাসের সুফল বর্ণনা ক'রে নীতি শিক্ষাই প্রচার করতে চেয়েছেন আট ন'বছরের বালকসমাজে।

যাদব বিদ্যালয় ফাঁকি দিয়ে পথে পথে খেলা ক'রে বেড়াতো। ভুবন আর অভয়কেও সে সেই দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সে অপচেষ্টা সার্থক হয়নি। গুরুমশাই তার বাবার কাছে এই দুষ্কর্মের কথা জানালে 'যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন। বই কাগজ কলম যাহা কিছু দিয়াছিলেন. সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি তিনি যাদবকে ভালবাসিতেন না। কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।' বাবার ভালোবাসা হারানোই যাদবের জীবনে চরম শাস্তি ব'য়ে এনেছে। ন'বছরের বালক নবীনও যাদবের পথের পথিক ছিল। পথের মধ্যে খেলা করার জন্যে সে একটি ছেলেকে আহ্বান জানালে ছেলেটি বললে, 'আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। এজন্য বাবা আমাকে ভালোবাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভালোবাসিবেন না।' নবীন আর একটি ছেলেকে ডাকলে সেও প্রায় একই রকম উত্তর দিলে, 'বাবা কহিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি। খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময় কাজ না করিয়া খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব।' ওই একই প্রস্তাবে একটি রাখাল বালক নবীনকে বললে, 'কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা একদিন বলিয়াছেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়।' নবীনের বয়স ন'বছর। তাই সামান্য বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটেছে। সকলের কথা শুনে সে চিন্তা করতে লাগলো, 'সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য তারা সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি লেখাপড়ার সময়, লেখাপড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তা হ'লে আমি চিরকাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে পারিলে, আর আমায় ভালবাসিবেন না, মারিবেন, গালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না। আমি আর লেখাপড়ায় অবহেলা করিব না।' শুভ বুদ্ধির উদয় হওয়াতে নবীনকে আর যাদবের দুর্দশায় পড়তে হোল না। গল্প দু'টির মধ্যে বিপথগামী দুই ছাত্রের দুই পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদবের পরিণতি থেকে রেহাই পেতে হ'লে যে নবীনের মতো সুচিন্তা করতে হবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

পড়ানোর গুণে এই ভাবটি কেবলমাত্র ভালো বা পাঠে মনোযোগী ছাত্রদেরই কল্যাণ করবে তা নয়, পথভ্রষ্ট ছাত্রকেও যথার্থ পথের সন্ধান দিয়ে পুনরায় তাকে পাঠে মনোযোগী ক'রে তুলবে।

'সপ্তম পাঠে' রামের কথায় বিদ্যাসাগর 'তৃতীয় পাঠে'র দশোপদেশ-মালাকে বালকের স্মৃতিতে দৃঢ়মূল ক'রে দেবার জন্যেই যেন গল্প ফেঁদেছেন। তাই সেখানে দেখি সুবোধ বালক রাম কখনও পিতামাতার অবাধ্য হয় না, সে তার ভাইবোনের ওপর অত্যন্ত সদয়, লেখাপড়াতেও তার বড় যত্ন। রাম কখনও মন্দ কাজ করে না, কাউকে মন্দ কথা বলে না। 'অষ্টম পাঠে' মা বাবার সঙ্গে সন্তানের প্রকৃত আচরণ পদ্ধতি ও কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরুমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা সুরেন্দ্র নামে একটি ছেলেকে কেমন ক'রে অসৎপথ থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনলো তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'নবম পাঠে'। ঢিল ছুঁড়ে পাখি মারতে গিয়ে একটি ছেলেকে আহত করায় গুরুমশাই সুরেন্দ্রকে তিরস্কার করেছেন। অনুতপ্ত সুরেন্দ্র তখন আপন অপরাধ স্বীকার ক'রে শুধু ক্ষমাই চায়নি, অনুশোচনায় কেঁদে ফেলেছে। সন্তুষ্ট হ'য়ে গুরুমশাই তখন তাকে বলেছেন, 'সুরেন্দ্র, তুমি যে দোষ করিয়া স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও ওরূপ দোষ করিবে না বলিলে, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।'

'ষষ্ঠ পাঠ' এবং 'দশম পাঠে' চৌর্যবৃত্তির পরিণাম চিত্রিত ক'রে বিদ্যাসাগর, বালকের সঙ্গে সঙ্গে তার অভিভাবককেও সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে, অতি শৈশব থেকে এই দোষকে যদি নির্মূল না করা যায় তবে পরিণামে সেই বালকের যে ভয়াবহ দুর্গতি ঘটে, তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম থেকে অভিভাবকরাও মুক্তি পান না।

'ষষ্ঠপাঠে' মাধবের গল্পে দেখি অতি মধুর চরিত্রের মনোযোগী বালক মাধবের চৌর্যপ্রবণতাই ছিল একমাত্র চারিত্রিক দোষ। এই দুষ্প্রবৃত্তির জন্যে অন্যান্য সব গুণ নিয়েও সে সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে। অবশেষে তাকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে। অন্য বিদ্যালয়ে গিয়েও তার এই দোষ কাটেনি, তাই সেখান থেকেও সে বিতাড়িত হয়েছে। তার বাবা রেগে গিয়ে তাকে বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু লাভ হোল না, 'বাল্যকাল হইতে চুরির অভ্যাস করিয়া, মাধব আর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রমে

ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল।' ফলে সকলের কাছেই সে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হোল। সকলেই তাকে সন্দেহ ক'রে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে লাগলো। তখন 'সে না খাইতে পাইয়া পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।' বাস্তবজীবনে এই ধরণের বালকের প্রতি কারো স্নেহ বা দয়া না হ'লেও করুণাসাগর বিদ্যাসাগর চরমদোষদুষ্ট এই বালককেও যে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারতেন না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু মাধবের গল্পে চুরির অভ্যাসের ভয়াবহ পরিণতি চিত্রিত ক'রে, সে-বিষয়ে বালকদের মনে একটা inhibition গ'ড়ে তোলার জন্যেই তিনি তার করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই 'দশম পাঠে' ভুবনের গল্পে চৌর্যাপরাধী ভুবনের পরিণতি আরও নিদারুণভাবে বর্ণিত হয়েছে, ভুবনের ফাঁসি হয়েছে।

মাসীর কাছে প্রতিপালিত ভুবনের ছেলেবেলা থেকেই চুরির অভ্যাস গ'ড়ে ওঠে, মাসী তা' বুঝতে পেরেও তাকে সাবধান করেননি। ফলে তার সাহস বেড়ে যায়, সুযোগ পেলেই সে চুরি করতে আরম্ভ করে। এমনি ক'রে কালে সে একজন পাকা চোর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু একদিন তাকে ধরা পড়তে হয়, এবং তার চৌর্যপরাধের প্রমাণ পেয়ে বিচারক তার ফাঁসির আদেশ দেন। বধ্যভূমিতে নীত হ'লে শেষবারের মতো সে একবার তার মাসীকে দেখতে চাইলে, মাসী এসে কাঁদতে আরম্ভ করলে, ভুবন বললে, 'মাসী, এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব।' মাসী কাছে গেলে, ভুবন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁত দিয়ে জোরে কামড়ে তার একটি কান কেটে নিল। তারপর তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে বললে, 'তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে তুমি যদি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এদশা ঘটিত না। তাহা কর নাই। এজন্য তোমার এই পুরস্কার।' ভুবনের চৌর্যপ্রবণতা তাই কেবলমাত্র তার জীবনেই চরম ট্র্যাজেডি ব'য়ে আনেনি, তার অভিভাবিকাকেও দায়িত্বহীনতার প্রতিফল সম্বন্ধে চরম শিক্ষা দান করেছে। 'দশম পাঠে'র 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়' শীর্ষক ভুবনের এই কাহিনীটিতে তাই কেবলমাত্র বালকদের প্রতিই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়নি, অভিভাবকদেরও দায়িত্বসচেতন ক'রে তোলার জন্যে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রেই কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে,

"না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত কখনও চুরি না করে। পিতামাতা প্রভৃতির কর্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।"

একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীন উপদেশ প্রবণতা সত্ত্বেও, এই গল্পটিকে কেন্দ্র করেই, সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের সারস্বতচেতনা যেন চকিত বিদ্যুৎঝলকের স্বল্পস্থায়ী প্রকাশে আপন প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছে। এই কাহিনীটিতেই বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের পূর্বাভাস দ্যোতিত হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়নে বলা হয়,

"গীতিমূলক ছোট ছোট গল্প দৈবাৎ সাহিত্যিক ছোটগল্পের কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের শেষে ভুবনের কাহিনীটি ইহার ভালো উদাহরণ। ছোটগল্পের যাহা প্রধান লক্ষণ—একটি অখণ্ড ভাবরসে কাহিনীর পরিসমাপ্তি—তাহা ইহাতে পরিস্ফুট। সুতরাং বাঙ্গালা মৌলিক ছোটগল্পের একটি আদি নিদর্শন বলিয়া এটিকে নেওয়া চলে।"[১]

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা মৌলিক ছোটগল্পের এই বৈশিষ্ট্য যে কাহিনীটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়, ঈসপ কাহিনীর 'একজন চোর ও তার মা' গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। তাই 'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয়ভাগ'-এর মতো প্রথম শিক্ষার্থী বালকদের জন্যে রচিত পাঠ্যপুস্তক প'ড়েও মনে হয়, যে মহান শিল্পীর সাহিত্য প্রতিভা শিশুপাঠ্য অনুবাদ কাহিনীর মধ্যেও এমনভাবে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে, তিনি যদি সচেতনভাবে সাহিত্যসৃষ্টির অবসর পেতেন, তবে হয়তো তাঁরই হাতে বাংলা ছোটগল্পের গোড়াপত্তন হ'ত। কিন্তু একটা জাতির মহান কর্ণধারের পদে অভিষিক্ত ক'রে বিধাতা যাঁকে সংসারে পাঠিয়েছিলেন, সাহিত্য সাধনার অবসর তো দূরের কথা, 'বর্ণপরিচয়-'ও তাঁকে রচনা করতে হয়েছিল কর্মোপলক্ষে মফঃস্বল পরিভ্রমণের সময়, পথের মধ্যে, পালকীতে বসে।

২

'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ'-এ ঈসপরচিত গল্পকাহিনীর যে অস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়, উজ্জ্বলতর ও সার্থকতর ভাবে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'কথামালা' গ্রন্থে। ঈসপকাহিনীর কৌতুকপ্রদ আপাত অলীক গল্পগুলি সম্বন্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের যে বিরূপ মনোভাব ছিল, বিদ্যাসাগরও সম্ভবতঃ তার থেকে মুক্ত ছিলেন না, 'বোধোদয়'-এর 'বিজ্ঞাপনে'ই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়' দু'টি রচনার সময় সুকুমারমতি শিশুচিত্তের সহজ প্রবণতা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি এই জীবজগতের পটভূমিকায় লিখিত কাহিনীমালার প্রতি শিশুচিত্তের সহজাত আকর্ষণের ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন এবং সেই আকর্ষণবোধকে অনুসরণ ক'রেই শিশুচিত্তে প্রথম শিক্ষার বীজ উপ্ত করার সার্থকতা উপলব্ধি করেন। সে-যুগে অন্যান্য শিশু-পাঠ্য গ্রন্থরচয়িতারা নানাবিধ নীতিকথা ও জ্ঞানসঞ্চারক বিষয়বস্তুকে শিশুশিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় বস্তু মনে ক'রে শিশুর ওপর নানা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের ভার চাপাতে চাইতেন। সেই গ্রন্থগুলির গভীর সারবত্তা অনস্বীকার্য হ'লেও নীরস উপস্থাপনাভঙ্গি সেগুলিকে শিশুর পক্ষে ভীতিজনক ক'রে তুলেছিল। তাদের মাধ্যমে জ্ঞানরাজ্যের অতুল বৈভবের সন্ধান পাওয়া গেলেও তাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হ'তে গেলে অনেক উপলখণ্ড, অনেক কাঁটাগুল্ম মাড়িয়ে তবেই অগ্রসর হ'তে হ'ত। শিশুচিত্তের আয়াস ছিল নিতান্ত ক্লান্তিকর এবং একান্ত বিরক্তিজনক। বিদ্যাসাগরই সে-যুগের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা, যিনি শিশুমনের এই প্রবণতাকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি শিশুকে খেলতে খেলতে শেখার মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। শিশুর ঘাড়ে জ্ঞান ভাণ্ডারের ভার চাপিয়ে জ্ঞানকে তিনি বোঝায় পরিণত করেননি। শিশুমনের বিশেষ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যস্থলে উপনীত ক'রে, পরম বিস্ময়বোধের সঙ্গে তার মনে জ্ঞানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকৃতি অন্বেষণ করতে গিয়েই বিদ্যাসাগরের উপলব্ধি ঘটেছিল, বয়স্ক মনের কাছে যতোই অলীক ব'লে মনে হোক না কেন, জীবজগতের প্রতি শিশুর একটা অদম্য আকর্ষণ আছে। গৃহপালিত গরু, বিড়াল, কুকুর থেকে হিংস্র বাঘ সিংহ প্রভৃতি সমস্ত পশুর প্রতিই তার অসীম কৌতূহল। তাই সেই জীবজগতের মধ্যে মানবীয় চেতনার আরোপ ক'রে যদি গল্পকাহিনী তৈরী করা হয় তবে শিশুচিত্তের কাছে তা পরম উপাদেয় ব'লে

মনে হবে। যে পশুপক্ষীর জগৎ তার কাছে প্রতিনিয়ত অসীম কৌতূহল আর কৌতুকের অফুরন্ত ভাণ্ডার ব'লে মনে হয়। সেখানকার অধিবাসীরা যখন মানুষের মতো কথা বলে, হাসিকান্না, সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, শিশুমনের কাছে তখন তা' আরও আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। শিশুমনের এই স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসরণ ক'রেই এদেশে বিষ্ণুশর্মা আর গ্রীসদেশে ঈসপ নানা কাহিনী রচনা করেছিলেন। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশে'র মধ্যে নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও ঈসপের কাহিনীগুলিতে বিদ্যাসাগর কোন ত্রুটি দেখতে পাননি। তাই বিষ্ণুশর্মা-রচিত প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীগুলি অপেক্ষা ঈসপ রচিত প্রাচীন গ্রীককাহিনীগুলি অনুবাদ ক'রে তিনি বাংলাদেশের শিশুজগতে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন।

'কথামালা'-র বিজ্ঞাপনে ঈসপের কথা আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

'রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে, গ্রীসদেশে, ঈসপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্পের ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং য়ুরোপের সর্বপ্রদেশেই, অদ্যাপি, আদরপূর্বক, পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।'

গল্পগুলির এই কৌতুক প্রাণতাই শিশুচিত্তকে আকর্ষণ ক'রে অন্তর্নিহিত সদুপদেশের প্রভাবে শিশুচিত্তকে সুগঠিত ক'রে তোলে। ফলে কৌতুকের মাধ্যমেই নীতিশিক্ষা এবং চরিত্রগঠনের কাজ সুসম্পন্ন হ'য়ে যায়। অনিবার্যভাবেই বিদ্যাসাগর তাই ঈসপকাহিনীর বঙ্গানুবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 'কথামালা' নামে প্রকাশিত হ'য়ে সেই অনুবাদ শিশুপাঠ্য জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বহু সংস্করণের মধ্য দিয়ে সেই আলোড়নজাত আকর্ষণ দিন দিন বেড়ে গিয়ে আজ 'কথামালা' বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়েছে।

'কথামালা'র জীবজগতে যেমন মানুষ আছে, তেমনি সিংহ থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত প্রতিটি জীবজন্তুরই অবাধ সঞ্চরণ ঘটেছে। যে সমস্ত গুণের দ্বারা মানুষ যথার্থ 'মানুষ' নামের যোগ্যতা অর্জন করে সেই সমস্ত গুণ মানবেতর জীবজগতেও আবির্ভূত হয়েছে। আবার অমানবোচিত পাশবিক কদাচার মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হ'য়ে মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকটিও প্রকট ক'রে

তুলেছে। অর্থাৎ ভালোমন্দ উভয়বিধ চরিত্রগুণ মানব ও মানবেতর জীবজগতের সব পার্থক্য অপসারণ ক'রে একটি একাকারের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুমনের সহজ সরল জগৎকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের হাজার বেড়া নানা খণ্ড ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ভাগ করতে পারে না। তার সর্বত্রচারী কল্পনা আকাশ সমুদ্র পৃথিবীর সর্বস্থানেই ডানা মেলে অবাধে উড়ে বেড়ায়; কোথাও সে যেমন অসম্ভাব্যতার কোন নিদর্শন দেখে না, তেমনি কারো মধ্যে পরম বিশ্বাসের আশ্বাসও উপলব্ধি করে না। তাই তার জগতে মানুষ যেমন কথা বলে, পশুপক্ষীও তেমনি স্বচ্ছন্দ বাক্যালাপে পরস্পরকে আপ্যায়িত করে। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি যেমন মানবমনকে আলোড়িত করে, পশুপক্ষীর মনেও তেমনি তারা তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে। শিশুমনের এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্বাসে ভরা জগতের পটভূমিকাতেই 'কথামালা'-র বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। এরমধ্যে তাই রূপকথার একটা সহজ সুন্দর আমেজ আছে, শিশুমনকে তা অতিসহজেই আকৃষ্ট করে আর অতিসহজেই অতি নিবিষ্টভাবে তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করে আপন বক্তব্যের গভীরতায়।

পরিবেশ ও প্রকৃতির এই পরম রমণীয় রূপকথার জগতে প্রবেশ ক'রে শিশু যখন সেই বক্তব্যের গভীরতায় গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন কিন্তু সে কোন অলীক গাল-গল্প বা দৈত্যদানবের কাহিনীতে মুগ্ধ হবার সুযোগ পায় না, ভবিষ্যৎ জীবনের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয়, অবশ্যশিক্ষণীয়, অতিবাস্তব সমস্যাবলীরই মুখোমুখি উপস্থিত হয়। তারপর তার থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়টুকু আহরণ করে সে যখন বেরিয়ে আসে, তখন ভবিষ্যতের জন্যে তার বেশ কিছু সঞ্চয় হ'য়ে যায়; অথচ বাস্তবতার প্রাখর্যে তার সামান্যতম আয়াসজনিত ক্লান্তিবোধ হয় না। বিদ্যাসাগর একেই 'বিলক্ষণ কৌতুকের সঙ্গে আনুষঙ্গিক সদুপদেশলাভ' ব'লে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

'কথামালা'-র গল্পগুলিতে পশুপক্ষীর মাধ্যম গৃহীত হ'লেও মানবীয় ভাব-চেতনাই তার বিষয়বস্তু। মহানুভবতা, সাহস, বুদ্ধি, চাতুর্য, হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি মানবীয় হৃদয়বৃত্তিগুলিই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবমনের বিভিন্ন ভাবের যথোচিত ব্যবহারেই জীবনের সার্থকতা আর অতি ব্যবহারে বা অব্যবহারে মানুষের ব্যর্থতার অপ্রতিবিধেয় পরিণতির কথা প্রকাশ ক'রে শিশুমনের অপরিণত ভাবগুলিকে এখানে যথাযথভাবে গ'ড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার কোন অবস্থায়, কেমনভাবে, বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতারও প্রথম পাঠ এই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

প্রথম গল্প 'বাঘ ও বক'-এ দেখি গলায় হাড় ফুটে বাঘ যখন যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তখন পুরস্কারের লোভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বক তার মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে সেই হাড় বের ক'রে দিল। কিন্তু তার প্রাপ্য পুরস্কার চাইতে গেলে বাঘ তার ঘাড় ভাঙ্গতে এলো। হতবুদ্ধি বক পালিয়ে বাঁচলো। গল্পটি বিবৃত ক'রে বিদ্যাসাগর এর থেকে উপদেশ চয়ন ক'রে দিয়েছেন, 'অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়'। এই উপদেশের সঙ্গে শিশু আরও শেখে অতি লোভও অতি অনিষ্টকর, কারণ লোভের বশবর্তী হ'লে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মানুষ পাত্রাপাত্র বিচার করতে পারে না। তখন অসৎ ও দুর্বৃত্তের সঙ্গেও ব্যবহারে তার বাধে না। কিন্তু তার ফল ওই লোভী বকের মতোই বঞ্চনালাভ। তাই অতিলোভ দমন ক'রে লোক বুঝে ব্যবহার করতে হবে। আবার বাঘের দিক থেকেও শিক্ষণীয় বস্তু আছে। দুর্বৃত্ত বা পাপীর হৃদয় পরিবর্তন সহজে ঘটে না। লোভের বশবর্তী হ'য়ে কাজ করলেও বক কিন্তু বাঘের পরম উপকার করেছে, তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বাঘ কিন্তু তার প্রতিদানে সেই প্রাণদাতাকে আক্রমণ করতে গেছে, তাকে হত্যা করার ভয় দেখিয়েছে। 'সর্প ও কৃষক'-এর গল্প থেকেও সেই একই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। হিমাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় সর্পকে দয়া ক'রে কৃষক বাঁচিয়ে তুললেও, কৃষকের শিশু-সন্তানকে সে দংশন করতে গেল। বাঘের মতোই সর্পেরও প্রাণদাতার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাও ছিল না, তার ব্যবহারে চরম কৃতঘ্নতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতা দিয়ে সর্বত্র আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। বকের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীকে বাঘ চোখ রাঙাতে পেরেছিল, কিন্তু কৃষকের হাত থেকে সর্প অব্যাহতি পায়নি, তার কুঠারাঘাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। পূর্বগল্প থেকে প্রাপ্ত উপদেশের সঙ্গে এই গল্প থেকে আর একটি উপদেশ যুক্ত হোল যে, অকৃতজ্ঞতার শোধ একসময় না একসময় দিতেই হয়। অল্পপ্রাণ ক্ষীণজীবী প্রতিপক্ষের কাছে জিতে গেলেও যখন সবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হ'তে হয়, তখন সব কৃতঘ্নতার শোধ সুদেমূলে উশুল ক'রে দিতে হয়।

লোভের বশে বক বাঘের মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে তার কৃতকর্মের সমুচিত প্রতিফল পেয়েছিল। এই লোভের প্রতিফল 'কুকুর ও প্রতিবিম্ব' গল্পে ভিন্নভাবে চিত্রিত হতে দেখি। মাংসলুব্ধ এক কুকুর তার মুখধৃত মাংসের প্রতিবিম্বকে যথার্থ মনে ক'রে কেড়ে নিতে গেছে। তখন নতুন মাংসখণ্ড পাওয়া দূরের কথা, তার মুখের মাংসখণ্ডই জলে পড়ে ভেসে গেছে। এর থেকে শিশুমনে এই উপদেশ লাভ হয় যে, 'যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায়,

ধাবমান হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে'। অতিলোভের বশবর্তী হ'লে কেমন-ভাবে বিফল মনোরথ হ'তে হয় তার আর একটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে 'কুঠার ও জলদেবতা' গল্পটিতে। সরলহৃদয়, নির্লোভ ব্যক্তিটি তার সততার পুরস্কার স্বরূপ আপন হারানো কুঠারখানির সঙ্গে জলদেবতার কাছ থেকে একটি রূপার আর একটি সোনার কুঠারও পেয়েছিল। কিন্তু লোভী ব্যক্তিটি সোনার কুঠারখানিই নিজের বলে দাবী করায় অসন্তুষ্ট দেবতা সেটি জলে ফেলে দিয়ে লোভী লোকটিকে ভর্ৎসনা ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন। 'আমার যেমন কর্ম তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম' এইকথা উপলব্ধি ক'রে লোভী লোকটি ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেল। পশুপক্ষীর মাধ্যমে লোভের পরিণাম চিত্রিত ক'রে মানুষের জীবনেও তার পরিণতি দেখিয়ে লেখক শিশুমনে তার চিরস্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করে দিলেন। 'বিধবা ও কুক্কুটী' গল্পটিতেও অতিলোভের একই পরিণাম চিত্রিত হয়েছে। দরিদ্র এক বিধবার একটি প্রিয় কুক্কুটী নিয়মিতভাবে প্রতিদিন একটি ক'রে ডিম পাড়তো। লোভের বশবর্তী হ'য়ে অধিক ডিম পাবার আশায় বিধবা কুক্কুটীকে অতিরিক্ত খাবার দিতে লাগলো। ফলে দিন দিন স্ফীত হ'য়ে উঠে অবশেষে কুক্কুটীটি একদিন ডিম দেওয়া বন্ধ ক'রে দিল। একাধিক গল্পে এমনিভাবে লোভের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চিত্রিত ক'রে বিদ্যাসাগর শিশুমনে লোভসংবরণের প্রবণতা গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছেন।

অপ্রয়োজনীয় লাভের জন্যে অতিরিক্ত লোভ করা যেমন উচিত নয়, তেমনি নিজের সুবিধার্থে অন্যের অপকারচিন্তাও ক্ষতিকারক। 'কথামালা'র কয়েকটি গল্পে সেই সত্যই উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। 'অশ্ব আর অশ্বারোহী' গল্পে দেখি অবারিত মাঠের শ্যামল তৃণরাজির ওপর অবাধ বিচরণের অধিকার এক হরিণের আবির্ভাবে বিঘ্নিত হ'তে দেখে নির্বোধ এক অশ্ব সেই হরিণকে বিতাড়নের জন্যে ধূর্ত মানুষের সাহায্য চাইল। মুখে লাগাম দিয়ে পিঠে চড়তে দিলে তবেই মানুষ তাকে সাহায্য করতে পারবে শুনে লোভী অশ্ব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে সেই প্রস্তাবেই রাজি হোল। কিন্তু মানুষ তার পিঠে চ'ড়ে হরিণ তাড়ানোর পরিবর্তে নিজের কাজে লাগানোর জন্যে অশ্বকে বাড়িতে নিয়ে গেল। মুক্তগতি স্বাধীন অশ্ব নিজের বুদ্ধির দোষে অন্যের অপকারচিন্তার মাশুল গুণতে মানুষের বাহনে পরিণত হোল। 'পক্ষী ও শাকুনিক' গল্পে দেখি এক শাকুনিকের ফাঁদে আটকে প'ড়ে এক পাখী নিজের প্রাণের বিনিময়ে স্বজাতীয় পাখীদের ভুলিয়ে এনে ফাঁদে ফেলে দেবার প্রস্তাব করেছে। ব্যাধ কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, 'যে আপন মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বজাতীয় ও

আত্মীয়দিগের সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলে, পৃথিবীর মঙ্গল।' 'সিংহ, শৃগাল ও গর্দভ'-এর কাহিনীতেও সেই একই পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সিংহের ভয়ে ভীত শৃগাল নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সঙ্গী গর্দভকে সিংহের কবলে নিক্ষেপ করতে চেয়েছে। তার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে সিংহ গর্দভকে হস্তগত করলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শৃগালেরও প্রাণসংহার করলো। নিজের প্রাণ দিয়ে শৃগাল প্রমাণ করলো, 'পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।' 'কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল' গল্পেও সেই একই অভিজ্ঞতার প্রকাশ। কুক্কুটের প্রাণহননের কুমৎলবে ধূর্ত শৃগাল তাকে গাছ থেকে নামানোর জন্যে তোষামোদ করায় কুক্কুট তাকে গাছের নীচে আসতে অনুরোধ জানালো। নিজের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনন্দে আত্মহারা শৃগাল যেই গাছের নীচে এসেছে অমনি কুক্কুটের বন্ধু কুকুর তাকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করেছে। আগের গল্পের শৃগালটির মতো এই গল্পের শৃগালটিও প্রাণ দিয়ে প্রমাণ ক'রে গেল, 'পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।'

পরের মন্দ চিন্তা নিজের যে কি চরম সর্বনাশ ডেকে আনে অশ্ব, পক্ষী আর শৃগালদের কাহিনীতে তার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার সামান্যতম পরোপকারও যে কেমনভাবে নিজের উপকার হ'য়ে ফিরে আসে, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'সিংহ ও ইঁদুর' আর 'পিপীলিকা ও পারাবত' গল্প দু'টিতে। পর্বতগুহায় নিদ্রিত সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় কুপিত সিংহ ক্ষুদ্র ইঁদুরের প্রাণনাশে উদ্যত হ'লে ইঁদুর কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা করলো এবং সিংহও দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে ছেড়ে দিল। কিছুদিন পরে শিকারীর জালে ধরা প'ড়ে সিংহের প্রাণসংশয় উপস্থিত হ'লে সেই কৃতজ্ঞ ইঁদুর দাঁত দিয়ে জালের দড়ি কেটে তাকে মুক্ত ক'রে দিল। কৃতজ্ঞ পিপীলিকাও তেমনিভাবে পারাবতের প্রাণরক্ষা ক'রে তার ঋণ শোধ করেছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র উপকারপ্রত্যুপকারের মাধ্যমেই মানুষ বাঁচতে পারে না, জীবনধারণের জন্যে তার নিঃস্বার্থ বন্ধুরও প্রয়োজন হয়। সংসারক্ষেত্রে যে কয়টি সম্পর্কের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তাবোধ গ'ড়ে ওঠে, প্রত্যেকটির মধ্যে কমবেশী স্বার্থগন্ধ আছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্কীয় একটি মানুষের প্রতি অন্য একটি মানুষের যে ভালোবাসা, সেখানে কোন স্বার্থ নেই, অহেতুক ভালোবাসাই সেখানে একমাত্র মিলনসেতু রচনা করে। এমন বন্ধুত্ব পৃথিবীতে যেমন বিরল, তেমনি এর যথার্থ পরীক্ষা হয় চরম বিপদের কষ্টিপাথরে। 'দুই পথিক ও ভালুক' গল্পে দেখি ভ্রমণরত দুই বন্ধু হঠাৎ ভালুকের সামনে প'ড়ে

গেলে তাদের মধ্যে একজন বন্ধুর কথা চিন্তামাত্র না ক'রে নিকটবর্তী একটি গাছে উঠে পড়লো অপরজন গাছে চড়তে না জানায় পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে মৃতের মতো নিশ্চল হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো। তাকে মৃত মনে ক'রে ভালুক স্পর্শ না ক'রে চ'লে গেল। তখন বন্ধুটি গাছ থেকে নেমে এসে অপরজনকে, ভালুক তার কানে কানে কি ব'লে গেল জিজ্ঞাসা করায় তীব্র শ্লেষের সঙ্গে অপর বন্ধু উত্তর দিল, 'ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু, বিপদের সময় ফেলিয়া পালায়, আর কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও না।'

সংসারে চলতে গেলে যেমন যথার্থ বান্ধবের সহায়তা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পারস্পরিক একতার। যে একা, সেই ক্ষুদ্র সে দুর্বল। কিন্তু ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েও সকলে একতাবদ্ধ হ'য়ে অগ্রসর হ'লে মিলিত শক্তির প্রভাবে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া যায় অতি সহজেই। 'গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্রগণ' গল্পে দেখি এক বৃদ্ধ তার কলহমত্ত পুত্রগণকে এক আঁটি কঞ্চি ভাঙ্গতে বলায় কেউই তা পারেনি, কিন্তু আঁটি খুলে দিলে তারা অতি সহজেই এক একটি ক'রে কঞ্চি ভেঙ্গে ফেলেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে এমনি করেই বৃদ্ধ তাঁর পুত্রদের একতার গুণ বোঝাতে চেয়েছেন। এই একতার অভাবে যে কি দুর্দৈব ঘটতে পারে তার রূপ চিত্রিত হয়েছে 'সিংহ, ভালুক ও শৃগাল' গল্পে। পরস্পর বিবাদমত্ত সিংহ ও ভালুক যখন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জীব হ'য়ে পডলো, তখন শৃগালের মত দুর্বল প্রাণী তাদের সম্মুখ থেকে অতি সহজেই তাদের বিবাদের কারণ মৃত হরিণ-শিশুটিকে তুলে নিয়ে গেল। একতার গুণ উপলব্ধি ক'রেই 'সিংহ ও মহিষ' গল্পের সিংহ ও মহিষ পরস্পর বিবাদমত্ত হ'য়ে শৃগাল শকুনের আহারবৃদ্ধির কারণ হ'তে রাজী হয়নি, কিন্তু 'সিংহ ও তিন বৃষ' গল্পের বৃষেরা এই সত্য উপলব্ধি ক'রতে পারেনি, পরস্পরবিচ্ছিন্ন হ'য়ে তারা অতি সহজেই সিংহের আহারে পরিণত হয়েছে।

একতার সুফল উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের অপকারিতা সম্বন্ধেও জ্ঞান আহরণ শিশুমানসের পক্ষে কল্যাণকর। অহঙ্কার যে মানুষের সর্ববিধ যোগ্যতা ও প্রয়াসের নিষ্ফল পরিণতি ঘনিয়ে আনে তার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকাতে অহঙ্কারমত্ত খরগস কচ্ছপের কাছেও দৌড়প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছে। শুধুমাত্র 'খরগস ও কচ্ছপ' গল্পেই নয়, 'বৃষ ও মশক'-এর গল্পেও দেখি অহঙ্কারমত্ত মশক নিজের সম্বন্ধে অযথা উচ্চধারণা পোষণ করে ব'লেই বৃষের শিঙে ব'সে তাকে নিজের ভার সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতে চেয়েছে। 'কচ্ছপ

ও ঈগলপক্ষী'-তে কচ্ছপ মশকের মতোই নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চধারণা পোষণ করেছিল ব'লে ঈগলের মতো আকাশে উড়তে গিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে প্রাণ হারিয়ে নিজের মূর্খামির প্রায়শ্চিত্ত করে।

'কথামালা'র কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে সমাজজীবন সম্বন্ধে অতি বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 'সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার,' 'সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার' 'মৃণ্ময় ও কাংস্যময় পাত্র,' 'ব্যাঘ্র ও মেষশাবক' প্রভৃতি গল্পে প্রবলের যুক্তিহীন ও মদমত্ত অবিবেচনা ও অত্যাচার, অন্যায় ও পীড়ন, বিবেকহীনতা ও আত্ম-সর্বস্বতা সম্বন্ধে শিশুমনকে সচেতন ক'রে তুলতে চাওয়া হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে অনেক সময় এই গল্পগুলির উপদেশের সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা উঠতে পারে। কারণ প্রতিটি গল্পেই দুর্জনকে দূরপরিহারের নীতি অনুসারে অন্যায়কারী প্রবল থেকে দূরে স'রে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মনে হ'তে পারে, অত্যাচারী প্রবল ব'লেই তার থেকে দূরে স'রে থাকার উপদেশ শিশুমনে একটা পলায়নী মনোবৃত্তি গ'ড়ে তুলবে। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার ক'রেও লেখকের পক্ষে বলা চলে। বাল্যকাল মানুষের জীবনে ভবিষ্যতের কর্মযজ্ঞের সমিধসংগ্রহের কাল; সেই সময় শিশুচিত্তকে পুরোপুরি সংগ্রাম মুখর ক'রে তুললে তার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। বাল্যকৈশোরের পাঠ্যজীবনে যথার্থ যোগ্যতা অর্জন ক'রে মানুষ যখন যৌবনে জীবনের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করবে, তখনই তার পক্ষে প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবে। তার আগে অপরিণত অবস্থায় এই কাজে এগিয়ে গেলে ভাবাবেগ যতই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক না কেন, প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হয় না। নিজের ছাত্রজীবনেই বিদ্যাসাগর এই সার্থক উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

'কথামালা'র গল্পগুলিতে মানুষ এবং মানবেতর জীবজগতের নানা গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে শিশুচিত্তে সদুপদেশ সঞ্চারণের চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলি শিশুমনের উপযোগী, তাদের পরিবেশ ও ভাবপরিমণ্ডল তাই শিশুমনকে কোথাও ছাড়িয়ে যায়নি। কিন্তু কয়েকটি গল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেমন 'দুঃখী বৃদ্ধ ও যম' গল্পটি। এখানে মানবজীবনের একটি অনাদি অনন্ত আকাঙ্ক্ষার রূপ প্রকাশিত হ'য়ে গল্পটিকে যেন শিশুজগতের বাইরে চিরন্তন মানবচেতনার বিস্তৃত পটভূমিকায় স্থাপন করেছে। জীবনের নানা দুঃখ জ্বালা, অনাচার উৎপীড়ন, অর্ধাহার অনাহার, জয়হীন চেষ্টার সংগীত আর আশাহীন কর্মের উদ্যমের মধ্যেও মানুষ বাঁচতে চায়, জীবনকে উপভোগ করতে চায়। বিশ্বপৃথিবীর

প্রতি দুর্দমনীয় আকর্ষণ তার তাই কোনদিনই হ্রাস পায় না। এক দুঃখী বৃদ্ধ জীবিকানির্বাহের জন্যে বনে বনে কাঠ কাটতো এবং সেই কাঠ বিক্রী ক'রে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো। এক গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদগ্ধ মধ্যাহ্নে রৌদ্রদগ্ধ, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্ন, মৃতপ্রায় শরীরে সেই বৃদ্ধ জীবনের প্রতি চরম বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মৃত্যুরাজ যমের উদ্দেশ্যে জীবন্মুক্তির প্রার্থনা জানালো। অকস্মাৎ বিস্মিত বৃদ্ধের সামনে উপস্থিত হ'য়ে যমরাজ তার প্রার্থনা পূরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। বৃদ্ধ তখন নতুন ক'রে তার প্রার্থনা জানালো, 'যদি আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া, কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়'। মানবজীবনের এই হোল মূল প্রকৃতি। আমরা দুঃখ পাই, কষ্ট করি, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বিরুদ্ধতার কাছ থেকে প্রচণ্ড সংগ্রামের দ্বারা দখল করি। প্রকৃতপক্ষে, সর্ববিধ বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে অবিরাম অবিশ্রাম যুদ্ধের দ্বারাই প্রাণধারণের আর দিনযাপনের ক্ষান্তিহীন গ্লানিকে বাঁচিয়ে রাখি। তবু আমরা বাঁচতে চাই। শেষ হ'তে চাই না হঠাৎ মৃত্যুর হিম শীতলতায়।

কিন্তু এই চাওয়ার প্রচণ্ড আকর্ষণই তো শেষ কথা নয়। যে বিশ্বপৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের জীবনার্তি পলে পলে বেড়ে ওঠে, সেই পৃথিবী কিন্তু আপন প্রয়োজনের বাইরে সামান্যতম ক্ষণটিও আমাদের জন্যে সজীব রাখতে রাজি নয়। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখ তাঁর ৭৭তম জন্মদিবসে পৃথ্বীমাতার উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় এই অভিযোগ তুলেই লিখেছিলেন,

'হে বসুধা,

নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসার রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানাদিকে নানাপথে, আজ তার অর্থ গেল ক'মে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষু-কর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ;
দিতেছ ললাটপরে বর্জনের ছাপ।'[১]

---

১ 'জন্মদিন' সেঁজুতি

মানুষের বাঁচার প্রচণ্ডতম আকুতির এই হোল নির্মম পরিহাস, চরমতম ট্র্যাজেডি। এই বোধ, এই উপলব্ধিরই শিশু সংস্করণ যেন 'কথামালা'র 'শিকারি কুকুর' গল্পটি। যতদিন শক্তি ছিল, সাহস ছিল, সামর্থ্য ছিল ততদিনই শিকারি কুকুরটি ছিল প্রভুর প্রয়োজনীয়, তাই অতি প্রিয়। কিন্তু বার্ধক্যের জড়তায় তার সব ক্ষমতা অবসিতপ্রায় হ'লে প্রভুর কোন অনুকম্পা জাগলো না, তিরস্কার ও তাড়ানাই তার শেষ প্রাপ্য হোল। যতোই সে কাকুতি করুক 'এক্ষণে, বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।' প্রভুর কিন্তু দয়া হবে না, তেমনি মানুষও যতোই বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার দোহাই দিক না কেন, পৃথিবী তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক-ধারায় 'কথামালা'-র সহজ গল্পচ্ছলে মানব-জীবনের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার সরলীকৃত রূপের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নানা উপদেশ ও নীতিজ্ঞান লাভ ক'রে, শিশু 'বোধোদয়'-এর সীমানা পেরিয়ে প্রবেশ করে বোধের রাজ্যে। 'বোধোদয়' বহির্বিশ্বের পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের সর্ববিধ বিষয়ের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়, উপদেশের সীমা ছাড়িয়ে উপলব্ধির জগতে বিস্মিতদৃষ্টি শিশুর প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। গল্পচেতনার নিবৃত্তির পর শিশুমনে দেখা দেয় প্রশ্ন চেতনা। চতুর্দিকবিক্ষিপ্ত বস্তুনিচয় দেখে তার মনে প্রথম যে প্রশ্ন জাগে, তার উত্তর প্রসঙ্গেই 'বোধোদয়ে'র প্রারম্ভিক সূচনা, 'আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ দ্বিবিধ; সজীব ও নির্জীব।' যাদের জীবন আছে, যে সমস্ত বস্তু জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তারা সজীব পদার্থ। আর যাদের জীবন নাই, যারা চলচ্ছক্তিহীন স্থাবর, তারা নির্জীব বা জড়পদার্থ। সজীব পদার্থের মধ্যে যাদের আবার জঙ্গমত্ব আছে তাদের বলে প্রাণী, আর ভূমিলগ্ন স্থাবর সজীব পদার্থকে বলে উদ্ভিদ। শিশুমনের প্রথম বিস্ময় বিজড়িত প্রশ্নের এই অতি সহজ সরল অথচ সর্ববিস্তারী উত্তর কিন্তু সে-যুগের অনেক পরিণত-বুদ্ধি জ্ঞানবৃদ্ধদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। 'বোধোদয়'-এর সমালোচনা ক'রে জীবনীকার বিহারীলাল লিখেছিলেন,—'বোধোদয়ে ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান বস্তু সমুদয় পদার্থ আখ্যা পাইয়াছে। পদার্থ শব্দের এরূপ অর্থগ্রহ বড় সঙ্কীর্ণ। সংস্কৃত দর্শনে যাহা কিছু শব্দবাচ্য, তাহাই পদার্থ। জাতি, গুণ, অধিক কি অভাবও পদার্থ।'[১]

১ বিদ্যাসাগর ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৯

কিন্তু বোধোদয় সমালোচনার এই হাস্যকর যুক্তি শিশুসুলভ নয়, গভীর বিদ্বেষপ্রসূত। 'ভারতীয় দর্শনে অতিশয় অভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর পদার্থের দার্শনিক অর্থ যথেষ্ট অবগত ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানের চেয়ে আর একটি জ্ঞান তাঁর আরও বেশি অধিগত হয়েছিল—তার নাম কাণ্ডজ্ঞান।'[১] এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবেই বিদ্যাসাগরবিরোধিরা এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, নবসাক্ষর শিশুচিত্তে দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশ করানো স্থচের ছিদ্র দিয়ে উট গলানোর চেয়েও দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজ কাণ্ডজ্ঞানের বশেই বিদ্যাসাগর সেই দুঃসাধ্য কাজে অগ্রসর হননি।

'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কোন রচনা ছিল না। বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এ ব্যাপারে তাঁকে অনুযোগ করে বলেছিলেন

'মহাশয়, অনেকে আমার নিকট বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?' বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।'[২] এর থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধেই বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়'-এ ঈশ্বর প্রসঙ্গ সংযোজিত করেছিলেন। কিন্তু সে অনুমান যে যথার্থ নয়, বিদ্যাসাগরের উত্তর ও 'বোধোদয়ে'র বক্তব্য বিচার করলে সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে, 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর প্রসঙ্গ সংযোজনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর আগেই মনস্থির করেছিলেন। তা না হ'লে বিজয়কৃষ্ণের অনুযোগের উত্তরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনোভাব জানাতে পারতেন না। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি কোন পূর্বচিন্তা ছাড়াই, কেবলমাত্র একজন প্রিয়পাত্রের অনুরোধেই যে সংযোজন করবেন, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'বোধোদয়'-এ ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সংযোজনের অনিবার্যতা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই গ্রন্থে শিশুর জ্ঞানপিপাসা জাগিয়ে তোলার জন্যে তার অন্তরে তিনি যে প্রশ্নচেতনার উজ্জীবনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই প্রশ্নচেতনার অনিবার্যতায় ঈশ্বর প্রসঙ্গের অবতারণা ছিল

অবধারিত। প্রথম সংস্করণে এর অভাব তাই গ্রন্থটিকে ত্রুটিহীন হ'য়ে উঠতে বাধা দিয়েছিল। সূক্ষ্মদর্শী বিদ্যাসাগরের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই পরবর্তী সংস্করণে সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্যে তিনি নিজেই মনঃস্থির করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনে সেই সিদ্ধান্তই প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচরের প্রাথমিক পরিচয় লাভ করার পর অতি স্বাভাবিকভাবেই শিশুচিত্তে সেই পার্থিব পদার্থসমূহের উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব ঈশ্বরচেতনার সাহায্যে অতি নিপুণভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,

'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।'

পরবর্তীকালের সংস্করণে এই পাঠ সংশোধিত হ'য়ে দাঁড়ায়,

'ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে করি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।'

এরচেয়ে সহজভাষায় বা সহজসংজ্ঞায় শিশুমনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা সৃষ্টি করা আজও সম্ভব ব'লে মনে হয় না। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী সকল পদার্থই ঈশ্বরের সৃষ্টি, মানুষের দৃষ্টিসীমায় কোন বিশিষ্ট অবয়ব ধারণ ক'রে বিরাজিত না থাকলেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান। মানুষের সর্বচিন্তাকর্মের তিনিই নিয়ন্তা। পরম দয়ালু ঈশ্বরই সর্বজীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতই ঈশ্বর সম্বন্ধে এই চেতনাকে আশ্রয় ক'রেই সার্থকতা অর্জন করেছে। ঈশ্বরবিশ্বাসী সর্বশ্রেণীর মানুষ তাদের ধর্মচিন্তায় যে ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টির আদি উৎস আবিষ্কার করেছে, তাঁর সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এরচেয়ে সহজবোধ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা সে-যুগের কিছু কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির দ্বারা উপহসিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের কোন বিশেষ দেবতার প্রচলিত মূর্তিকল্পনার সঙ্গে এই সংজ্ঞার মিল না থাকাতেই হয়তো তাঁরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। বিহারীলালের মন্তব্যে সেই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে।

'বোধোদয় হিন্দুসন্তানের সম্যক পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেকস্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। 'পদার্থ তিন প্রকার,—চেতন, অচেতন

ও উদ্ভিদ'; আর 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' ইহা বালক ত বালক, কয়জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি?'[১]

বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাসাধনায় ফোঁটাকাটা বিদ্যাবাগীশের বংশধর হিন্দুসন্তান সৃষ্টি করতে চাননি, তিনি ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমানা ছাড়িয়ে একটি বিশ্বব্যাপী মানবচেতনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে, অতি স্বাভাবিকভাবেই, তথাকথিত হিন্দুত্বের অবাস্তব খোলসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে যারা পরম নিশ্চিন্তে বিলয়ের দিকে এগিয়ে চলেছিল, তাদের নেশা ছুটে গিয়েছিল, চিৎকার ক'রে তারা বিদ্যাসাগরকে গালি দিতে সুরু করেছিল। এখানেই শেষ নয়, এই ঈশ্বরসংজ্ঞায় মৌলিকত্বের সম্বন্ধেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছিল, এই সংজ্ঞা নাকি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনা নয়, তিনি নাকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচনা থেকে সংজ্ঞাটি ধার করেছিলেন!

যাইহোক, আধুনিক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণপ্রবণ বৈজ্ঞানিক মননের সাহায্যে সর্বশেষে এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হওয়া যায়, যেখানে যুক্তির সীমা-রেখা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, মানুষকে তখন এক পরম দুর্জ্ঞেয় অচিন্তনীয় সত্তার উপস্থিত স্বীকারে বাধ্য হ'তে হয়। বিদ্যাসাগর এই সত্তাকেই 'ঈশ্বর' ব'লে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সত্তারই শিশুবোধ্য সহজতম পরিচয় লিপিবদ্ধ করে-ছিলেন 'বোধোদয়' গ্রন্থে। মানুষ, গাছ বা নদী পর্বতের মতো চাক্ষুষ বিষয়ের পরিচয়দান অপেক্ষা এই অনাদি অব্যক্ত অদৃশ্য সত্তার পরিচয় প্রদান বিষয়বস্তুর নির্বিকল্পত্বের জন্যেই স্বাভাবিকভাবেই কঠিন হ'তে বাধ্য। হিন্দুধর্মের প্রচলিত মূর্তিপূজার সঙ্গে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত ঈশ্বর-সংজ্ঞার কোন যোগ না থাকাতেই হয়তো বা জীবনীকার বিহারীলাল ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমালোচনা আজ তাঁকেই ব্যঙ্গ করছে! বিদ্যাসাগরের সংজ্ঞা থেকে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি করতে না চেয়ে বিহারীলাল তাঁর নিজস্ব ধর্মমতেরই সাধক মহাপুরুষদের সাধনার মাহাত্ম্যকে ছোট করে ফেলেছেন। বেদে যাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যার গভীর আকুতি, উপনিষদে যাঁকে উপলব্ধির সহস্রবিধ প্রয়াসের প্রকাশ, যুগে যুগে সাধক-ধ্যানীদের সাধনার আকুতি যাঁর স্বরূপ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে আবর্তিত হ'য়ে চলেছে, বিহারীলাল কথিত বিজ্ঞতম বৃদ্ধের দল যে তাঁকে বিদ্যাসাগরের সংজ্ঞায় খুঁজে পাবেন না, তাতে কোন বিস্ময় নেই।

সর্ববিধ পদার্থ ও তাদের উৎসের উল্লেখ ক'রে 'বোধোদয়'-এ বিদ্যাসাগর বিভিন্ন পদার্থের বিস্তারিত পরিচয় দান করেছেন। 'চেতন পদার্থ', 'মানবজাতি,'

১ বিদ্যাসাগর, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৮

'উদ্ভিদ', ও 'ইতরজন্তু' প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমরা তারই পরিচয় পাই। এ ব্যাপারে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থের মধ্যে পরপর সন্নিবিষ্ট করেননি। একই বিষয়ের দীর্ঘ-বিস্তারিত আলোচনা শিশু-মনে কৌতূহল জাগ্রত না ক'রে ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠবে ব'লে ভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধগুলিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারফলে, প্রবন্ধগুলি পাঠের সময় শিশুমনের উৎসাহ স্তিমিত হ'য়ে পড়ে না, অথচ সমগ্র গ্রন্থটি পাঠের পর বিষয়টি সম্বন্ধে তার মনে একটি সামগ্রিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে।

জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন পদার্থগুলিকে, বিদ্যাসাগর 'সজীব পদার্থ' বলে চিহ্নিত করেছেন; সজীব পদার্থের মধ্যে আবার যাদের চলচ্ছক্তি আছে তাদের 'প্রাণী' নামে অভিহিত করেছেন; আবার যে বস্তু বা অবস্থার উপস্থিতি অন্যান্য সজীব পদার্থ থেকে প্রাণীদের পৃথকরূপে চিহ্নিত করে, তাকে তিনি 'চেতনা' বলেছেন। তাই চেতনার অভাবেই অন্যান্য জড়বস্তু প্রাণীদের থেকে পৃথক হ'য়ে পড়ে। এমনকি, প্রাণীদের মতো অবয়ব-বিশিষ্ট হ'লেও চেতনার অভাবেই পুতুলের মতো বস্তু জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই 'চেতনা'র উপস্থিতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের প্রভূত অভিজ্ঞতা থাকলেও চেতনার উৎস বা আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান এখনও কোন নির্দেশ দান করতে পারেনি। এই অজ্ঞেয়তাকে বিদ্যাসাগর 'দুনিয়ার মালিক' ঈশ্বরের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, 'ঈশ্বর কেবল প্রাণী-দিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই।'

'চেতন পদার্থ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর চেতনাসম্পন্ন পদার্থের সাধারণ নাম দিয়েছেন 'জন্তু'। বিহারীলাল সেই সংজ্ঞার সমালোচনা করে লিখেছেন,

'জন্তু শব্দের প্রয়োগ স্থল বড় বিস্তীর্ণ হইয়াছে। বোধোদয়ের মতে পক্ষী, মৎস, কীট, পতঙ্গ সকলই জন্তু। আমরা এখন জন্তু শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করি না। জীব বা প্রাণী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। বোধোদয়ে আছে জন্তুগণ মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। জন্তু অর্থে যদি প্রাণী হয়, তবে একথা ঠিক নহে। কারণ এক এক প্রাণীর মুখ নাই; অথচ সে সজীব।'[১]

কিন্তু এ্যামিবা, হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীদের সম্বন্ধে নব-শিক্ষার্থী পাঠার্থীদের মনে ধারণা জন্মানোর চেষ্টা যে বাতুলতা, একথা বিদ্যাসাগর খুব ভালোভাবেই

১ বিদ্যাসাগর, ৪র্থ সংস্করণ; পৃ· ২৭৯

জানতেন, তাই সে প্রয়াস না ক'রে 'বোধোদয়'-এ তিনি সাধারণভাবে জন্তু-জগতের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

জন্তুদের মধ্যে মানবজাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'মানবজাতি' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির গুণে মানুষ জীবজগতের ওপর আপন আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। তবে এই আধিপত্যের মূল কারণ তার যে বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি তা কেবলমাত্র সহজাত নয়, সহজাত বুদ্ধি-বিবেচনার অঙ্কুর শিক্ষার দ্বারা ললিত হ'য়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাল্যকালই সেই শিক্ষারম্ভের প্রকৃষ্ট সময়। তাই নবপাঠার্থী বালকদের উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগরের উপদেশ—'যাহারা বাল্যকালে যত্নপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর যাহারা বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।'

মানুষ ভিন্ন অপর সকল জন্তু হোল ইতর জন্তু। ইতর জন্তুর মধ্যে রোমাবৃত-দেহ চতুষ্পদ বিশিষ্টদের বলা হয় চতুষ্পদ। 'ইতর জন্তু' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী চতুষ্পদ প্রাণীদের তৃণজীবী ও শ্বাপদ বা হিংস্র—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তৃণজীবী গৃহপালিত পশুর উপকারিতার কথা আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত প্রতিটি প্রাণীর আহার প্রসঙ্গে আর একবার ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা স্মরণ করেছেন,—'কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।'

প্রাণীজগতের সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভের পর শিশুচিত্তে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, একজন সৃষ্টিকর্তাই যদি প্রাণীজগতের সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তবে বিভিন্ন প্রাণীর এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন কি? 'চেতন পদার্থ' প্রবন্ধের শেষে বিদ্যাসাগর সেই প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গেও ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন,—'ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।'

'উদ্ভিদ' প্রবন্ধে স্থাবর সজীব পদার্থ ও বৃক্ষলতার পরিচয় দিয়ে 'ইন্দ্রিয়' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—প্রাণীশরীরের এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিশদ বিবরণ দান করেছেন। ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা

দিয়ে শিশুমনের উপযোগী সহজভাবে ও সরল ভাষায় তাদের প্রত্যেকের কার্যকারিতার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন,

চক্ষু :—'অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাত্‌লা পর্দা থাকে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া ঐ তারা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাত্‌লা পর্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয় তাহাতেই আমাদের দর্শন জ্ঞান জন্মে।'

কর্ণ :—'শব্দসকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে পটহের মত যে অতি পাত্‌লা একখণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।'

নাসিকা :—'নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়।'

জিহ্বা :—'জিহ্বাতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। মুখের ভিতর কোন বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা তাহার স্বাদ হয়।'

ত্বক :—'ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু সকল অঙ্গ অপেক্ষা হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন।'

জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা বা দুর্বলতা ঘটে থাকে। যেমন বিড়ালের শ্রবণশক্তি ও অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর, কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অসম্ভাব্যতার সীমা ছুঁয়ে গেছে। প্রাণী-বিশেষে ইন্দ্রিয় বিশেষের প্রাবল্যের কারণ নির্দেশে বিদ্যাসাগর আবার ঈশ্বরের শরণ নিয়েছেন,—'এইরূপ যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যে রূপ আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন, তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।'

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পশুপক্ষীর নানাভাবে কমবেশী প্রয়োজন পড়ে। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী মানুষ কোন পশুকে পূজ্য ও পবিত্র ব'লে গ্রহণ করেছে, আবার কোন পশুকে ঘৃণ্য বা তুচ্ছ ব'লে ঘোষণা করেছে। কিন্তু মানবেতর জীবজগতের প্রতি চিন্তায় ও আচরণে এই অসাম্যের সমালোচনা ক'রে সর্বজীবের প্রতি সমদৃষ্টির আবেদন জানিয়ে বিদ্যাসাগর আবার ঈশ্বরের দোহাই দিয়েছেন,—'ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে কোন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য কতকগুলিকে পূজ্য

ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলোকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল বস্তুই সমান। অতএব আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।'

জীবজগতের পরিচয় দান ক'রে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি সরলভাবে আলোচনা করেছেন। যে কয়টি গুণে মানুষ মানবেতর প্রাণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি তাদের মধ্যে প্রধান। অন্যান্য প্রাণীর উপলব্ধির ক্ষমতা থাকলেও চিন্তাকে তারা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে না। এই দুর্লভ শক্তির অধিকারী মানুষ অতি শৈশবকাল থেকেই কথা বলতে শেখে। ঈশ্বরের এই দুর্লভ দান যাতে অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না হয় তার জন্যে বিদ্যাসাগর প্রথমাবধি বালকমনে একটি সতর্কতা জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন,—'আর যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করেন না; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনবান, কি দরিদ্র কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলেই প্রিয় ও মিষ্টবাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।' কেবলমাত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা সংগ্রহ ক'রে শিশুদের পণ্ডিত ক'রে তোলাই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের চরিত্রগঠনের দিকেও যে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল, বর্ণপরিচয় থেকেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তারই প্রকাশ ঘটেছে।

এরপর 'ক্রয়বিক্রয়মুদ্রা' 'কৃষিকর্ম' 'শিল্পবাণিজ্য সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে মানবসভ্যতার কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তরের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ধাতুপ্রস্তরের বিবরণ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে শেষ না ক'রে, সেগুলি যাতে শিশুমনে লোভ না জাগাতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। হীরকের আলোচনা-কালে তিনি তাই লিখেছেন,—"বিবেচনা করিয়া দেখিলে হীরা অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোন গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের একখণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত অত অর্থব্যয় করা কেবল অহঙ্কার প্রদর্শন ও মূঢ়তা মাত্র।"

এই মূঢ়তার বন্ধনজাল ছিন্ন করার জন্যেই 'বোধোদয়'-এর সূচনা। কারণ বোধের উদয়ে, জ্ঞানের আবির্ভাবেই মানুষ অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন ক'রে উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করে। 'বোধোদয়' তাই নবপাঠার্থী বালক মনকে

সঠিকপথের দিক নির্দেশ ক'রে সেই জগতের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা জাগিয়ে দেয়।

৩

'বোধোদয়'-এ বিশ্বপৃথিবী ও মানবজীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণের পর প্রাত্যহিক জীবনাচরণ সম্বন্ধে নীতিজ্ঞান দানের জন্যেই 'আখ্যানমঞ্জরী'-র আবির্ভাব ঘটেছিল। 'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম প্রকাশকালে ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক নীতিজ্ঞান প্রচারও তাঁর উদ্দেশ্য ব'লে বিদ্যাসাগর স্পষ্টভাবেই প্রচার করেছিলেন। জ্ঞান মানবজীবনের একটি অবশ্য আহরণীয় বস্তু, জ্ঞানহীন মানুষ পশু অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নয়। কিন্তু এই জ্ঞান যদি প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, দৈনন্দিন কর্মতৎপরতায় কোন সহায়তায় না আসে, তবে বাস্তবভিত্তিহীন তাসের প্রাসাদের মতো তা মানবজীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। 'কথামালা'-র 'জ্যোতির্বেত্তা' গল্পটিতে আমরা তার একটি সুন্দর উদাহরণ পাই। আকাশে নক্ষত্র নিরীক্ষণ করতে করতে পথ চলার সময় এক জ্যোতির্বেত্তা পথিপার্শ্বস্থ এক কূপে প'ড়ে যান। তাঁর চিৎকারে ছুটে এসে একজন লোক তাঁকে উদ্ধার করে এবং তাঁর সমস্ত ব্যাপার শুনে মন্তব্য করে,—'কি আশ্চর্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে। তাহা জানিতে পার না; কিন্তু আকাশের কোথায় কি আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে।' বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য শিক্ষা মানুষকে এমনি বাস্তববুদ্ধিহীন আকাশবিহারী ক'রে তোলে। ফলে তার কাছে অনন্ত আকাশ আপন রহস্য উন্মুক্ত ক'রে দিলেও জীবনপথের নানা বাধাবিপত্তি এসে তার জীবন সংশয় ঘনিয়ে তোলে। তাই, শিক্ষা যাতে এমনিভাবে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হ'য়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে শিক্ষা-সংস্কার ও পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে বিদ্যাসাগরের যে প্রখর ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল, 'আখ্যানমঞ্জরী'র কাহিনীগুলির মধ্যে আমরা তার যথেষ্ট পরিচয় পাই।

পারিবারিক সম্বন্ধবন্ধন, পরিবারজীবনের কর্তব্য ও চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 'আখ্যানমঞ্জরী'র কাহিনীগুলি পাশ্চাত্যজীবনকথা থেকে আহৃত হয়েছে। কাহিনীগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরমানসের একটি বিশেষ প্রবণতাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কঠোর যুক্তিবাদী ও তর্কপ্রবণ বিদ্যাসাগর এখানে যুক্তি ও তর্কের মধ্যে আপন চিন্তাধারাকে আবদ্ধ ক'রে

রাখেননি, তাঁর কর্মপ্রেরণার মূল উৎস ছিল যে অতলান্ত মানবপ্রেম, প্রবল আবেগে যুক্তিতর্কের বাঁধ ভেঙ্গে তাই এখানে শতধারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। এই আবেগোদ্বেল মানবপ্রেমকে তিনি কোথাও অস্বীকারের চেষ্টা করেননি, বরং পারিবারিক সম্বন্ধবন্ধনকে দৃঢ়তর ক'রে তুলতে তিনি তাকে কাজেই লাগিয়েছেন। 'আখ্যানমঞ্জরী'র একাধিক কাহিনীর মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীগুলির মধ্যে দেখি কোন যুক্তি বা কারণের দ্বারা চালিত হ'য়ে নয়, কেবলমাত্র সন্তান ব'লেই মা-বাবার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে, কেবলমাত্র ভাই ব'লেই ভাই-এর জন্যে প্রাণবিসর্জনের আবেগ জেগেছে, কেবলমাত্র গুরু বলেই শিষ্যের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে।

কতকগুলি গল্পের মধ্যে আবার মানুষের সহজাত দুষ্প্রবৃত্তি দমন ক'রে যথার্থ চরিত্রগঠনের উপযোগী কাহিনী আহরণ করা হয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বলেই সূত্রধার বালক একদিন প্রাণদাতাকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করে, 'প্রত্যুপকার' গল্পের এই কাহিনীটি আমাদের 'কথামালা'-র 'সিংহ ও ইঁদুর' এবং 'পারাবত ও পিপীলিকা'-র কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কথামালা'-র শিশুচিত্তের উপযোগী ক'রে পশুজগতের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর যে উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন, অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রাপ্ত বালকদের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে ইংলণ্ডের রেডিঙ্ নগরে সংঘটিত এই কাহিনীটির মধ্যে তিনি সেই উপদেশই দিয়েছেন, ফলে রূপকথার সত্য বাস্তবজীবনের ঘটনায় বালকচিত্তে আরও গভীরভাবে মুদ্রিত হবার সুযোগ পেয়েছে। 'লোভসংবরণ' গল্পটিতে মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি অপহরণ প্রবণতার বিরুদ্ধে শিশুচিত্তে বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ থেকেই বিদ্যাসাগর এব্যাপারে সচেতনভাবে সতর্কতার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি চৌর্যাপরাধের যে সমস্ত কুফল নির্দেশ করেছিলেন, এখানে তার সঙ্গে নতুন ক'রে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বরভীতির কথা। আপন অন্তরে লোভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এই গল্পের বালকটি চিন্তা করেছে,— 'যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তিনি সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।' একের পর এক পাঠ্য-গ্রন্থে যিনি বালকমনে এমনিভাবে ঈশ্বরভীতি জাগিয়ে তুলতে চাইতেন, তিনি অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলেন ব'লে প্রচার করা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক।

'ধর্মভীরুতা', 'ধর্মপ্রবণতা', 'নিঃস্পৃহতা', প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে পরের ধনের প্রতি লোভের পরিবর্তে ধর্মপথ অবলম্বনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর এবং ধর্মচিন্তা যে বালকচিত্তে সর্ববিধ দুষ্প্রবৃত্তি ও রিপুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে সক্ষম, বিদ্যাসাগর একথা কোথাও অস্বীকার করতে চাননি।

'প্রথম ভাগের' মতো 'দ্বিতীয় ভাগে'র গল্পগুলিতেও পারিবারিক সম্বন্ধ বন্ধন, পারিবারিক কর্তব্যবোধ ও চারিত্রনীতির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। তবে কেবলমাত্র আবেগোদ্বেল প্রেমনীতি আর ঈশ্বরভীতি ও ধর্মচেতনাই মানুষের সর্বকর্মের নিয়ন্ত্রণীশক্তি হিসেবে এখানে প্রাধান্য লাভ করেনি। পরলোক অপেক্ষা বাস্তব ইহলোকই ছিল বিদ্যাসাগরের প্রধান আকর্ষণের বিষয়, তাই তিনি বালকচিত্তকে কেবলমাত্র পারলৌকিক সদ্গতির প্রতি আকৃষ্ট না ক'রে ইহলোক তার পাওনা সম্বন্ধেও সচেতন ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। যথার্থ চারিত্রগুণই মানুষকে বাস্তবজীবনের এই পাওনা আদায়ে সাহায্য করে ব'লে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। 'মাতৃভক্তির পুরস্কার' গল্পে দেখি এক মাতৃভক্ত বালকভৃত্য তার প্রভু প্রাশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক কর্তৃক যথোপযুক্ত পুরস্কৃত হয়েছে। নিদ্রিত বালকের কোলে টাকার থলি রেখে সম্রাট ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে জাগ্রত করলে ভীত বালক টাকার থলি না লুকিয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ভাবে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হ'লে সন্তুষ্ট সম্রাট বলেন,—'দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও।' 'উপকার স্মরণ' গল্পে ক্ষুধার্ত এক আদিবাসী আমেরিকায় ইংরেজদের এক পান্থশালায় খাদ্য প্রার্থনা ক'রে নিরাশ হ'লে সদাশয় একব্যক্তি তাকে খাদ্যদানে তৃপ্ত করেছিল। শিকার করতে গিয়ে সেই ব্যক্তি অরণ্যে শত্রুভাবাপন্ন আদিবাসীদের হাতে বন্দী হ'লে সেই কৃতজ্ঞ আদিবাসী তার বন্ধন-মোচন ক'রে পূর্ব উপকারের প্রতিদান দিয়েছিল। 'প্রত্যুপকার' গল্পে খলীফার প্রিয়পাত্র আলি ইব্‌ন্ আব্বাস দামাস্কাসে রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপন্ন হ'লে সদাশয় এক ব্যক্তি তার প্রাণরক্ষা ক'রে বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের আয়োজন ক'রে দেন। খলীফার কোপে প'ড়ে সেই সদাশয় ব্যক্তির প্রাণসংশয় হ'লে কৃতজ্ঞ আলি ইব্‌ন্ আব্বাস খলীফাকে সন্তুষ্ট ক'রে তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির কোপানলে প'ড়ে কার্ডিনাল উল্‌সি যখন নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়লেন, তখন রাজভয়ে কেউই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলো না। কেবল

ফিট্‌জ্‌ উইলিয়াম নামে একজন সম্ভ্রান্ত সামন্তের আচরণেই তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। উল্‌সির অনুগ্রহ ও সহায়তাতেই ফিট্‌জ্‌উইলিয়ামের উন্নতি ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তি, তাই চরম দুরবস্থায় পতিত উপকারীর পূর্ব উপকার স্মরণ ক'রে তিনি উল্‌সিকে আশ্রয়-প্রদান ক'রে পরিচর্যা করতে লাগলেন। উল্‌সির প্রতি বিমুখ রাজাও ফিট্‌জ্‌উইলিয়ামের এই কৃতজ্ঞতাবোধের অবমাননা করতে পারলেন না, নাইট উপাধিতে ভূষিত ক'রে তাঁকে রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

নিজের কৃতজ্ঞতাবোধের জন্যে যেমন পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তেমনি অন্যের সদ্‌গুণের জন্যে পুরস্কারদানে ফিট্‌জ্‌উইলিয়াম নিজেও ছিলেন মুক্তহস্ত। শিকার করতে যাবার সময় তাঁর সঙ্গীদের পায়ের চাপে এক কৃষকের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হ'লে তিনি কৃষককে পাঁচশত টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় সে বছর সেই ক্ষেতের ফসল বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় কৃষক ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরৎ দিতে এলে সৎ ও উন্নতচিত্ত সেই কৃষকের ন্যায়পরতায় মুগ্ধ ফিট্‌জ্‌উইলিয়াম তাকে আরও হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। 'কৃতজ্ঞতার পুরস্কার' আর 'ন্যায়পরতার পুরস্কার' গল্পদু'টিতে বিদ্যাসাগর ফিট্‌জ্‌উইলিয়ামের জীবনের এই দু'টি ঘটনা বালকদের উপযোগী ক'রে বর্ণনা করেছেন।

এই ধরণের উপদেশাত্মক গল্প ছাড়াও 'আখ্যানমঞ্জরী'র দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানুষের জীবন থেকে এমন সব কাহিনী আহরণ করেছেন, যেগুলি প্রত্যক্ষ উপদেশদানের পরিবর্তে গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে শিশুচিত্তে পরোক্ষভাবে দয়া, ভালোবাসা, ন্যায়পরতা, কৃতজ্ঞতা, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি মানবীয় গুণের উৎকর্ষতা প্রমাণ ক'রে তাদের প্রভাব চিরমুদ্রিত ক'রে দেয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের ডঃ অলিভার গোল্ডস্মিথ, ফরাসী পণ্ডিত মঁতেস্ক, ম্যাসিডনরাজ ফিলিপ ও তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার, ইংরেজ কবি শেন্‌ষ্টোন্‌, পর্তুগালরাজ এলেন্‌জো, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির জীবনকথা থেকে তিনি এই ধরণের যে কাহিনীগুলি আহরণ করেছেন, সুন্দর, সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় সেগুলি শিশুমনের কাছে যতোই আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে, আনুসঙ্গিক নীতিজ্ঞানপ্রচারও ততোই সহজসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। ফলে, সহজবোধ্য গদ্যভাষা রচনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরিত্র গঠন প্রয়াসও সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।

'আখ্যানমঞ্জরী'র দ্বিতীয় ভাগে 'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস' নামক একটি গল্পে পরম আস্তিক এক অনাথ বালকের বিশ্বাসের জোরে সংসার সমুদ্র উত্তরণের

আশ্চর্যজনক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নিরাশ্রয় সেই অনাথ বালকটির গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় না থাকলেও বুদ্ধি ও বিবেচনার অভাব ছিল না, 'এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ-বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি,'—এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে ছেলেটি যথাসাধ্য পরিশ্রমের দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চাকরির খোঁজে বের হলো। বালকের এই বিশ্বাসের মধ্যে আমরা যেন কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের ভাগবতচেতনাকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠতে দেখি। গৃহকোণে বসে ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাননি। পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে তিনি যে ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছিলেন, পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের কর্মধারার যথার্থ রূপায়ণের মধ্যেই সেই ঈশ্বরের যথার্থ উপাসনা ব'লে তিনি মনে করতেন। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সেই সৃষ্টিরই একটি অংশ। প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাই বিশ্বজীবনের কর্মধারায় মানুষের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। মানুষকে ঈশ্বর সেই কর্মধারার উপযুক্ত ক'রেই সৃষ্টি করেছেন, তাই মানুষের পক্ষে সেই কর্মধারার রূপায়ণই, ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অরূপ অনির্দেশ্য ঈশ্বর সেই কর্মরূপেই মানব-পৃথিবীতে প্রকাশমান। তাই কর্মই ঈশ্বর। বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরারাধনা তাই কর্মসাধনার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল। কর্মযোগী মহাপুরুষ নিজের সমগ্র জীবনের কর্মধারাতেই এই ঈশ্বরসাধনার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি প্রকাশ্যে কারো কাছে আপনার ধর্মবোধের কথা প্রকাশ করেননি, কিন্তু নিজের কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রতি পদক্ষেপে তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আপাত-অন্ধ মানুষ সে-যুগে তাঁর কর্মসাধনাকে বুঝতে পারেনি, তাই তাঁর ঈশ্বরচেতনাকেও উপলব্ধি করতে পারেনি, বারবার তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। তিনি কোন উত্তর দেননি, সূর্যালোকের মতো প্রদীপ্ত তাঁর ঈশ্বরচেতনা যারা দেখেও বুঝতে পারেনি, তাদের তিনি নতুন ক'রে কিছু বলতে চাননি, তাই বড়োদের জন্যে লেখা কোন গ্রন্থে এর সামান্যতম সূত্রও রেখে যাননি। কিন্তু শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আপন হৃদয়ের এই গোপন কক্ষের দ্বার তিনি অর্গলমুক্ত করে দিয়েছেন, নিজের উপলব্ধ ঈশ্বরচেতনা আর নিজের অভিলষিত ঈশ্বরারাধনার পথকে সরলভাবে সহজভাষায় শিশু উপলব্ধির উপযুক্ত ক'রে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। অন্যান্য নানাবিধ রচনায় ঈশ্বর প্রসঙ্গের স্বল্পতা থাকলেও, তাই তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থের

সর্বত্রই এর সুপ্রচুর প্রকাশ ঘটেছে। তাই সেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি থেকে অতি সহজেই তাঁর ঈশ্বরচেতনা বা ধর্মচেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা যায়।

'আখ্যানমঞ্জরী'র তৃতীয় ভাগের কাহিনীগুলির মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব এসেছে। অন্য দুই ভাগের মতো ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক নীতি-জ্ঞানবিষয় তৃতীয় ভাগেও প্রাধান্য লাভ করেছে বটে, কিন্তু নীতিজ্ঞান তার গুরুসম্মিত পন্থা পরিত্যাগ ক'রে মিত্রসম্মিত পথ অনুসরণ করেছে। উপদেশ-বাণীর মধ্যেও তাই সাহিত্যিকগুণের প্রাধান্য ঘটেছে। তাই লেখককথিত নীতিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য সুসাধিত হ'লেও পাঠকের বাড়তি লাভ ঘটেছে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে। 'যথার্থ বদান্যতা', 'অদ্ভুত আতিথেয়তা', 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে অবশ্য দ্বিতীয় ভাগের অনুসরণে প্রত্যক্ষ উপদেশের পরিবর্তে গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে পরোক্ষ বক্তব্যবিষয় তুলে ধরা হয়েছে, কেবলমাত্র শিরোনাম ব্যতীত কোথাও উপদেশবাণীর প্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু আরো কয়েকটি গল্পে এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও একটি নতুন রসের আগমন ঘটেছে, সেখানে উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে কয়েকটি সার্থক সাহিত্যিক রচনার আবির্ভাব হয়েছে। 'দস্যু ও দিগ্বিজয়ী', 'স্বপ্ন-সঞ্চরণ', 'অকুতোভয়তা' প্রভৃতি গল্প-গুলিতে নীতিজ্ঞানপ্রচার প্রয়াস অপেক্ষা সার্থক ছোটগল্পের লক্ষণই যেন বেশি ক'রে আভাসিত হ'য়ে উঠেছে। বাস্তবিকই "আখ্যানগুলি বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয় ব'লে তাঁকে বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টার গৌরব দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর নির্বাচন শক্তির প্রশংসা করতে হয়।"[১]

'দস্যু ও দিগ্বিজয়ী' গল্পটির মধ্যে আলেকজাণ্ডার ও থ্রেসদেশীয় দস্যুর কথোপকথনে একটি সুন্দর নাট্যরসের আবির্ভাব ঘটেছে এবং দুইজনের কথোপ-কথনের তীব্র নাটকীয় উত্থানপতনের শেষে গল্পটি যখন সমাপ্ত হয়েছে, তখন দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর সব ভেদাভেদ লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে দুই নরঘাতক, শোনিত-পিপাসু, সভ্যতার শত্রু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দিগ্বিজয়ের আপাত প্রশংসাকে ব্যঙ্গ ক'রে যেন উচ্চনিনাদে ঘোষণা ক'রে দেয় দিগ্বিজয়ীর যথার্থ স্থান দস্যুরই পাশে। 'উৎকট বৈরসাধনে' মানুষের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্যের বীভৎসতা শিশুচিত্তকে যেমন প্রতিহিংসা বিমুখ ক'রে তুলতে সাহায্য করে,

তেমনি 'স্বপ্নসঞ্চরণ' গল্পটির কৌতুকরস আর 'অকুতোভয়তা' গল্পটির কৌতুকপূর্ণ ভৌতিকরস শিশুচিত্তকে সাহিত্যিক রসগ্রহণের উপযোগী ক'রে তোলে।

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সুন্দর মন্তব্য ক'রে লিখেছেন,—"বিদ্যাসাগরের মানসিক বৈশিষ্ট্যের যথার্থ পরিচয় পেতে হ'লে তাঁর রচনার মধ্যেই তার অনুসন্ধান করতে হবে, এবং একথা বুঝে নিতে হবে যে, তাঁর রচিত গ্রন্থই তাঁর জীবনের সর্বোত্তম বাণী।"[১] বিদ্যাসাগর জীবনের একটি ব্যাসকূট, তাঁর ধর্মচেতনার স্বরূপ বিচারকালে আমরা এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করেছি। সে-যুগের মতো এ-যুগেও অনেক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে বিদ্যা-সাগরের ধর্মচেতনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত ক'রে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মচেতনা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তেমনি পাঠ্যপুস্তক-গুলির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের মনোজীবন সম্বন্ধে আর একটি গূঢ় গভীর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমলের দুটি মন্তব্য দেখা যায়। একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হচ্ছিল কালিদাস ও সেকসপীয়ার প্রসঙ্গে। সেই আলোচনার বিবরণ দিয়ে আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন,—'বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন একথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেমবাবু "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি" এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না।" আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে, হেমবাবুর অভিপ্রায় বোধ এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কথাটা তাঁর মনে লাগিল। আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানাবিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—"বটেই ত, খেতে, বসতে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ"।'[২] আর এক স্থানে আচার্য কৃষ্ণকমল মন্তব্য করেছেন, "আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময় সময় আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর "সাহেবদের" কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়।…

তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্বল্য ছিল, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। "সায়েবদের" নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে "সায়েব" সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।"[১] আচার্য কৃষ্ণকমলের মন্তব্য দুটিতে এইকথাই প্রমাণিত হয় যে বিদ্যাসাগর ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এমনই অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন যে, সেকথার উল্লেখমাত্রেই তাঁর প্রচণ্ড রাগও প্রশমিত হ'য়ে যেত। আর সেই শ্রেষ্ঠ জাতির মানুষদের কাছে তিনি আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন আর তাঁদের কাছে পাছে কেউ তাঁর অপেক্ষা বেশি প্রতিপত্তি লাভ করে, সেই আশঙ্কায় তিনি সর্বদাই বিব্রত থাকতেন। 'আখ্যানমঞ্জরী'র কয়েকটি গল্পে কিন্তু এই মন্তব্যের বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়। প্রথম ভাগের 'বর্বর জাতির সৌজন্য', দ্বিতীয় ভাগের 'উপকার স্মরণ', তৃতীয় ভাগের 'নৃশংসতার চূড়ান্ত', 'চাতুরির প্রতিফল', 'পুরুষজাতির নৃশংসতা' এবং 'অপত্যস্নেহের একশেষ' গল্পগুলিতে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগুলির কদর্য ও পাশবিক ব্যবহারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'বর্বর জাতির সৌজন্য' গল্পে দেখি শিকারান্বেষণে ক্লান্ত আমেরিকার এক আদিবাসী সন্ধ্যাকালে এক ইউরোপীয়ের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে কিছু খাদ্য প্রার্থনা ক'রে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হোল। সুসভ্য ইউরোপীয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর সেই আদিবাসির জল প্রার্থনাও পূর্ণ হোল না। ভগ্নমনোরথ আদিবাসীটি ক্লান্তচরণে তখন প্রস্থান করল। প্রায় ছ'মাস পরে সেই ইউরোপীয় ব্যক্তিটি শিকারের জন্যে জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে সঙ্গের লোকজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পথ হারিয়ে ফেলে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অদূরে এক আদিবাসীর কুটির দেখে সেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হোল। কুটিরের আদিবাসীটি অত্যন্ত আদর ও সৌজন্যের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ ক'রে খাদ্য ও পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করল এবং পরদিন প্রাতে অরণ্যের বাইরে লোকালয়ের পথে পৌঁছেও দিল। ইউরোপীয় প্রস্থানোদ্যত হ'লে আদিবাসীটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন?' ইউরোপীয় মহাপুরুষ তখন তাকে চিনতে পেরে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল। তখন সেই তথাকথিত অসভ্য ব্যক্তি সুসভ্য ইউরোপীয়কে গর্বিতভাবে বলল,—'মহাশয়, আমরা বহু-

১ পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৯-৫৭

কালের অসভ্যজাতি ; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্যজাতি, সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।' এই ব'লে সেই আদিবাসী ইউরোপীয়কে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির প্রতি মানবোচিত ব্যবহারের উপদেশ নিয়ে প্রস্থান করল। যে ইউ-রোপীয় শ্বেতকায় জাতি অশ্বেতকায় জাতিগুলিকে 'whitemans furden' ব'লে তাদের মধ্যে সভ্যতার আলোকদানের মহাব্রতের সংকল্প সাড়ম্বরে প্রচার ক'রে চলেছিল, তাদের এমনি বর্বর অমানবীয় ব্যবহারের কথা প্রকাশ ক'রে বিদ্যাসাগর মদগর্বী ইউরোপীয় জাতিগুলির দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য প্রচারের পিছনে লুকিয়ে থাকা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটিকেই যেন প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

ইউরোপীয়দের দুর্ব্যবহারের উত্তরেও যেখানে আদিবাসীরা যথার্থ সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার করে, সেখানে সদ্ব্যবহারের উত্তরে তারা যে উপকারীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় ভাগের 'উপকার স্মরণ' গল্পটিতে তারই পরিচয় পাই। আমেরিকারই এক আদিম অধিবাসী ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে কোন ইংরেজ পান্থশালায় খাদ্য প্রার্থনা করলে সেখান-কার কর্ত্রী তীব্র তিরস্কার ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে একজন ভদ্রব্যক্তি আদিবাসীটিকে পর্যাপ্ত খাদ্যদানে তৃপ্ত করেছিলেন। কিছুদিন পরে শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে প্রবেশ করলে সেই দয়ালু ব্যক্তিটি আদিবাসীদের দ্বারা বন্দী হ'য়ে এক আদিবাসী রমণীর কাছে ক্রীতদাসরূপে অবস্থান করতে বাধ্য হলেন। তখন সেই উপকৃত আদিবাসীটি পূর্ব উপকার স্মরণ করে তাঁকে মুক্ত ক'রে দিল। গল্পটিতে একজন বিশেষ ইংরেজের সদাশয়তার কথা প্রকাশ করলেও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ওপর ইংরেজদের সামগ্রিক অত্যাচারের কথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে,—'ইংরেজরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিমনিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন ; এজন্য তাঁহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ক্রটি করিত না।'

'আখ্যানমঞ্জরী'র তৃতীয়ভাগের 'নৃশংসতার চূড়ান্ত' গল্পটিতে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ওপর স্পেনীয়দের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, 'চাতুরির প্রতিফল' গল্পটিতে আদিবাসীদের সঙ্গে ফরাসী বণিকদের প্রতারণার বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে, 'অপত্যস্নেহের একশেষে' গল্পটিতে ধর্মের নাম করে স্পেনীয় মিশনারীদের চরমতম পাপের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে,

কিন্তু 'পুরুষজাতির নৃশংসতা'র মধ্যে এক ইংরাজ বণিকের নৃশংসতার কাহিনী অন্যান্য গল্পগুলির বীভৎসতাকে যেন ম্লান ক'রে দিয়েছে। লণ্ডনের এক বণিক-পুত্র টমাস ইঙ্কল অধিক অর্থ উপার্জনের জন্যে আমেরিকা যাত্রা করেছিল। পথিমধ্যে খাদ্য সামগ্রীর অন্বেষণে তাদের জাহাজ এক অপরিচিত স্থানে নোঙ্গর করে। সেই স্থানের লোকেরা ইউরোপীয়দের দ্বারা এতোদূর অত্যাচারিত হয়েছিল যে, সাদা মানুষ দেখামাত্রই তাদের আক্রমণ করল। জাহাজের যাত্রীদের অনেকেই নিহত হ'লেও ইঙ্কল গভীর অরণ্যে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে রক্ষা পেল এবং সেখানকার রাজকন্যা ইয়ারিকোর কৃপায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করল। অতঃপর ইঙ্কলের প্রার্থনা অনুসারেই ইয়ারিকো ইঙ্কলের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হোল। কিছুদিন পরে এক ইংরেজ জাহাজ সস্ত্রীক ইঙ্কলকে উদ্ধার ক'রে সভ্যজগতে ফিরিয়ে আনে। সেখানে সভ্যজগতের বাহ্যিক চাক-চিক্য দেখে হতবুদ্ধি ইয়ারিকো যখন মুগ্ধহৃদয়ে নিজেকে একজন সুসভ্য মানুষের স্ত্রী হিসেবে পরম ভাগ্যবতী ব'লে গণ্য করতে সুরু করে, তখন অর্থলালসায় উন্মত্ত ইঙ্কল কিন্তু দাসব্যবসায়ীদের কাছে তাকে বিক্রয় করার চিন্তা সুরু করে। ইয়ারিকো তার চরম সর্বনাশ উপস্থিত দেখে ইঙ্কলকে বরাবর পূর্বকথা স্মরণ করাতে চেষ্টা করে, কিন্তু নরপিশাচ ইঙ্কলের তাতে হৃদয়-পরিবর্তন হোল না। ইয়ারিকো 'অবশেষে, তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে। অন্ততঃ প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর; এমন অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নহে; গলদশ্রুলোচনে এই সকল কথা বলিয়া তাহার অন্তঃকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল।' কিন্তু ইঙ্কল তাতে বিচলিত হোল না বরং দাসবিক্রয়ের নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী নারী হিসেব ইয়ারিকোর জন্যে সে অধিক মূল্য দাবী করল এবং অক্লেশে অবলীলায় তাকে ক্রেতার হাতে সমর্পণ করল। এই গল্পটি মানবজীবনের সত্যোপলব্ধির মূল ধ'রে যেন টান দিয়ে যায়; প্রেম, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলোকে মানবইতিহাসের উদ্দেশ্যে বর্ষিত তিক্ততম ব্যঙ্গোক্তি বলে মনে হয়, মানব-সভ্যতার দীর্ঘ বিসর্পিল ধারাটি অন্তঃসারশূন্য, শূন্যগর্ভ এক অলীক কাহিনীতে পরিণত হয়। এই গল্পটির নায়ক একজন ইংরেজ। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সংঘর্ষ বিষয়ে রচিত গল্পগুলিতে সাধারণভাবে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সম্বন্ধে আমাদের মনে যে বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে, এই একটি গল্পে, বিশেষভাবে ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে তা তীব্র ঘৃণায় পরিণত হয়। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই ইংরেজ তার ভারতাধিকারের শতবর্ষ পূর্ণ

করেছিল আর ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের নানা নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথাও তাঁর অপরিচিত ছিল না। এই গল্পটি অনুবাদ করার পিছনে তেমন কোন ঘটনা প্রেরণা ছিল কিনা জানা যায় না, তবে একথা অতি সত্য যে, যদি তিনি খেতে, বসতে, শুতে, বেড়াতে সর্বাবস্থাতেই ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হতেন, তবে এই গল্পটি শিশুপাঠ্য পুস্তকের জন্যে অনুবাদ করতেন না। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সে-যুগের অনেকের অনেক মন্তব্য আজ যেমন অযথার্থ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, বিদ্যাসাগরের নিছক ইংরেজস্তুতির সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমলের উক্তিটিও তেমনি নিরপেক্ষ ও যথার্থ নয় বলেই প্রমাণিত হয়। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন থেকে আজ আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। তাঁর কর্মপ্রেরণার পশ্চাদ্‌পট ও পটভূমিকাও আজ অনেকটা ঝাপসা হ'য়ে এসেছে, একমাত্র উজ্জ্বল হ'য়ে আছে তাঁর রচনাবলী। পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে সেগুলি আজ যতোই অবহেলিত হোক না কেন, সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে সেগুলি আজ যতোই নিরুত্তাপ ব'লে প্রতীয়মান হোক না কেন, বিগতশতাব্দীর সর্বাপেক্ষা গতিবান ব্যক্তিচরিত্রের মানসপটের যবনিকা উত্তোলনে তাদের মূল্য অসীম। বিদ্যাসাগরের অবিমিশ্র ইংরেজতোষণের অপলাপের বিরুদ্ধে সেই রচনাবলীই দুর্লভ্য প্রমাণের পাহাড় উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে।

৪

তিনভাগ 'আখ্যানমঞ্জরী'র আখ্যানগুলির মধ্যে গল্পরসের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিতরণের পর 'জীবনচরিত' ও 'চরিতাবলী'র মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে বাস্তব মানুষের কাহিনীর। বাস্তব মানুষ হ'লেও অসাধারণ মানুষ, মহান মানুষ, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যাঁরা স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নাম উৎকীর্ণ ক'রে গেছেন কালের প্রেক্ষাপটে। এইসব অসাধারণ মহান মানুষের দল রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মাননি বা গজদন্তমিনারের ওপর ব'সে বিশ্বপৃথিবীকে বাণী দান করার ধৃষ্টতা দেখাননি। অতি সাধারণ—এমন কি নিরন্ননিরাশ্রয় অবস্থা থেকে তাঁরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন কেবল পুরুষকারকেই একমাত্র মূলধন হিসেবে অবলম্বন ক'রে।

নবপাঠার্থী ছাত্রদের কাছে এইসব মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধ'রে বিদ্যাসাগর যেন তাদের উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। 'জীবনচরিত'-এর 'বিজ্ঞাপনে' তাই তিনি লিখেছিলেন,—'কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে

কৃতকার্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র্যনিবন্ধন অশেষক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

ডুবাল আর জেঙ্কিন্সের জীবন-কাহিনী যেন এই 'বিজ্ঞাপনে'রই সার্থক উদাহরণ। এক অত্যন্ত দরিদ্র কৃষকের সন্তান ডুবাল দশবৎসর বয়সে পিতৃহীন হ'য়ে কঠোর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিলেন। একদিকে তীব্র জ্ঞান-পিপাসা, অন্যদিকে কঠোর দারিদ্র্য—এই দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি নানাস্থানে পশুপালনের কাজ নিলেন। নিরক্ষর অবস্থায় জীবন সুরু ক'রে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় নানা কাজে নিযুক্ত হ'লেও তাঁর অধ্যয়ন-স্পৃহা সর্বদাই তাঁকে প্রবলভাবে বিতাড়িত করে ফিরতো। নানারকম অসুবিধা আর লাঞ্ছনার মধ্যেও তাই তিনি অক্ষরপরিচয় থেকে সুরু ক'রে জীবনবিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ শিক্ষা করেছিলেন, ভূগোলশাস্ত্রের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এইসব বিষয়ের ওপর রচিত গ্রন্থ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করতে হয়েছিল। লোরেনের রাজকুমারের অনুগ্রহ লাভ ক'রে এই জ্ঞানপিপাসু বালকের বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল। অবশেষে জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ ক'রে তিনি হাজার টাকা বেতনের গ্রন্থাগারিক ও সাতশত টাকা বেতনের পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর জ্ঞানস্পৃহা কমেনি। রাখাল-বালকের জীবনে তিনি যেমন কঠোর তপশ্চর্যার সঙ্গে অধ্যয়ন করে যেতেন, শেষ জীবনে সম্মান ও বৈভবের মধ্যেও তেমনি তপস্বীর মতো একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের উপাসনা ক'রে গিয়েছেন।

ডুবালের মতো জেঙ্কিন্সও প্রচণ্ড বাধার পাহাড় ঠেলে জ্ঞানচর্চার এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে গেছেন। জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে আফ্রিকার এই রাজপুত্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এসে কি কঠোর সংগ্রামই না ক'রে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। অবশেষে দুরতি ক্রমণীয় বাধার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম ক'রে তিনি শিক্ষার সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। কিন্তু জেঙ্কিন্সের সর্ব-বাধা অগ্রাহ্য ক'রে শিক্ষাসাধনার ভূয়সী প্রশংসা করলেও তাঁর শেষ কাজ বিদ্যাসাগর সমর্থন করতে পারেননি,—'বোধহয়, কোন লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে

তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতাসম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারিতেন'। জেঙ্কিন্স তা' না ক'রে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন।

ডুবাল বা জেঙ্কিন্সের মতো জ্ঞানতপস্বী মহাপুরুষের জীবনকথা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন কয়েকজন মহাপুরুষের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চা করেই ক্ষান্ত হননি, আপনাদের জ্ঞানালোকে অন্ধ-কুসংস্কারের দুয়ারে নাড়া দিয়ে সত্য ও কল্যাণের বাণী প্রচার করেছিলেন। নিজেদের উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে যুক্তিহীন, প্রাচীনপন্থী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে তাঁরা নিন্দিত, ধিক্কৃত এমনকি লাঞ্ছিত পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁরা আপনাদের উপলব্ধি ও স্থির বিশ্বাসের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। এই রকম যে কয়েকজনের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে তাঁরা সকলেই বৈজ্ঞানিক, বিশেষভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত, যেমন, কোপার্নিকাস, গালিলিয়, নিউটন, হর্সেল।

কোপার্নিকাসই প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি সংস্কার মুক্ত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে বিশ্ববিধির মূল তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নিজের উপলব্ধি, অনুসন্ধান আর অবলোকনজাত সত্যকে তিনি মধ্যযুগের প্রশ্নচেতনা-হীন স্থবির সমাজের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে অবশ্য প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাচীন বিশ্বাস, ধর্ম-উপদেশ আর কুশিক্ষার অন্ধকারে ঢাকা সমাজ তাঁর সত্যসাধনাকে প্রথমে স্বীকার করতে পারেনি, উপরন্তু প্রচণ্ড বিরুদ্ধতায় ফেটে পড়েছিল। সেই বিরুদ্ধাচরণকারী সমাজের পরিচয় দিতে গয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন ; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেও তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কোনও বিষয় তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহারা কেবল প্রমাণপ্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্ব-নির্ণয়নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, নির্মলমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত।'

এই সামাজিক দুরবস্থাই দেশাচাররূপে বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রকার সংস্কার-

কর্মের সম্মুখে অভ্রভেদী বাধার পাহাড় তুলে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই মধ্যযুগীয় অন্ধ সংস্কারানুগত্যই সত্যোপলব্ধির বিরুদ্ধে মানবচেতনায় সর্বদাই বিরুদ্ধতার পাথর চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিল; বৈজ্ঞানিক সত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকযুগের বৈজ্ঞানিকদের যেমন এর সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, সামাজিক-সত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি বিদ্যাসাগরকে প্রতিপদে এই বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন এই বাধা কী কঠিন রূপ ধারণ করতে পারে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন এই বাধাকে অতিক্রম করতে না পারলে মানবসভ্যতার মুক্তি নেই।

বিদ্যাসাগর তাই অন্ধ কুসংস্কাররূপী দেশাচারকে অতিক্রম করার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বাংলার ছাত্রসম্প্রদায়কে। তাই বেছে বেছে এমন মহাপুরুষের জীবনী সংকলন করেছিলেন যাঁদের জীবন কেবলমাত্র সত্যের আবিষ্কারেই ব্যয়িত হয়নি, সেই সত্যের প্রতিষ্ঠাতেও যাঁদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে হয়েছে। বিদ্যাসাগরবর্ণিত এই মহাপুরুষরা আবার অধিকাংশই ছিলেন বৈজ্ঞানিক। এই বৈজ্ঞানিকচরিত্র প্রাধান্যদানের পিছনে বিদ্যাসাগরের একটি সচেতন উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরুদ্ধতা করা আজ আর মানুষের সাধ্য নাই, শত সহস্র কুসংস্কারের বাধা মাড়িয়ে সে সত্য আজ সূর্যের মতই ভাস্বর। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সত্যকেও একদিন কি ধরণের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, তার চিত্র প্রদান ক'রে বিদ্যাসাগর সেই বাধার মিথ্যা স্বরূপ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এই মিথ্যার পূজা ক'রে মানুষ চিরন্তন মনুষ্য-ধর্মকেই অস্বীকার করেছে। দেশাচাররূপে এই মিথ্যাই তাঁর সর্ববিধ সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধতা করেছিল। শাশ্বত মানবসত্যের ভিত্তিতে তিনি যে স্বাভাবিক বাঙালীসমাজ গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই মিথ্যার রূপ ধ'রে জীবনের সর্বস্তর থেকে কি প্রচণ্ড বাধাই না এসেছিল সেই সুস্থসবল মানবচেতনার গলা টিপে ধরতে!

উদ্দেশ্যের স্বাভাবিকতা ও সততার জন্যে বিদ্যাসাগর প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার পাহাড় অতিক্রম ক'রে রাজদ্বার থেকে নিজ মতের স্বপক্ষে আইন পাশ করিয়ে নিতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র যুগচেতনার সহায়তায়। কিন্তু এই যুগচেতনা চিরদিন ন্যায় ও সত্যের স্বপক্ষেই থাকে না। গালিলিয়কে সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করার অপরাধে একদিন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হ'তে হয়েছিল এই যুগচেতনার বিপক্ষতাচরণের জন্যে। কিন্তু চিরশতাব্দীর সত্যকে তাই বলে

ঢেকে রাখা যায়নি। সর্ববিধ বিরূপতা, বিপক্ষতা ও নির্যাতনকে অস্বীকার করে গালিলিয় যে সত্যের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন, সর্বসাধারণ্যে সেই সত্যের জ্ঞান প্রচারের জন্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণেই তিনি পশ্চাদ্‌পদ হননি।

'জীবন চরিত'-এর সাত বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'চরিতাবলী'। সর্ববিধ বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে অতন্দ্র সাধনায় জীবনে সার্থকতালাভের কাহিনীই 'জীবনচরিত'-এর বক্তব্য, আর জীবনের দুশ্চর তপস্যায় তাদের সিদ্ধিলাভের প্রধান যে উপকরণ, সেই বিদ্যানুশীলনের মাহাত্ম্য প্রচারই 'চরিতাবলী' রচনার মূল উদ্দেশ্য। তাই বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।' বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ প্রদানের এই ইচ্ছা 'চরিতাবলী'-র প্রতিটি কাহিনীতেই প্রকট। ডুবাল ও জেঙ্কিন্সের কাহিনী বিদ্যাসাগর 'জীবনচরিত'-এ সঙ্কলন করেছিলেন, 'চরিতাবলী' তেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দু'জনের কাহিনীতেই উপস্থাপনা ভঙ্গীতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 'জীবনচরিত'-এ যেখানে তাদের সমগ্র জীবনটির পর্যালোচনা করা হয়েছে, 'চরিতাবলী'তে যেখানে প্রধানভাবে তাঁদের দুর্যোগপূর্ণ ও প্রতিবন্ধকতাময় শিক্ষাজীবনের প্রতিই শিক্ষার্থী বালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডুবালের কাহিনী শেষ ক'রে তিনি তাই মন্তব্য করেছেন,

'যাহারা মনে করে দুঃখে পড়িলে, লেখাপড়া হয় না, তাহাদের মন দিয়া ডুবালের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক। দেখ, ডুবাল অতি দুঃখীর সন্তান, অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন; পেটের ভাতের জন্য, কত জায়গায় রাখালি করেন; তথাপি কেমন লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এবং কেমন সম্মান, কেমন সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, শেষ দশায় কেমন সুখে, কেমন স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিয়া গিয়াছেন।'

শিক্ষাতেই শিক্ষার শেষ ব'লে বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন না, তিনি মনে করতেন শিক্ষার গুণেই মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী হ'তে পারে। শিক্ষা কেবলমাত্র মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিই ঘটায় না, মানুষের ইহজীবনকেও পরিপূর্ণ ক'রে তোলে। শিক্ষা প্রচারের জন্যে বিদ্যাসাগরকে সেদিন এই বক্তব্যের ওপরই জোর দিতে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি ক'রে। কারণ এদেশের জনজীবনে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার সঙ্গে যে নিদারুণ দারিদ্র্য মানুষের সহজ মূল্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে ফেলেছিল, শিক্ষাকে যদি সেই দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তিদাতারূপে তুলে ধরা যায়, তবে সাধারণ মানুষ যতো

সহজে তাকে সাদরে বরণ ক'রে নেবে, অন্যভাবে তা হবে না। উইলিয়ম হটনের কাহিনী শেষ ক'রে বিদ্যাসাগর তাঁর মন্তব্যে সেই কথাই বলেছেন,

'দেখ! এই ব্যক্তি কেমন অদ্ভুত মনুষ্য; বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন; তথাপি, কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, কেমন বিদ্যালাভ, কেমন খ্যাতিলাভ, কেমন সম্পত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, যত্ন থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে, সম্ভবমত, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে।'

আর একটি কাহিনীর শেষে বিদ্যাসাগর একথা আরো স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছেন,

'ফলতঃ, কেবল উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে, বিলক্ষণ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তিনি উৎসাহহীন ও পরিশ্রমকাতর হইতেন, তাহা হইলে, অধিক বয়সে লেখাপড়াও হইত না; এবং দুঃখেরও সীমা থাকিত না।'

'অতএব, উৎসাহ ও পরিশ্রম বিদ্যা ও সম্পত্তির মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

এই বিদ্যা ও সম্পত্তির মূল—উৎসাহ ও পরিশ্রমের দ্বারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষকে কতো যে বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম ক'রে আসতে হয়, সঙ্কলিত মহাপুরুষকাহিনীতে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে বিদ্যাসাগর দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালীসমাজকে নবীন উৎসাহে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনীসঙ্কলনে তিনি তাই তাঁদের সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে তাঁদের সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। চাষীর সন্তান উইলিয়ম রস্কো পিতার অসঙ্গতিবশতঃ বারো বছর বয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে চাষের কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু বাজরা মাথায় ক'রে বাজারে আলু বেচেও তাঁর অধ্যয়নস্পৃহা অবদমিত হয়নি। এই অনবদমিত উদগ্র বিদ্যাবাসনাই তাঁকে সর্ববিধ বিরুদ্ধতার মধ্যেও সার্থকতার পথে পরিচালিত করেছিল এবং তাঁর উত্তর জীবনের সাফল্য প্রমাণ করেছিল যে লক্ষ্য স্থির থাকলে এবং আগ্রহ ও উৎসাহের বিকেন্দ্রীকরণ না ঘটলে, মানবজীবনে সার্থকতার পথে কোন বিপত্তিই বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। দরিদ্র শ্রমিকসন্তান উইলিয়ম হটন অনাহার অর্ধাহারপীড়িত হতভাগ্য এক সংসারে আবির্ভূত হ'য়ে পানাসক্ত পিতার অসামর্থ্য হেতু অসহায়া মাতার ক্লেশ শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছিলেন মাত্র। কিন্তু কোন অবস্থাবিপাকেই তাঁর অধ্যয়নস্পৃহা অবদমিত হয়নি। রেশম কারখানার মালিকের বেত্রাঘাত কিম্বা দুর্বৃত্তা পিতৃব্যপত্নীর পীড়ন তাঁর শিক্ষাগ্রহণের উদগ্র কামনা নির্বাপিত করতে পারেনি। তাঁর ইচ্ছাশক্তি, শিক্ষার প্রতি অনন্ত আগ্রহ এবং স্থির লক্ষ্য

সর্ববিধ বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার উজান ঠেলে সার্থকতার তীরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

বাধা যে কেবলমাত্র বিপরীত অবস্থা ও বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকেই আসে, তা নয়। তন্তুবায় পুত্র সিমসনের জীবনে দেখি পিতার অজ্ঞতাই প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি ক'রে তাঁর বিদ্যার্জনের পথ রুদ্ধপ্রায় ক'রে তুলেছিল। অজ্ঞ তন্তুবায় তার পুত্রের পাঠাভ্যাস প্রবৃত্তিকে অলস কালহরণ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি, তাই পুত্রকে নিজকর্মে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু পিতার প্রচণ্ড বিরূপতাও সিমসনকে টলাতে পারেনি ব'লে শিক্ষাই উত্তর জীবনে তাঁর সার্থকতা দ্বার খুলে দিয়েছিল। হাণ্টারের জীবনে দেখি পিতার বিরুদ্ধতা নয়, তাঁর স্নেহাধিক্যই প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর দৈব আশীর্বাদের মতো দারিদ্র্য এসে তাঁকে রাহুমুক্ত করেছিল এবং কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তিনি শিক্ষার মধ্যেই জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। তখন কোন বাধাই আর তাঁর গতিরোধ করতে পারেনি।

'চরিতাবলী'র মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক জীবনকাহিনী আছে। বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে যে অসংখ্য কিংবদন্তী গ'ড়ে উঠেছিল, তার একটি ঘটনার ওপর এই কাহিনীটির যথেষ্ট প্রভাব আছে ব'লে মনে হয়। হল্যাণ্ডের ইউট্রেক্‌ট্ নগরের অধিবাসী এড্রিয়ন ছিলেন দরিদ্র এক নৌনির্মাতার সন্তান। ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর সামর্থ্য দূরে থাক, দু'বেলা খেতে দেবারও তাঁর সঙ্গতি ছিল না। রাত্রে দীপ জ্বালার ক্ষমতা না থাকলেও এড্রিয়ন ভগ্নোদ্যম হননি, 'গিরজার দ্বারে, ও পথের ধারে, সমস্ত রাত্রি, আলো জ্বলিত। তিনি, পুস্তক লইয়া, তথায় গিয়া, সেই আলোকে পাঠ করিতেন।'

বিদ্যাসাগর প্রচারিত এড্রিয়ন জীবনের এই কাহিনীটি পরবর্তীকালে তাঁর নিজের জীবনের ওপরই আরোপিত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত কলকাতার রাজপথ আলোকিত করার কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হ'লেও, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বিদ্যাসাগর রাস্তার ধারে গ্যাসের আলোতে দাঁড়িয়ে পাঠাভ্যাস করতেন ব'লে প্রচারিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এই কিংবদন্তী সৃষ্টিতে বাঙালী মানসে বিদ্যাসাগর প্রভাবের প্রকৃতির দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ সে-যুগের বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর বিরচিত পাঠ্যপুস্তকের বহুল প্রচার এবং বাঙালীমানসে তার অনপনেয় প্রভাবই এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বাঙালীর সশ্রদ্ধ এবং বিস্ময়-বিমুগ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁর বাল্যজীবনের কঠোর দারিদ্র্য, সেই

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম এবং তারই পরিণতিতে জাতীয় জীবনের কেন্দ্রীয় পুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব বাঙালীসমাজে তাঁর জীবৎকালেই তাঁকে এক কিংবদন্তীর চরিত্রে পরিণত করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই অসামান্যতা অসম্ভাব্যতার সীমা ছুঁয়ে যাওয়ায় বাঙালীজাতি তাঁর জীবনবাণী অনুসরণের গুরুদায়িত্ব পরিহার করার সুযোগ পেয়েছিল। নানাবিধ অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনারাজি তাঁর জীবনচরিতে আরোপ ক'রে যেন এই কথাই বলতে চেয়েছিল যে, বিদ্যাসাগর মানুষ নন, দেবতা। দেবতার মতো তাই তাঁকে শ্রদ্ধা করা চলে, কিন্তু নিজেদের জীবনে তাঁর আদর্শ অনুসরণের প্রয়াস বাতুলতামাত্র। বিধাতা যেখানে সাতকোটি বাঙালী সৃষ্টি করেছেন, সেখানে একজন বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব কি ক'রে সম্ভব হোলো মনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তথাকথিত দেবত্বের আবরণ ছিন্ন ক'রে বিদ্যাসাগরের মনুষ্য-মহিমাকে তুলে ধ'রে তিনি তাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন. 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

৫

সেকালের পাণ্ডিত্যাভিমানী জীবনচরিতকার থেকে সুরু ক'রে একালের মূর্তিবিধ্বংসকারী শিশুকালাপাহাড়ের দল পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের যে-গ্রন্থটির ওপর সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত, তা হোল তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ।' কিন্তু গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের কি উদ্দেশ্য ছিল এবং কোনশ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল, তা উপলব্ধি না করার ফলে সর্বত্রই বিচার-বিভ্রান্তি ঘটেছে।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি, এটি লেখা হয়েছিল 'for the examination of the students of the College of Fort William in the Bengali Language' এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষও গ্রন্থটির এই বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হননি। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি কলেজের বিদেশী সিভিলিয়ান ছাত্রদের পক্ষে এতোদূর প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছিল যে, তাদের মাতৃভাষা ইংরেজির মাধ্যমে এর বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে দেবার জন্যে, সেক্রেটারী মার্শাল সাহেব 'Guide to Bengal' নামে এর একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন। ছাত্রদের ইতিহাস শিক্ষার জন্যে ইংরেজি থেকে

অনূদিত গ্রন্থের পুনরায় ইংরেজিতে অনুবাদের কোন প্রয়োজন ছিল না, মার্শম্যানের গ্রন্থই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারতো। কিন্তু এই পুনরনুবাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য বিবৃত ক'রে মার্শাল সাহেব ভূমিকায় লিখেছিলেন,

'My principal objects in this undertaking have been, to give a specimen of close and accurate translation combined with a due regard to the idiom of the language translated in to, and to illustrate, by notes, the etymology and idiomatic peculiarities of the language translated from. I have added notes and observations bearing upon the Geography and Statistics of Bengal, and the opinions and customs of its inhabitants. Taking the work as a whole, it may be considered as conveying hints on a number of interesting subjects and on this ground I have ventured to style it a Guide to Bengal'

ভাষাশিক্ষার এই স্থূল প্রয়োজনে রচিত হ'লেও 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ'-এ বিদ্যাসাগরের একটি নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয়চেতনার আবেগোদ্বেলতা অথবা শ্বেতাঙ্গ তোষণের নির্লজ্জতা গ্রন্থের মূল বক্তব্যকে কোথাও কুয়াসাচ্ছন্ন করতে পারেনি। ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে রচিত হ'লেও ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃতি অথবা ঐতিহাসিক চরিত্রের বিরূপ ব্যাখ্যা তিনি স্বীকার ক'রে নেননি। মার্শম্যানের সঙ্গে ব্যক্তিগত হৃদ্যতা থাকলেও এবং মার্শম্যানের গ্রন্থের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করলেও এ-বিষয়ে তিনি স্বাধীনভাবে যথার্থ ঘটনা বিবৃত করতে পশ্চাদ্‌পদ হননি। সিরাজ-উদ্দৌলার অন্তিম ট্র্যাজেডি তাঁর নৃশংসতা ও কৃতঘ্নতার বিভীষিকাকে ঢেকে দিতে পারে না। "He was more unfortunate than wretched" ব'লে আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁর দুর্ভাগ্যকে যতোই বড়ো ক'রে তুলতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর দৌরাত্ম্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' সিরাজের প্রতি বিদ্যাসাগরের কোন দুর্বলতাও যেমন প্রকাশিত হয়নি, তেমনি কোন বিরূপতাও প্রকট হ'য়ে ওঠেনি। সিরাজকে তিনি 'অতি দুরাচার নবাব' ব'লে বর্ণনা করলেও, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-এর মতো সিরাজবিরোধীদের ধর্মের অবতার ব'লে মনে করেননি।

রাজবল্লভের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের অধিকার সময়ের প্রথা অনুসারে, প্রজার সর্বনাশ করিয়া, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন।' এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন উমিচাঁদের সঙ্গে ক্লাইভের জালিয়াতি সমর্থন করেননি। সে-কথার উল্লেখ ক'রে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, 'ওয়াট্‌সন সাহেব, ক্লাইভের ন্যায়, নিতান্ত ধর্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না।' সিরাজ কলকাতায় দুর্গ-নির্মাণ করতে নিষেধ ক'রে পাঠালে ইংরেজ কর্মাধ্যক্ষ ড্রেক উত্তর পাঠালেন, 'আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।' সিরাজের কলকাতা আক্রমণকালে এই বীরপুরুষের বীরত্ব অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছিল, তিনি 'কাপুরুষত্ব প্রদর্শনপূর্বক, পলায়ন করিয়া, স্বীয় অনুচর বর্গের সহিত নদীমুখে জাহাজে অবস্থিত করিতে লাগিলেন।' দুর্গ অধিকৃত হ'লে সিরাজ দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হলেন। বন্দী ইংরেজদের তাঁর সম্মুখে আনা হ'লে তিনি হলওয়েলকে দেখলেন, 'হলওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বদ্ধ ছিল, নবাব খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পৃষ্ট হইবে না।' রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের ভয়েই ঢাকা থেকে কলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিলেন ইংরেজদের কাছে আশ্রয় লাভের আশা ক'রে। 'নবাব যে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার এক প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন, কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।' এরপর অন্ধকূপ হত্যার কথা।— 'এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে; উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, এবং সিরাজউদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে, সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।'

'বাঙ্গালার ইতিহাস' পাঠে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ইংরেজ বাহুবলে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করেনি, বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারাই ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত হয়েছিল, 'যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইভের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।' ইংরেজদের কাছে মীরকাশিমের

পরাজয়ের কারণও ছিল এই বিশ্বাসঘাতকতা, 'নবাবের সৈন্যসকল, প্রকৃত প্রস্তাবে, শিক্ষিত হইয়াও, প্রতিযুদ্ধেই যে, ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার একমাত্র কারণ।' বিশ্বাসঘাতকতার ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠা ইংরেজ আধিপত্যে কৃতঘ্নতাই ছিল রাজকর্মচারীদের একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, 'তৎকালে গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ধর্মাধর্ম-জ্ঞান ও ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না।' দেশীয় কর্মচারী থেকে সুরু ক'রে ইংরেজ গভর্ণর-জেনারেল ও প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত কেউই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। হেষ্টিংস ও নন্দকুমারের বিবাদের বিবরণ দিয়ে তাই বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, 'নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।'

'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থটি এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দেখা যায়, লেখকের ঐতিহাসিকোচিত নির্লিপ্ততা গ্রন্থটির মধ্যে সর্বত্রই বিরাজিত রয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ সিভিলিয়ান ছাত্রদের পঠনোদ্দেশে রচিত গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসশিক্ষা নয়, ভাষাশিক্ষা ; একথা বিদ্যাসাগর খুব ভালোভাবেই জানতেন, মার্শম্যানের গ্রন্থের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদে আবার তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল অতিরিক্তভাবে সঙ্কুচিত ; তথাপি তাঁর ঐতিহাসিক মনোভঙ্গি গ্রন্থটিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিল যে, বাংলাদেশের এক যুগ-সন্ধিক্ষণের চরম নৈরাশ্যময় বিশৃঙ্খলার ছবিটি আমাদের কাছে ছবির মতো স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে, সেখানে সিরাজউদ্দৌলা দুরাচার, ক্লাইভ জালিয়াৎ ; মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক, ড্রেক ভীরু কাপুরুষ ; নন্দকুমার দুরাচার, হেষ্টিংস ও এলিজা ইম্পে তাঁর চেয়েও পাষণ্ড। সেদিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চরম অবক্ষয়ের যে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল দেশী বিদেশী সকলেই সমান জোরের সঙ্গে তার দড়িতে টান দিয়েছিল। আশ্চর্য পক্ষপাতশূন্য নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর যথার্থ ঐতিহাসিকের মতো সে-যুগের এই চিত্রটির পরিচয় প্রদান করেছেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ'-এ। উপকরণ সংগ্রহ ক'রেও তিনি ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার অবসর পাননি। বিদ্যাসাগরের সে প্রয়াস সার্থক হ'লে, বাঙালীসমাজে আধুনিক জীবনচেতনা আবির্ভাবের প্রায় প্রথম লগ্নেই আমরা একজন ভারতবাসীর রচিত ভারতবর্ষের একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত ইতিহাস পেতাম, ইংরেজের ভারতবিদ্বেষ-প্রচারকে ইতিহাস ব'লে অসহায়ভাবে গলাধঃকরণ করতে হ'ত না।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাস' গ্রন্থ তিনটিও বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই তিনটি গ্রন্থকে কেবলমাত্র নিছক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গণ্য করা চলে না। এই গ্রন্থত্রয় এবং 'ভ্রান্তি-বিলাস'কে কেন্দ্র ক'রেই বাংলা উপন্যাসের একটি বিশেষ স্তর সেদিন দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। ইতিপূর্বে ভবানীচরণের প্রয়াসে বাংলা উপন্যাসে নায়ক চরিত্র গ'ড়ে উঠলেও নায়িকার অভাবে সে নায়ক চরিত্র কোন কাহিনীর মধ্যে আশ্রয় না পেয়ে সামাজিক নকৃসার উপরিস্তরে কেবলই ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থগুলি বাংলা উপন্যাসে নায়িকা সমাগম ঘটিয়ে সমাজজীবনের নরনারীকেন্দ্রিক সামাজিক কাহিনী রচনার সূত্রপাত করেছিল, ত্বরান্বিত করেছিল বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আবির্ভাবকে।

আট

'সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন'

১

উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে আধুনিককালের সৃষ্টি। বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম সূত্রপাত ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলাসাহিত্যেও মধ্যযুগের সাহিত্য প্রচেষ্টার পরোক্ষ পরিণতিরূপে এই সূত্রপাতের পূর্বেও উপন্যাসের পূর্বাভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাকে কোন-ক্রমেই উপন্যাস আখ্যায় অভিহিত করা যায় না। উপন্যাসের এই পূর্বাভাসকে 'fiction' এবং তার পূর্ণ প্রস্ফুটিত পরিণততম রূপটিকে 'novel' বলে আখ্যাত ক'রে সমালোচক দুই-এর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন সার্থকভাবে, 'So long as men have told stories, there has been fiction whether in verse or prose·········but the novel itself is something new.'[১] 'Fiction' আর 'novel'-এর মধ্যকার এই পার্থক্যের সহজসত্যটির অনেক সময়েই বিস্মৃতি ঘটে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই, 'The historians have been guilty of a confusion ; they have assumed that the words 'fiction' and 'novel' are synonymous and interchangable. They are not'[২]. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আমরা বাংলা উপন্যাসের যে পূর্বাভাস পাই তাকে এই 'fiction'-শ্রেণীভুক্ত করা চলে, কিন্তু 'novel'-এর জন্ম একেবারে আধুনিক যুগে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবের পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

'সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন উপন্যাস রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর।[৩]

এই অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তরে বাংলা উপন্যাস সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেছিল। সংবাদপত্রকে আশ্রয় ক'রেই সেদিন যুগ-সঞ্চিত নানা বিক্ষোভ শ্লেষ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, ফলে, নবলব্ধ এই প্রকাশ মাধ্যম খুব সহজেই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। সমাজে, সাহিত্যে ও ধর্মে যা কিছু হাস্যকর, বিসদৃশ, ও দৃষ্টিকটু সংবাদপত্রগুলিতে তাই নির্বিচারে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছিল। যে-যুগ ও সমাজসচেতনতা সাহিত্যের মূল লক্ষ্য, এমনিভাবে সংবাদপত্রকে আশ্রয় ক'রেই বাংলাদেশে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যে স্তর, সেই স্তরে, বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র হোল শ্রীরামপুর মিশনের 'সমাচার দর্পণ।' এই 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠাতেই বাংলা উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তরের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে আমরা তার বহুল উদাহরণ আহরণ করতে পারি।

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্কলনে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত এমন এক একটি আশ্চর্য-জনক ও কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেগুলি সমসাময়িক নানান ধরণের সংবাদ অপেক্ষা পৃথক। কোন সত্য ঘটনার বিবরণ হ'লেও সে সংবাদগুলি আমাদের কল্পনাকে উদ্রিক্ত ক'রে তোলে। সংবাদগুলির মধ্যে এক বিশেষ স্থানের বিশেষ মানুষের কথা প্রকাশিত হ'লেও দেশ কালের অতীত চিরন্তন মানুষের কথাও তাদের মধ্যে আভাসিত হ'য়ে উঠেছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত একটি 'আশ্চর্য বিবাহ'-এর বিবরণে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তার পূর্বে বা পরেও নানা বিবাহ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির মধ্যে ধনীগৃহে বিবাহোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের হিসেবই ছিল প্রধান আকর্ষণ। যেমন শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ—যে বিবাহে এতো কাঙালী জমা হয়েছিল যে, তাদের বিদায়ের সময় 'দুইজন কাঙ্গালী মরিয়াছে আর একজন আঘাতী হইয়াছে।' কাশীমবাজারের শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায়ের বিবাহ উপলক্ষে দু'লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। আবার কলকাতার রামরত্ন মল্লিক ছেলের বিয়েতে, 'অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকায় ব্যয়' করেছিলেন। কলকাতার কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির বিয়েতে, 'ছোট আদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখী লোকেরদিগকে আপন ধন দ্বারা' মুক্ত করার খবরও প্রকাশিত হ'তে দেখি। কিন্তু এ সমস্ত সংবাদ সংবাদই, তার বেশি আর কিছু নয়, ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতার বাঙালী ধনীসমাজের বিবাহোপলক্ষে আপন ধনগৌরব, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, কিঞ্চিৎ মহানুভবতা প্রকাশের আড়ম্বর মাত্র। তাই এই সংবাদগুলি তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসেব নিয়ে আমাদের সামান্য কৌতূহল জাগিয়েই বিলীন হ'য়ে যায়। কিন্তু বর্ধমানের এক অর্থগৃধ্নু ব্রাহ্মণের ষোড়শী কন্যার বিবাহের আশ্চর্যজনক বিবরণে লক্ষ টাকার হিসেব নেই বটে, কিন্তু এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোন বিবাহ-সংবাদে নেই, আর সেই বৈশিষ্ট্যই তাকে সাধারণ সংবাদ থেকে সাহিত্যের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। আমরা জানি, সাহিত্য জীবনের এমন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশের গভীর ব্যঞ্জনাময় অনুকরণ যে তার সঙ্গে পরিচয় মাত্রে আমাদের কল্পনা উদ্দীপ্ত হ'য়ে একটি বিশেষ মানুষের কাহিনীতে নির্বিশেষ মানবজীবনের চিরন্তন পটভূমিকাটি স্পষ্টতর ক'রে তোলে। বর্ধমানের ব্রাহ্মণ কন্যাটির বিবাহবিবরণে আমরা তারই পরিচয় পাই,

'আশ্চর্য বিবাহ॥ মোকাম বর্দ্ধমানের নিকট এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আপন কন্যার বিবাহ দিতে এই পণ করিল যে, যে ব্যক্তি চারিশ' টাকা পণ দিয়া আর ২ খরচ করিতে পারিবেক তাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিব ইহাতে যে অপারক হইবেক তাহার সহিত কথা কহিব না এই পণে কতকদিন গত হইলে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়স্কা হইল কিন্তু তিনি তাহাতে পর পর পণের বাহুল্য ব্যতিরেকে ন্যূন করিতে স্বীকার করেন না, সুতরাং কন্যারও বিবাহ হয় না। পরে তাহার গ্রামের তিনচারি ক্রোশ অন্তরবর্তি এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি ঘটক আনাইয়া কহিল যে আমি বিবাহ করিব উপযুক্ত কন্যাএকটি অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আমার বিবাহ দেও টাকা দিতে আমি কাতর নই। পরে ঘটক কহিলেন যদি চারিশত টাকা দিতে পার তবে অমুক গ্রামে অমুকের কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে আর সে কন্যাও উপযুক্তা বটে। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ও ঘটক উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যা কর্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। পরে কন্যাকর্তা কহিলেন তোমরা অদ্য থাকহ রাত্রিতে আত্মীয়লোক ডাকাইয়া পত্রাদি করিব। ইহা কহিয়া তিনি কর্মান্তরে গেলেন। বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কির পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা

দেখিয়া কন্যাও ঐঘাটে গিয়া বরকে কহিল যে তুমি ও ঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি ঐবাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল। এবং কন্যাও স্নানের চ্ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যে-হেতুক আমার পিতার ধর্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করি। ইহা কহিয়া কন্যা সেখানে গেলে বর স্নান করিয়া আসিয়া ঘটককে কহিলেন তুমি শীঘ্র আমার বাটী হইতে ৫০ পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দেহ অদ্যই আমার বিবাহ হইতে পারে। ঘটক টাকা আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এখানে বর পীড়া ছল করিয়া বাহিরের ঘরে অভুক্ত শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কন্যার নিকট হইতে এক স্ত্রীলোক আসিয়া বরের নিকট হইতে পঁচিশ টাকা লইয়া গেল। ঐটাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহা আনন্দিতা হইল যেহেতুক কন্যার পিতার এই দুষ্কর্মহেতুক সকল লোকই তাহার বিপক্ষ ছিল। পরে কন্যা পুরোহিত ও নাপিত ও চৌকিদার প্রভৃতিকে ডাকাইয়া যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহার দ্বিগুণ ২ দিয়া সকলকে বশ করিল। পরে শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধির সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া ঐ রাত্রেই শুভবিবাহ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে আমারদের বাটীতে গিয়া আমার পিতাকে প্রণাম কর যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করিবেন তখন তাহার উত্তর আমি করিব তুমি কিছু কহিও না। প্রাতঃকালে কন্যাকর্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময় ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সুতা বান্ধা দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল ওরে বেটা চোর তুই কাহার কন্যা কাহার হুকুমে বিবাহ করিলি কেহ এখানে আছ হে এই জুয়াচোর বেটাকে বান্ধ এখনই ইহাকে থানায় দিতে হইবেক এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে এইরূপ কটু কহিতেছে এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল যে শুন যদি আমি

অকুলে কিম্বা অজাতিতে বিবাহ করিতাম তবে তুমি অনুযোগ করিতে পারিতা কিন্তু দিবসে তুমি এই পাত্রের সহিত পণাপণ ও জাতিকুল সকল স্থির করিয়া ছিলা কেবল টাকা লইতে বাকী ইহাতে আমি বিবাহ করিয়াছি মহাশয় আর ক্রোধ করিবেন না ক্ষান্ত হউন প্রজাপতির নির্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে এখন আর অনুযোগ করিলে কি হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত না হইয়া গ্রামের থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব জ্ঞাত হইয়াছিল তথাচ তাহার অনুরোধে একজন পেয়াদা দিল। পেয়াদা বাটীতে আইলে কন্যা কহিল শুন পেয়াদা পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন আমি বিবাহ করিয়াছি ইহাতে দারোগার কোন এলেকা নাই তবে তুমি পেয়াদা আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়া দারোগাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহ।

পেয়াদা গেলে পর কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্বক পিতা আনেন তবে একশত টাকা তাহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর ২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছু পাই না। সুতরাং চৌদ্দদিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদরপূর্বক একশত টাকা শুদ্ধা শ্বশুরবাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল। এমত আশ্চর্য বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই।'[১]

সাময়িকপত্রে প্রকাশের সময় এই অভিনব বিবাহ কাহিনীটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল 'আশ্চর্য বিবাহ'। আশ্চর্যরকমের নতুন পথেই যে এই বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই এই বিবাহকাহিনীটি অন্যান্য বিবাহ কাহিনীর মতো কৌতূহলোদ্দীপক একটি সংবাদ মাত্রেই থেমে থাকেনি, অর্থলালসার যূপকাষ্ঠে লোভী ব্রাহ্মণের কন্যা বলিদানের অপপ্রয়াসের উপযুক্ত পরিণতির বর্ণনায় একটি আদিমধ্যঅন্ত যুক্ত কাহিনী হ'য়ে উঠেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের বাঙালী সমাজের একটি বিশেষ দিকের ব্যঞ্জনায় কাহিনীটির মধ্যে একটি সর্বজনীন রসাবেদনও সৃষ্টি হয়েছে।

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬ ; পৃ. ২৭১-২৭৩

এই আশ্চর্য বিবাহের কাহিনীটি সে-যুগের সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা আশ্চর্যজনক সংবাদের নমুনা মাত্র। সেই আশ্চর্যজনক সংবাদগুলি সমকালীন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকাতে সংঘটিত সত্য ঘটনার বিবরণমাত্র হ'লেও তাদের মধ্যে একটা চিরকালীন রসাবেদন সৃষ্টি হয়েছিল। যে সমস্ত চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে এই কাহিনীগুলি গ'ড়ে উঠেছিল, কেবলমাত্র ঘটনার প্রয়োজনে আবির্ভূত হ'য়েই তারা কৃতার্থবোধ করেনি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনার সঙ্গে সঙ্গে একটা আত্মানুসন্ধান প্রবৃত্তির প্রকাশে তাদের মধ্যে সমকালীন সীমা-বদ্ধতার সঙ্গে চিরকালীন মনুষ্যত্ববোধের আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল। তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই তারা সংবাদপত্রের কৌতূহলের সীমা ছাড়িয়ে সাহিত্যের রসের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এই সমস্ত চরিত্রগুলির মাধ্যমেই সে-যুগের সমাজজীবনে দিকপরিবর্তনের নানা আভাস প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষায় বাংলার সমাজজীবনে তখন যেন একটা দিকপরিবর্তনের দক্ষিণা বাতাস বইতে সুরু করেছিল। এই ঘটনাগুলিই সমাজজীবনে নতুন জীবনচেতনাকে প্রতিবিম্বিত ক'রে তুলে বাংলাসাহিত্যে উপন্যাস রচনার পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনাগুলিই বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের পূর্বসূরী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই ঘটনাগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের অবসান ঘটিয়ে তাদের একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার মধ্যেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় সেই নবোদ্গত অঙ্কুরেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের উৎস নির্ণয়ে এই সংবাদ কণিকাগুলি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। সকল দেশের সাহিত্যসাধনাতেই উপন্যাস হোল অর্বাচীনতম সিদ্ধি, সমাজে আধুনিকতা আবির্ভাবের পরই সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকাশ ঘটে। এই আধুনিকতা সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনাকে আশ্রয় করেই আবির্ভূত হয়। এককালে মানুষ যখন কেবলমাত্র কয়েকটি ভাবের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হ'ত, তার সকল কর্ম যখন কোন এক নিগূঢ় রহস্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব'লে মনে করা হ'ত, তখন সাহিত্যে ছিল কাব্যেরই প্রাধান্য। ছন্দোময় কাব্যের গুরুগম্ভীর অথবা ধীরললিত ধ্বনিমাধুর্যে মানুষের ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা তার প্রতীকী রূপটিই প্রধান হ'য়ে উঠতো। কিন্তু যে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আশা-আকাঙ্ক্ষা, সার্থকতা-ব্যর্থতা অথবা মহত্ব-নীচতা নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হ'য়ে উঠছে, সেখানে তার অস্তিত্বই স্বীকৃত হয়নি। সেদিন মানুষের চিন্তাধারায় এই পরিপূর্ণ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তার

প্রতীকীরূপেরই প্রাধান্য ছিল। চিন্তাজগতে পরিবর্তনের সূত্র ধ'রে একদিন মানুষ নিজেকে ভাবের প্রতীকী-সত্তার নির্মোক মুক্ত ক'রে আপন মনের ভাবকেই চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে শিখলো। তার সব চিন্তার কেন্দ্রে তখন মানুষেরই প্রাধান্য ঘটলো, ভাবলোকের কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা তার কাছে মর্তপৃথিবীই অধিকতর প্রিয় হ'য়ে উঠলো। এই মানবাভিমুখীনতা, এই মর্তানুসারিতাই সাহিত্যে আধুনিকতার ভিত গাঁথলো। এর ফলেই ভাবের প্রতীকী সত্তা থেকে মানুষের যথার্থ বাস্তব চরিত্রে উত্তরণ ঘটলো। তার আত্মানুসন্ধানবৃত্তি থেকে আত্মসম্মানবোধের জাগরণ ঘটলো।

বাংলাদেশে এই আধুনিকতার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটলেও এ আধুনিকতাকে কোনক্রমেই ইংরেজিশিক্ষার ফল হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। সেদিন বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে, ইংরেজশাসন বা ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, একটা পরিবর্তনের আভাস ধ্বনিত হচ্ছিল। ফলে যুগসঞ্চিত জড়তা ঝেড়ে ফেলে বাঙালী তার নিজের দিকে তাকাতে সুরু করেছিল, বাংলাদেশের দিকে দিকে একটা জীবন মহোৎসবের সাড়া জেগে উঠেছিল। বর্ধমানের স্বয়ম্বরা ষোড়শী গ্রাম্যবালিকাটির প্রাণে তারই স্পন্দন জেগেছিল, তার প্রকাশ সংবাদপত্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ কিছুটা স্বতন্ত্র ঘটনা ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাহিত্যেও সেই স্বীকৃতির দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত হ'য়ে পড়েছিল। বাংলা উপন্যাসের মূল তাই গভীরভাবে বাংলার মাটিতেই নিবদ্ধ ছিল, আর এই মাটিতেই তার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব তাকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল মাত্র।

সমাজজীবনে দিনবদলের পালা রচনা সেদিন যে ঝোড়ো যুগের সূত্রপাত করেছিল, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের আসরে তার স্থায়ী আসন নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমানের স্বয়ম্বরা ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহকাহিনী সমাজে যে দিক-পরিবর্তনের আভাস সূচিত করেছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের বিবাহকাহিনীর সঙ্গে সমমর্যাদায় তার পরিবেশনযোগ্যতা উপলব্ধি সংবাদপত্রের দিক থেকেও সমাজের হৃদস্পন্দন উপলব্ধির দূরদর্শিতা প্রমাণ করেছিল। ব্যক্তিবিশেষের রুচির ওপর নির্ভরশীল সাহিত্যিক প্রয়াস অতি সহজেই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার ক'রে একটি মঙ্গলকাব্য রচনা করতে পারতো, সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মতত্ত্ব প্রকাশকালে ছন্দোবদ্ধ ভাষার আশ্রয়ে কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতাও রচিত হ'তে পারতো। সাধারণ মানুষ আসরে ব'সে সেইসব গান শোনার সময় নিজেদের কথা তার মধ্যে খুঁজে পেতো না, পাওয়ার

চিন্তাও করতো না। কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিল সেই জনসমাজ, তাই, অতি স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের মধ্যে দেবতা, দেবোপম মানুষ অথবা উচ্চশ্রেণীর অভিজাত মানুষদের অপেক্ষা তাদের নিজেদের কথাই তারা সংবাদ-পত্রের মধ্যে বেশি প্রত্যাশা করতো। তাদের এই চাহিদাই সংবদপত্রকে সাধারণ মানুষের জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবতার অভিমুখী ক'রে তুলেছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে কলকাতার ধনকুবেররা যে বিবাহের অনুষ্ঠান করতো, তার সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হ'লেও সেইসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তারা সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতো না। কিন্তু বর্ধমানের মেয়েটির কাহিনী সাধারণ জনজীবন থেকেও উদ্ভূত হয়েছিল, এই ঘটনা প্রত্যহ নানাস্থানে অসংখ্যবার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, কিন্তু বাঙালীর ঘরের অনূঢ়া অরক্ষণীয়া মেয়ের নিজের হাতে ওই ধরণের ঘটনার পরিণতি সাধন অভিনব ব্যাপার ছিল এবং পরোক্ষভাবে একটি সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করছিল। কাহিনীটি তাই ধনী ঘরের ব্যয়বহুল বিবাহকাহিনী অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছিল। এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের কাহিনীই সংবাদপত্র সেবীদের কাছে জনচিত্ত আকর্ষণের বাহন হ'য়ে উঠেছিল। প্রয়োজনের তাগিদে এমনিভাবেই সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাস্তবজীবনের নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী পরিবেশন ক'রে সংবাদ এক-দিকে যেমন নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, তেমনি আর একদিকে জনচিত্তের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে অবাস্তব অলৌকিকতার জগৎ থেকে স্থায়ীভাবে অতি বাস্তব জনজীবনে টেনে আনছিল। রাজা বা সামন্তশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে সাহিত্যকেও তখন বাঁচার তাগিদে জনচিত্তবিমোহিনী হ'য়ে উঠতে এই ধরণের বাস্তব কাহিনাকে আশ্রয় করতে হয়েছিল। কিন্তু সংবাদ-পত্রের উপজীব্য ঘটনা নির্বিচারে কখনও সাহিত্যের আসরে চিরন্তন কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ সংবাদপত্রের আকর্ষণ তাৎক্ষণিক এবং সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন। বাস্তবজীবনের ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণায়ু ঘটনাগুলিই তাই সংবাদ-পত্রের প্রাত্যহিতকার মুখরোচক আকর্ষণ, আর তার মধ্যে যে অংশগুলির মধ্যে চিরন্তন রসাবেদনের আভাস প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে সেগুলিই দীর্ঘজীবী সাহিত্যের উপকরণ রচনা করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের দশকগুলির মধ্যে বাঙালীজীবনে বাস্তবতার আবির্ভাব স্বাগত জানাতে যে সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয়েছিল, বাস্তবজীবনের নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আহরণ

ও পরিবেশন ক'রে সেই সংবাদপত্র যখন বাঙালীর বাস্তবচেতনাকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছিল, সাহিত্যও তখন সেই কাহিনীগুলি থেকেই চিরন্তন রসাবেদনের সূত্র আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হোল। সেই প্রয়াসে যে কাহিনীগুলি ক্ষণকালীন কৌতূহলের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, তারাই সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। বর্ধমানের বিবাহকাহিনীটি তেমনি একটি সাহিত্যিক রসোত্তীর্ণ কাহিনী, সংবাদটি তার ক্ষণকালীন আবেদন ছাড়িয়ে একটি চিরস্থায়ী রসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, সংবাদ তাই সাহিত্য গুণান্বিত হ'য়ে উঠেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দুটি খণ্ডের সংবাদগুলি পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় বর্ধমানের ওই বিবাহকাহিনীটির মতোই সেদিন সংবাদপত্রকে আশ্রয় ক'রে নানা কাহিনীর মধ্যে এই সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সমভাবেই প্রকাশব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল এবং তাদের পারস্পরিক টানাপোড়েনে বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক চালচিত্রটিই যেন রূপ পরিগ্রহ করতে চাইছিল। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত এই যে খণ্ড চিত্রগুলির মধ্যে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হ'য়ে উঠছিল, তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

'বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পীমানসের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া এক সম্পূর্ণ অন্তঃসঙ্গতিবিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর।'[১]

বাংলা উপন্যাসের এই প্রথম অঙ্কুরের পরিচয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করেছিল।

২

উনিশ শতকের ধর্মান্দোলনের প্রথম স্তরে রামমোহনের বলিষ্ঠতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভবানীচরণ। রামমোহনের সংস্কারপ্রয়াসের প্রচণ্ড বিরোধিতা ক'রে সাময়িকপত্রে তীব্রভাষায় তিনি প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। তা'ছাড়া সনাতন হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে তিনি 'ধর্মসভা' স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সভার মাধ্যমে সতীদাহ নিবারণী আইনের বিরুদ্ধে লণ্ডনের 'প্রিভি কাউন্সিলে' আপীল পর্যন্ত

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ. ১৭

করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক রক্ষণশীলতাই ভবানীচরণের একমাত্র পরিচয় ছিল না। 'ধর্মসভা' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র মাধ্যমে তিনি একদিকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্যে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সর্ববিধ প্রয়াস চালিয়েছিলেন, অন্য ঠিক তেমনি সমান গুরুত্বের সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণ কুক্রিয়াসক্ত সমাজকে শোধন করার জন্যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কণ্ঠকিত রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রক্ষণশীল সমাজচেতনা প্রকাশের অনেক আগেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ রচনায় তাঁর সচেতন একটি সাহিত্যচেতনা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। রামমোহনের সঙ্গে মতানৈক্যহেতু তিনি তাঁর 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ, 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী, কিন্তু তাঁর 'বাবুর উপাখ্যান' পত্রাকারে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৯ই জুনের দুই সংখ্যায়, 'শৌকীন বাবু' প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন 'বৃদ্ধের বিবাহ' ৩০শে জুন, 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' ৭ই জুলাই, 'বৈদ্য সংবাদ' ১লা সেপ্টেম্বর আর 'বৈষ্ণব সংবাদ' ১৮২২-এর ২রা মার্চ। সমাজসংস্কারে রামমোহনের বিরুদ্ধতাকল্পে সামাজিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার আগেই তাঁর সামাজিক খণ্ডচিত্রগুলি প্রকাশিত হ'য়ে বাংলা উপন্যাসের আগমনী রচনা করেছিল।

প্রাত্যহিক জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকর্ষণীয় ঘটনা প্রকাশের মতোই সংবাদাকারে ভবানীচরণ বেনামীতে তাঁর প্রথম রচনা 'বাবুর উপাখ্যান' প্রকাশ করেছিলেন। সমকালীন কলকাতার নগরজীবনের নবসৃষ্ট বাবু সম্প্রদায়ের কীর্তিকাহিনীই তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে 'বাবুর উপাখ্যানে' প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত অসৎ পথে অর্থ-উপার্জন ক'রে শিক্ষাদীক্ষাহীন হঠাৎ বাবুর দল অত্যধিক আদরে ও সীমাহীন প্রশ্রয়ে কেমনভাবে সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে তুলতো তারই একটি বাস্তবানুগ যথাযথ চিত্র 'বাবুর উপাখ্যানে' ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কৃতরীতি অনুসরণ ক'রে ভবানী-চরণ তাঁর আখ্যানের সূত্রপাত করেছেন,

'অমরাবতী নগরে রাজ চক্রবর্তী নামে একজন অতি বড় ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন।'

এই অমরাবতী নগর যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কলকাতা শহর, কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তা সহজেই বোঝা যায়। মূর্খ, ধনী পিতার সীমাহীন প্রশ্রয়ে মূঢ় সন্তান কেমনভাবে নিজের পায়ে

নিজে কুড়ুল মারে, মোসাহেবদের নির্লজ্জ চাটুবৃত্তিতে ধনীর মূর্খ সন্তান অথবা আত্মস্ফীত হ'য়ে কিরকম হাস্যকর ব্যবহার করে, অক্ষম ধনীর মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ হ'য়ে চাকরির আশায় সর্বস্ব খুইয়ে কেমনভাবে মানুষ মোসাহেবী করতে বাধ্য হয় আর ইংরেজের ব্যহ্য ব্যবহারের অনুকরণ করতে গিয়ে 'হঠাৎ রাজা'রা কেমনভাবে জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত ক'রে তোলে, 'বাবুর উপাখ্যানে'র ক্ষীণ আখ্যায়িকা সূত্রে ভবানীচরণ আমাদের কাছে তাই তুলে ধরেছিলেন। গ্রন্থটির মধ্যে চরিত্রচিত্রণ এবং আদিমধ্যঅন্ত্যযুক্ত কোন কাহিনী রচনা অপেক্ষা উপরি-লিখিত সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিভিন্ন দিকের বিস্তৃত পরিচয় প্রদানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহ'লেও ওই সামাজিক খণ্ডচিত্রগুলি নায়ক তিলকচন্দ্রের ঐক্যসূত্রে একটা সাধারণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিলকচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রেই ঘটনাগুলি, কিছুটা অসংবদ্ধভাবে হ'লেও, একটি কাহিনীর আভাস দান করেছে। তিলকচন্দ্র তাই উনিশ শতকের প্রথম পাদের ইংরেজ বানিজ্য পুষ্ট অথচ ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বাবুসমাজের প্রথম সাহিত্যিক প্রতিরূপই নয়, তিলকচন্দ্র কাহিনীকেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা গদ্য রচনা অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসের আদি নায়কও। তার মধ্যেই প্রথম সমকালীন মানুষ, কোন দৈবমহিমা অঙ্গীকার ক'রে নয়, সাধারণ মানুষের সর্ববিধ দোষগুণ নিয়েই, একটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে।

তিলকচন্দ্রের জন্মক্ষণ থেকেই মোসাহেবদের নির্লজ্জ চাটুবৃত্তি তার ভবিষ্যৎ বিনষ্টির পূর্বাভাস দান করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই চাটুবৃত্তির দ্বারাই তার জীবনের প্রতিটি স্তর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে মূর্খ ধনী পিতার সীমাহীন প্রশ্রয়। সন্তানের প্রতি দিনে দিনে সে প্রশ্রয় যতোই বাঁধনহীন হ'য়ে উঠেছে, মোসাহেবদের চাটুবৃত্তি ততোই তাকে আরো উদ্দীপিত ক'রে তুলেছে। বাবু ধীরে ধীরে বড়ো হ'য়ে ওঠেন, প্রথম কথা বলতে শিখে কুকথার প্রতি অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখান, শুনে পিতার পারিষদরা কপট আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। আরো বড়ো হ'লে কুকথার সঙ্গে কুকর্ম এসে জোটে। পুলকিত পিতা শিখিয়ে দেন, 'তুমি কহ আমি করি নাই', মোসাহেবরাও সেকথায় পরম আপ্যায়িত হ'য়ে বাবুর জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় পিতা চিন্তা করেন কুলীনের ছেলে, গায়ত্রী শিখলেই চলবে, কষ্ট ক'রে আর লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, 'আমি যাহা রাখিয়া যাইব, যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন, কখন দুঃখ

পাইবেন না। পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে, আমি দেখিতে আসিব না।' চক্রবর্তীর এই দূরদৃষ্টিতে সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন। বাবু তিলকচন্দ্রও লেখাপড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুড়ি, বুলবুলি প্রভৃতি নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। অথচ 'অর্থী ও স্বার্থপর খোসামুদে মিষ্টিমুখো কতকগুলিন দেওয়ানজীর পারিষদলোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।' মোসাহেবদের তোষামোদে পরিতুষ্ট হ'য়ে বাবু একদিন উপলব্ধি করলেন যে, 'ইংরাজী পারসী আরবী-নাগরী-ফিরিঙ্গী-আরমানী ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে' তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে ফেলেছেন। তখন শিক্ষা করার আর কিছু বাকি নাই দেখে তিনি শারীরিক সুখভোগই কর্তব্য ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রে নবধা-লক্ষণযুক্ত 'বাবু' হওয়ার সাধনায় লিপ্ত হলেন। পিতার মৃত্যুর পর অপরিমিত অর্থ হাতে পেয়ে তাঁর সেই 'বাবু'-সাধনার বেগ তীব্রতর হ'য়ে উঠলো। সেই সাধনার মধ্যেই একদিন বাবুর ইচ্ছা হোল তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের পন্থা অনুসরণ ক'রে তিনিও চাকরি করবেন। বিরাট আড়ম্বর সহকারে বাবু চাকরি করতে বেরোলেন। তারপর হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকান ঘুরে ক্লান্ত শরীরে মধ্যাহ্নকালে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। হঠাৎ একদিন বাবুর 'সাহেব' হবার ইচ্ছা হোল। তিনি তখন থেকে সাহেবদের অনুকরণে অশ্বারোহণে প্রাতঃ ও সন্ধ্যা ভ্রমণে বেরোতে সুরু করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আনাড়ী আরোহীকে পিঠে রাখতে ঘোড়ার একদম সম্মতি ছিল না, ফলে রাস্তায় উলটে প'ড়ে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে বাবু বাড়ি ফিরলেন। বাবুর তারপর একদিন সাহেবদের মতো এককথার মানুষ হবার ইচ্ছা গেল। ফলে ভিক্ষুক কি অর্থী-প্রার্থীদের একবার 'না' বললে কোনক্রমেই আর সে কথা ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। সাহেবদের মতো আবার বিবাদ-স্থলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান করতে গিয়ে তিনি অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস-দাসীর প্রতি রেগে উঠে ইংরেজিরকম ঘুষি মেরে 'হামারা পিস্তল লে আও' ব'লে চিৎকার সুরু করেন। রবিবার গির্জাগমনের অনুকরণে তিনি বাগানে গিয়ে নেড়ীর গান, শকের যাত্রা অথবা খেউড় শোনেন। সাহেবদের মতো বাবুর দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করার ইচ্ছা হোল, কিন্তু সাহায্য করতে গিয়ে দুঃস্থব্যক্তির অন্দরমহলে ঢুকে মেয়েরা কোনদিকে থাকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এইভাবে বাবুর নানাবিধ কীর্তি-কাহিনীর পরিচয় দিয়ে পাঠক সাধারণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে লেখক মন্তব্য করেন, 'এই সকল ছাত্তারের নৃত্য কিনা বিবেচনা করিবেন।' লেখকের উদ্দেশ্য এই মন্তব্যেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সমকালীন কলকাতার

মূর্খ ধনীদের আবিল জীবনযাত্রার প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তার থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্যে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

এরপর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে ভবানীচরণ 'বাবুর উপাখ্যানে'র পরিবর্ধিতরূপ 'নববাবুবিলাস' প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে'র খসড়ারূপটি 'নববাবুবিলাসে' একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 'বাবু'র সঙ্গে 'নববাবু'-র পার্থক্য কেবল নামে। দেওয়ান চক্রবর্তী ও রামগঙ্গা নাগ একই উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছিলেন, একই প্রণালীতে সন্তান মানুষ করতে গিয়ে অমানুষে পরিণত করেছিলেন। ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই আলালের ঘরের দুলালে পরিণত হ'য়ে তাঁদের ছেলেরা ভবিষ্যৎ বিনষ্ট ক'রে ফেলেছিল আর সেই বিনষ্টির পশ্চাতে উভয় ক্ষেত্রেই মোসাহেবদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ভবানীচরণের সাহিত্য প্রয়াসকে অবলম্বন ক'রে এমনিভাবেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়কের আবির্ভাব হ'লেও নায়িকার অনুপস্থিতিতে কোন আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত কাহিনী গ'ড়ে উঠলো না। সমাজসচেতন ভবানীচরণ সমকালীন সমাজে পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতা লক্ষ্য ক'রে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের অন্তঃপুরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, বাংলার নারীসমাজ সেদিন প্রচণ্ড অনাচার আর লাঞ্ছনার মধ্যেও শাশ্বত মনুষ্যত্বের যে দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, তাকে যথাযথ-রূপে চিত্রায়িত করার জন্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির আর সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল, রামমোহনের কর্মপ্রেরণায় তার প্রথম প্রকাশ ঘটলেও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলো বিদ্যাসাগরের জীবনে, কর্মে আর সাহিত্যিক প্রচেষ্টায়। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সাধনাতেই প্রথম রূপলাভ করলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম নায়িকা।

৩

বিদ্যাসাগরের লেখনী অবলম্বন ক'রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম *নায়িকার আবির্ভাব হ'লেও একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বিশুদ্ধ সাহিত্য* সৃষ্টির জন্যে বিদ্যাসাগর কোনদিনই কলম ধরেননি। নিতান্ত প্রয়োজনে, বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হিসেবেই তিনি গ্রন্থরচনা সুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের বাংলা

ভাষা শিক্ষা দেবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল, তাই এই গ্রন্থে কোন সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দী মূল অনুসরণ ক'রে মৃত্তিকাতলচারী গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়মের গদ্যরচনার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। বিশুদ্ধ গল্পরস ছাড়া এই গ্রন্থের তাই আর অন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র গল্পগুলির মধ্যে একটা ক্ষীণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। একান্তভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য এক একটি সমস্যার উত্থাপনে ও তার নিরসনে একটি যুক্তিবাদী মনের উপস্থিতি হৃদয়কে না হ'লেও মস্তিষ্ককে, নিশ্চিন্তভাবে আকর্ষণ করে।

'শকুন্তলা'র আকর্ষণ কিন্তু অবিসংবাদিতরূপে পাঠকের হৃদয় দেশে আর সে-হৃদয় সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের আলোবাতাসে গ'ড়ে ওঠা চিরন্তন বাঙালী হৃদয়। 'শকুন্তলা'র রচনাকালে বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সে সময়ে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম্ কাজ হোল সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার-সাধন। টোলের পণ্ডিতদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বিদ্যাসাগর কোনদিন সমর্থন করতে পারেননি, তেমনি সমর্থন করতে পারেননি হিন্দুকলেজের ঐতিহ্য-বিনাশকারী শিক্ষা প্রণালীকে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত-বিদ্যার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে মাতৃ-ভাষার আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করাই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনে' প্রদত্ত তাঁর প্রতিবেদনের প্রথম ধারাটি ছিল, বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন, সমৃদ্ধ ও উন্নত এক বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত (**The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.**) সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্নই উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রে একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা সেদিন তিনি মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাধারার মধ্যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে এমন একটি প্রণালী প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যেখানে সংস্কৃতভাষার অমূল্য সম্পদের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার ঐশ্বর্যের সংমিশ্রণ ঘটবে আর সেই মিশ্রণজাত শিক্ষার ফল বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হ'য়ে তার চরমতম পরিণতি ঘটাবে সমৃদ্ধতর বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিতে। বিদ্যাসাগর তাই শিক্ষাসংস্কারের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সেই শিক্ষা-সংস্কারের জন্যে ভাষা সংস্কার করেছিলেন, আর

ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্যেই পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক রচনা করতে গিয়ে তাঁর শিল্পী হৃদয় তাঁর নিজেরই অজানিতে যেন সার্থক সাহিত্যের বীজ বপন ক'রে ফেলেছিল। 'শকুন্তলা'র মধ্যে বিদ্যাসাগরের সেই সাহিত্যচেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'শকুন্তলা'-কে 'অনুবাদ' ব'লে তাচ্ছিল্য করেছেন,* কিন্তু অপক্ষ-পাত বিচারে 'শকুন্তলা'র মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'শকুন্তলা'-কে কেন্দ্র ক'রেই উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য নারী মানবের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও নারীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। রামমোহনের সতীদাহবিরোধিতা আর পিতৃ-সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃতিতে যার প্রথম প্রকাশ, বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহবিরোধিতা, বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রয়াস আর বহুবিবাহনিরাকরণ চিন্তায়-ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার পরিকল্পনায় সামাজিক ক্ষেত্রে তারই অনুসরণ আর 'শকুন্তলা'র অনুবাদ প্রচেষ্টায় তারই প্রথম সাহিত্যিক প্রকাশ; মধুসূদনের প্রমীলাচরিত্রে, কৃষ্ণকুমারীর মর্মন্তুদ পরিণতিতে আর 'বীরাঙ্গনা'র পত্রাবলীতে ঘটেছে তারই পূর্ণ বিকাশ। পরবর্তী সময়ে তারই পদচিহ্ন ধ'রে ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব।

ভবানীচরণ তাঁর সমসাময়িক সমাজকে কেন্দ্র ক'রে উপন্যাসের বীজ বপন করলেও তাঁর রচনাবলীতে কেবলমাত্র সমাজবিক্ষোভের ফেণরাশিই প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের বহিরঙ্গনে ব'সে ভবানীচরণ যেখানে তার ঢেউ গুণতে চেয়ে-ছিলেন, বিদ্যাসাগর সেখানে তার অতল গভীরে প্রবেশ ক'রে তার ক্লেদ-কর্দমকে দু'হাত দিয়ে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তার গভীর মূলকে টেনে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। সমাজ জীবনে অনাচার আর অশিক্ষার বিষবাষ্পের ব্যাপ্তি লক্ষ্য ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হ'তে পারেননি, উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন তার সেই শাশ্বত মানবিকরূপকে, দুঃখদারিদ্র্যে যা দগ্ধ হয় না, অনাচার অবিচারে যা বিকৃত হয় না, যুগসঞ্চিত সামাজিক কুসংস্কারে যা সামান্যতমও মলিন হ'য়ে পড়ে না। তাই বাবু আর বিবিবিলাসের ক'লকাতার পঙ্ককুণ্ডে দাঁড়িয়েই তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন,

'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'

নারী মানবের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রথম সাহিত্যিক প্রকাশ 'শকুন্তলা'র অনুবাদ চেষ্টাকে কেন্দ্র ক'রেই রূপায়িত হ'য়ে উঠেছিল। তাই 'শকুন্তলা' কেবল অনুবাদমাত্র হ'য়েই থাকেনি, 'শকুন্তলা' হ'য়ে উঠেছিল উনিশ শতকের নবজাগরণক্ষণে মহামনীষীর স্বপ্নকল্পনাজাত আগামীযুগের নারী-মানবের জীবনচরিত। রামের জন্মের অনেক পূর্বেই মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ রচনার মতো 'শকুন্তলা'য় বাঙালী নারীর জীবনে আধুনিকতার স্পর্শ ঘটার অনেক আগেই বিদ্যাসাগর তার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন। 'শকুন্তলা' তাই অতীতের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের ছবি, সুদূর পৌরাণিকযুগের কাহিনীর মাধ্যমে উনিশ শতকের নবজাগরণের ভবিষ্যৎ-পরিণতির সাহিত্যিক প্রকাশ। 'শকুন্তলা' তাই নিছক অনুবাদ নয়, অনুবাদের কাঠামোয় রচিত বাঙালীজীবনের মৌলিক কাহিনী। কালিদাসের 'শকুন্তলা' থেকে ভাবমূর্তি আহরণ করলেও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' তাই এক অভিনব চরিত্র, এক আধুনিকতম নায়িকা।

কালিদাসের নাটকের সঙ্গে নিজের অনুবাদের পার্থক্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কালিদাস থেকে তিনি কেবলমাত্র উপাখ্যানটিই গ্রহণ করেছিলেন,—'এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলিত হইল।' মূলের সঙ্গে তুলনায় অনুবাদের চমৎকারিত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা উচিত ব'লেই বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন,—'যাঁহারা অভিজ্ঞান শকুন্তলা পাঠ করিয়াছেন এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন।' কালিদাস প্রাচীন ভারতের তপোবন কাহিনীকে একটি বিশ্বজনীন রূপ দান করেছেন, চিরন্তন মানবের অনাদি অনন্ত জীবনকাহিনী ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে তাঁর রচনায়, শকুন্তলা তার ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দবেদনায় রাঙা হ'য়ে উঠে মানবজীবনের চিরন্তন জীবনসত্যটিকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে; গ্যেটে তাই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রমুগ্ধ কবিহৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' কিন্তু কোথাও বিশ্বজনীন আবেদনকে বড়ো ক'রে তোলেনি, তাঁর মধ্যে অনুরণিত হ'য়ে উঠেছে বাঙালীজীবনের ক্ষুদ্র গৃহকোণের হর্ষবেদনাময় জীবনকাহিনী। কালিদাসের চিরন্তনী মানবী বিদ্যাসাগরের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে বাঙালী নারীতে, তার বিশ্বজনীন রূপ হারিয়ে গেছে বাঙালী গৃহকোণের ক্ষুদ্র আঙিনায়। আর সেই জন্যেই বোধ হয় বিদ্যাসাগরের খেদোক্তি,—'বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া আমি, কালিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলার অবমাননা করিয়াছি।'

'শকুন্তলা'র মধ্যে, যে-নারীর সম্বন্ধে উনিশ শতকের অভিনব শ্রদ্ধাবোধের প্রথম সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটেছিল, সে-নারী কেবলমাত্র নরের সঙ্গিনী নয়, এমন কি পিতৃপরিচয়ে প্রদীপ্তাও নয়। শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল অপ্সরার রূপোন্মাদ এক মহামুনির ক্ষণিক পদস্খলনে। কিন্তু পিতৃপরিচয়ের কালিমা শকুন্তলাকে হীনপ্রভ ক'রে তোলেনি, বরং তার অপূর্ব রূপরাশি তার মাতাপিতাকে আরও মহনীয় ক'রে তুলেছে। শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণে তাই রাজা দুষ্যন্ত বলেছেন,—'হঁ্যা সম্ভব বটে; নতুবা মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে কখনও, জ্যোতির্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না।' প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে 'শকুন্তলা' বর্তমান সমাজে নারীর বিশিষ্ট স্থান স্বীকার ক'রে তার যথাযথ সম্মান দান করেছে। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনেও রাজা দুষ্যন্তের অসঙ্কুচিতচিত্তে অসামাজিক মিলনসম্ভূতা কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করার ইচ্ছার মধ্যেই উনিশ শতকের মানবাভিমুখী চিন্তাধারার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারার বাহক হ'য়েও এ শকুন্তলা আবার ঐতিহ্যবিচ্ছিন্না নয়, তার পতিগৃহ যাত্রাকালে যে দৃশ্য অভিনীত হ'তে দেখি, তা কেবলমাত্র এককভাবে শকুন্তলার জীবনকাহিনীর একটি স্মরণীয় অধ্যায় নয়, বাংলাদেশের সমাজই যেন সামগ্রিকভাবে তার মধ্যে কথা ব'লে উঠেছে। আগমনী বিজয়া গানে বাঙালীর যে মর্মন্তুদ হৃদয় বেদনা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে স্বর্গের দেবতাকে প্রাণের দুয়ারে টেনে এনেছে, সেই বেদনাই শকুন্তলার পতি-গৃহ যাত্রাকালে প্রকাশিত হ'য়ে তাকে বাঙালী ঘরের চিরন্তন কন্যাটির স্থানে অভিষিক্ত করেছে। কালিদাসের মানসকন্যা বাংলার গ্রামজীবনের পায়ে চলা মাটির পথটি দিয়ে চলতে চলতে আম কাঁঠালের গন্ধে ভরা ভাটপিটালীর বনে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে।

সমকালীন সমাজ ও জীবনের পারিপার্শ্বিকতাকে অঙ্গীকার ক'রে 'শকুন্তলা' বাঙালীর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাস দান করেছে। আপনার প্রাতিভদৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন উনিশ শতকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধারার সংমিশ্রণে যে নতুন সমাজচেতনা আর পারপার্শ্বিকতা গ'ড়ে উঠবে, তাতে বহু যুগ সঞ্চিত বহু প্রাচীন পারিবারিক প্রথা অবলুপ্ত হ'য়ে যাবে; বুঝেছিলেন সামনের দিনে ধর্ম আর কৃষির স্থানে যুক্তি আর শিল্পের স্থানই মানুষের জীবনে বড়ো হ'য়ে উঠবে, মানুষের যুক্তিপ্রবণতা আর শিল্পচেতনা সর্ব-প্রথমে একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে প্রচণ্ডভাবে, আঘাত জানবে। একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ভিত্তিতে যে বাঙালী সমাজজীবন গ'ড়ে উঠেছে, সেই

আঘাতে তাকে প্রচণ্ড এক সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে। এই উপলব্ধির জন্যেই ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগর যেমন একান্নবর্তী পরিবারের বিরোধী হ'য়ে উঠেছিলেন, তেমনি নতুন প্রয়োজনের দাবী মেটানোর জন্যে সমাজজীবনের একটা নতুন কাঠামো গ'ড়ে দিতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর-রচিত 'শকুন্তলা'র নবভাষ্যে আমরা সেই প্রয়াসেরই পরিচয় লক্ষ্য করি।

অভিভাবক বা গুরুজনদের মঙ্গল হস্ত বা রক্তচক্ষু থেকে অনেক দূরে স'রে গিয়ে স্বাধীন সাবালক নায়ক-নায়িকা যখন স্বেচ্ছায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, পূর্বযুগের সম্মিলিত পরিবারের দায়িত্বগুলি তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের দ্বৈতজীবনকেই আশ্রয় করে। গান্ধর্বমতে বিবাহিতা শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেছে, তখন মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে একটি বাণী প্রেরণ ক'রে বলেছেন,

'শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে, স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিনী হইয়াছে ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্মিনীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহ দৃষ্টি রাখিবে।'

এই বিবেচনার অভাব দাম্পত্যজীবনে কি সংকট যে ঘনিয়ে তোলে, শকুন্তলার পরবর্তী জীবনকাহিনীই তার সার্থক দৃষ্টান্ত। শকুন্তলা-দুষ্যন্তের দাম্পত্যজীবনের অবিবেচনা-প্রসূত সঙ্কটকে তীব্রতর ক'রে তোলার জন্যে বিদ্যাসাগর কালিদাস কাহিনীর মধ্যেও কিছুটা পরিবর্তন এনেছেন। দুষ্যন্তের অন্যতমা মহিষী হংসপদিকা বিদ্যাসাগর কাহিনীতে পরিচারিকা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। বহুপত্নীক ব্যক্তির জীবনে কোন একজন বিশেষ স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে দাম্পত্য সঙ্কট গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না ব'লেই বিদ্যাসাগরকে এই পরিবর্তন করতে হয়েছিল। আধুনিক যুগ বহুবিবাহকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ব'লে বিদ্যাসাগর-কল্পিত সেই দাম্পত্য সঙ্কট দ্বৈতজীবনকে কেন্দ্র ক'রে আরও প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী' বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের একটি গোপন বেদনা 'শকুন্তলা'র ভাবাকাশকে আবৃত ক'রে রেখেছে। সেদিন বাংলাদেশের সমাজজীবনের উপরিস্তরে বিভিন্ন চিন্তাধারা আর বিচিত্র চিত্তবৃত্তির আঘাতে যে সংঘাত আর সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠেছিল, তার ফলে পুরুষজীবনে নানা চেতনা ও আদর্শের উন্মেষ ঘটলেও অন্তঃপুরের নারীজীবনে কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সমাজজীবনে সংস্কার আন্দোলনের দ্বন্দ্ব কোলাহলে সেদিন যে অমৃত উঠেছিল, তার সবটুকু পুরুষের ভোগে দান ক'রে নিজকণ্ঠে গরল ধারণ করেছিল হতভাগ্য

নারীসমাজ। নারীজীবনের এই বেদনাকরুণ ট্র্যাজেডিকে বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন ব'লেই তার নিবৃত্তি ঘটাতে বিদ্যাসাগর তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর কর্মজীবন ছিল সেই অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ফলশ্রুতি আর সাহিত্যসাধনা ছিল সেই দুঃখবেদনার করুণ ইতিহাস আহরণের শেষ পরিণতি। কোন কর্মের মধ্য দিয়ে নয়, কেবলমাত্র সহনশীলতার মাধ্যমে জীবনের যে ঋণ সে-যুগের নারী পরিশোধ ক'রে চলেছিল 'শকুন্তলা'র কালিদাস-কাহিনীতে বিদ্যাসাগর তারই একটি সার্থক চিত্র প্রদান করেছেন।

'শকুন্তলা'য় প্রাচীনের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে, তাই আধুনিকযুগের বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রাচীনযুগের অলৌকিকতা-প্রীতিকে বিদ্যাসাগর শোধন ক'রে নিয়েছেন। কাহিনীর ক্রমাগ্রস্থতির জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলায় সেটুকু অলৌকিকতাই প্রশ্রয় পেয়েছে মাত্র। সমগ্র গ্রন্থটিতে একমাত্র পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'এক জ্যোতিঃপদার্থ, স্ত্রী বেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া' শকুন্তলাকে নিয়ে অন্তর্হিত হ'য়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন স্থানেই অবিশ্বাস্য অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেনি।

রাজা দুষ্মন্ত আর তাপসী শকুন্তলার বিরহমিলনের অশ্রুভারাক্রান্ত কাহিনীটিতে রাজা তাঁর রাজৈশ্বর্যের আড়ম্বর নিয়ে কখনও আবির্ভূত হননি, আবার তপোবনও কোথাও তার শাস্তরসাস্পদ জীবনধারা অনুসরণ করেনি, সর্বত্রই বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রগাঢ় ছায়া বিস্তৃত হ'য়ে শকুন্তলা কাহিনীকে বাঙালীরই জীবনকাহিনীতে পরিণত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, কালিদাস-কাহিনীর কাঠামো আর অতিপরিচিত বহু প্রাচীন এই প্রণয়-কাহিনীটির সুপরিচিত নায়কনায়িকার নামগুলি ছাড়া বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'য় প্রাচীন আর বিশেষ কিছু নেই। রাজার রাজন্যমহিমা অপেক্ষা সে-যুগের সম্পন্ন বাঙালী গৃহস্থের জীবনচিত্রই দুষ্মন্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আর শকুন্তলার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রণয়ভীরু গ্রাম্যবালিকার সরল সুন্দর একটি রূপ। দুষ্মন্তের রাজসভায় তাই ধনী বাঙালীর বৈঠকখানা অপেক্ষা আড়ম্বরের প্রাচুর্য নেই আর তপোবন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের একটি খণ্ডাংশ ব'লেই প্রতীয়মান হয়। তাই 'শকুন্তলা' পাঠ করলে বিচক্ষণ পাঠকের মনে অতি স্বাভাবিক-ভাবেই একথা উদিত হয় যে, পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়ে যে মহামনীষী সমকালীন জীবনের পটভূমিকাটি এমন সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, জাতির তন্দ্রাজড়িমা ঘুচিয়ে দেবার জন্যে কর্মবীররূপে আবির্ভূত না হ'য়ে তিনি যদি সাহিত্যকেই আত্মপ্রকাশের একমাত্র বাহন হিসেবে গ্রহণ করতেন, তাহ'লে

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতি কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হোত, সে বিচারে প্রবেশ না ক'রে, একথা নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটতো।

৪

'শকুন্তলা'র মধ্যে বিদ্যাসাগর নারীর সহনশীলতার যে অপরূপ চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, 'সীতার বনবাসে' তা আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'শকুন্তলা'র রচনাকাল থেকে 'সীতার বনবাসে'র রচনাকালে পৌঁছাতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে তাঁর কর্মজীবনে আর তার সঙ্গে সঙ্গে লেখনী চালনাতেও অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম ক'রে আসতে হয়েছিল। সে-যুগের হিন্দু-সমাজ নানাবিধ ধর্মীয় বিধিনিষেধের নাগপাশে নারীজাতিকে আবদ্ধ ক'রে ধর্ম-চেতনার মাহাত্ম্য প্রচারে মুখর হ'য়ে উঠেছিল আর সেই ধর্ম-চেতনার আবরণের আড়ালে পুরুষসমাজের নির্লজ্জ লাম্পট্য আর দুরাচার ধর্মকেই যেন লজ্জা দেবার অপচেষ্টায় প্রমত্ত হ'য়ে উঠেছিল। নারী-সমাজের বেদনা উপলব্ধি করলেও নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত যুবদলের প্রয়াস সংবাদপত্রের স্তম্ভ আলোড়ন ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করতে পারেনি, তাঁদের কর্মশক্তির সিংহভাগই পুরুষজীবনের অশিক্ষা আর অনাচারের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। তার ফলে সমাজের উপরিস্তরে যে সামান্য আলোড়ন উঠেছিল, প্রাচীনপন্থী সমাজ নেতারা তার নিবৃত্তিকল্পে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। নব্য শিক্ষিতরা ইংরেজি শিক্ষার গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে সমাজকে সর্ববিধ কলুষ থেকে মুক্ত ক'রে পাশ্চাত্য জীবন-ধারার সমান্তরাল এক জীবনচেতনার স্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন আর প্রাচীন-পন্থীরা ইংরেজের বনিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের জন্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা অনুমোদন করলেও সমাজজীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবের ঘোরতর বিরোধিতা সুরু করলেন। এই দ্বন্দ্ব কোলাহলের মধ্যে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছিল এক সম্পূর্ণ নতুন পথে। তিনি আধুনিক শিক্ষিতদের মতো যেমন সমাজকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রে রাতারাতি আধুনিক ক'রে তুলতে চাননি, তেমনি প্রাচীন-পন্থীদের জল থেকে হাঁসের দুধ খাওয়ার মতো ইংরেজি শিক্ষা থেকে ইংরেজি ভাষাটুকুর সাহায্য মাত্র নিয়ে আর্থিক উন্নতি-লাভের চিন্তাও করেননি। তিনি বুঝেছিলেন বহুযুগ ধ'রে যে অনাচার আর অত্যাচার বাংলাদেশের নারী সমাজকে নির্জীব আর পঙ্গু ক'রে ফেলেছে, তার

প্রতিবিধান করা না হ'লে জাতীয় জীবনে উন্নতির কোন আশা নেই। তিনি তাই নব্য শিক্ষিতদের মতো কাগুজে আন্দোলন বা প্রাচীনপন্থীদের মতো অর্থ-চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সমাজকে ভেতর থেকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়ে উঠেছিলেন, বিধবা-বিবাহের জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন, বহুবিবাহ নিরাকরণের জন্যে জনমত গঠন করতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই এই সব বিকৃত বিবাহপদ্ধতিকে সমাজ থেকে নির্বাসন দেওয়ার দরকার ছিল। পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নারীজীবনেও শিক্ষার প্রসার না ঘটলে সমাজে শিক্ষার কোন স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা বৃথা; বিদ্যাসাগর তাই নারীকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, সেই শিক্ষালাভের পথের সর্ববিধ বাধাকে দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন, অশিক্ষা আর কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালীসমাজে নারীর ব্যর্থতা আর বঞ্চনাকে চিরতরে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন।

সামাজিক বিধিবিধানের সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর নারীর এই যে দুঃখ-বেদনার নিবৃত্তিকল্পে জীবনপণ ক'রে কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, 'সীতার বনবাসে' সেই দুঃখ-বেদনারই মর্মন্তুদ ইতিহাস রচিত হয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকের চাহিদা মেটানোর জন্যেই বিদ্যাসাগরকে 'সীতার বনবাস' রচনা করতে হয়েছিল, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়েও হৃদয়ের গভীর বেদনার পাষাণ ভারকে বিদ্যাসাগর ঠেলে ফেলে দিতে পারেননি। তাই 'সীতার বনবাস' রামায়ণের শ্রেষ্ঠতম নারী চরিত্রের মাহাত্ম্যবর্ণনা মাত্রই হয়নি, 'সীতার বনবাস' হ'য়ে উঠেছে তৎকালীন বাঙালীসমাজের নারী-মানবের যথার্থতম জীবন ট্রাজেডি।

'শকুন্তলা'র মধ্যে কালিদাস-কাহিনীর যে সামগ্রিক আবেদন, বিদ্যাসাগর তাকেই আধুনিক জীবনের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করেছেন। 'সীতার বনবাসে' তিনি কিন্তু কোন একটি বিশেষ গ্রন্থের কাহিনী ভাগকে অনুবাদের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেননি, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সীতার চরিত্রমাহাত্ম্যটিই আহরণ করেছেন, অর্থাৎ কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রের ওপরই এখানে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন। কেবলমাত্র চরিত্র প্রাধান্যই নয়, এক একটি বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সেই চরিত্রের বিশেষ মানসিক প্রতিক্রিয়ার তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। একটি সুসম্পূর্ণ কাহিনী সৃষ্টির জন্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনা আহরণের মধ্যে তাঁর এই প্রয়াসের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে।

কালিদাসের কাহিনী থেকেই শকুন্তলাকাহিনী গ্রহণ করেছিলেন ব'লে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'য় চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীরও একটা

সুসম ক্রম-পরিণতি ঘটেছে। 'সীতার বনবাসে' তিনি কিন্তু রামায়ণের বিশাল ব্যাপ্ত পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা সুদীর্ঘ সীতা-কাহিনী আনুপূর্বিক প্রচার করতে চাননি, সীতা চরিত্রের অসীম ধৈর্য আর অগাধ সহনশীলতাই 'সীতার বনবাসে' তাঁর একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়। জন্মদুঃখিনী সীতার সান্ত্বনাহীন দুঃখের কারণই তাঁর হৃদয়কে সব থেকে বেশি অভিভূত করেছিলেন। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হবার পর সীতার দুঃখজীবনের সূত্রপাত হ'লেও অশোকবনে বন্দিনী সীতার যে দুঃখ, তার সামনে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল প্রত্যাশাভরা সম্ভাবনা ছিল। লঙ্কার চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে রামচন্দ্রের অগণিত সেনানী নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনা করেছে, রাক্ষসকুলের শোকোচ্ছ্বাস তীব্র ক'রে প্রতিদিন নতুন নতুন মৃত্যু সংবাদ সীতার বন্ধনদশার অন্তিম মুহূর্ত ত্বরান্বিত ক'রে তুলছে। অসীম আশার আলোকে সম্মুখের দিকৃচক্রবাল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে ব'লে বন্দীদশা সীতাকে বিন্দুমাত্র মুহ্যমান করতে পারেনি। কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় রাজা রামচন্দ্র যখন লোকাপবাদভয়ে পূর্ণগর্ভা সীতাকে নির্বাসন দিলেন তখন সীতার সামনে শুধু অন্তহীন দুঃখ-বেদনার সীমাহীন মরুভূমি বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো। এই বনবাস শেষ হবার কোন আশা নেই, রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলনেরও কোন সম্ভাবনা নেই, জীবনের সব মাধুর্যকে ঢেকে দিয়েছে দুঃখের আঁধার রাত্রি। রাবণ সীতাহরণ করেছিল ব'লে তাকে হত্যা ক'রে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করেছিলেন, রাবণের পতনে তাই রাম সীতার মিলনপথের বাধা অপসারিত হয়েছিল। কিন্তু রাজা রামচন্দ্র যখন স্বেচ্ছায় সীতা-বিসর্জন দিলেন, লোকাপবাদ ভীত রামচন্দ্র তখন অপবাদের বায়বীয় বাধা অপসারণের জন্যে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, বরং তারই যূপকাষ্ঠে দাম্পত্য শান্তিকে বলিদান দিয়ে রাজন্য মহিমার মাহাত্ম্য প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসিতা সীতার চতুর্দিকে রাক্ষসীরা প্রহারোদ্যত হ'য়ে নেই, কিন্তু খাড়া হ'য়ে আছে সামাজিক বিধি-বিধানের দুস্তর বায়বীয় প্রাচীর। সীতার এই নির্বাসিত জীবনটিই বিদ্যাসাগরের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ব'লে মনে হয়েছিল, কারণ সীতা-জীবনের এই অংশটির মধ্যেই সে-যুগের অসম সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণে নিপীড়িতা নারীমানবের অসীম নৈরাশ্যভরা নিরুদ্ধ অন্ধকারময় জীবনকাহিনীটি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা ছিল। 'সীতার বনবাস' তাই রামায়ণের নায়িকাশ্রেষ্ঠার জীবনবেদনার বঙ্গানুবাদই নয়, উনিশ শতকের নবজাগরণক্ষণে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে উপরিস্তরের বিক্ষোভের অভ্যন্তরে নারীজীবনে যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হ'য়েছিল. 'সীতার বনবাস'

তারই সাহিত্যিক মহাভাষ্য হ'য়ে উঠেছিল। তাই বিভিন্ন মূলগ্রন্থ থেকে আহরণ ক'রে বিদ্যাসাগর সমকালীন নারীজীবনের দুঃখ-বেদনার প্রতিরূপ হিসেবেই সীতা-চরিত্রের নৈরাশ্যভরা অন্ধকারময় জীবনের পরম সহনশীলতাকেই পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন 'সীতার বনবাসে'।

লোকাপবাদভীত রামচন্দ্র স্বেচ্ছায় নিরপরাধী সীতাকে নির্বাসন দিলেও কাহিনীর মূল দ্বন্দ্ব রামচন্দ্রের নির্দয়তা আর সীতার সহনশীলতাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠেনি। হৃদয়হীন সামাজিক বিধিবিধানের সুকঠিন নিষ্পেষণে সীতা ও রামচন্দ্র দুজনেই সমানভাবে নিপীড়িত হয়েছেন। সমাজ এখানে প্রতিপক্ষের রূপ ধ'রে রাম-সীতার মাঝখানে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর গ'ড়ে তুলেছে। আর সেই সামাজিক অনুশাসন বাসা বেঁধেছে রাম-সীতার মনে। মূল দ্বন্দ্ব তাই এখানে বাইরে থেকে অন্তরের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। সীতার লোকাপবাদ শুনে রামচন্দ্র চিন্তা করছেন,

'এখন কি করি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া, এই অপবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করি; অথবা, এজন্মের মত নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জন দিয়া কুলের কলঙ্ক বিমোচন করি; কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয়সঙ্কটে পড়ে না।'

'সীতার বনবাস'ই বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম আত্মবিশ্লেষণের সূচনা করেছে। কাহিনীর মূল দ্বন্দ্ব এখানে যেমন বহিরঙ্গীয় কর্মকাণ্ডের পথ পরিত্যাগ ক'রে মানুষের অন্তরকে আশ্রয় করেছে, দুঃখ-বেদনা বা আশা-আনন্দও তেমনি আত্মবিশ্লেষণের পথেই প্রকাশিত হয়েছে। কৌশল্যার আমন্ত্রণে ও শিবিকাযান প্রেরণে সীতার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, বাইরের কোন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রকাশ রূপলাভ করেনি, বিচিত্র সম্ভাবনার কল্পনায় সীতার অন্তরই কলাপের মতো বিকশিত হ'য়ে উঠেছে,

'রামের সহিত সমাগম হইলে যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একবার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আরবার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্নেহভরে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমানভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; একবার বোধ করিলেন, যেন প্রথম সমাগমক্ষণে উভয়ই জড়প্রায় হইয়া স্থির

নয়নে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে ; আরবার বোধ করিতে লাগিলেন যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া, পরস্পর দীর্ঘ বিরহকালীন দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে অপরিজ্ঞাতরূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল।'

চরিত্রবিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের যে স্বরূপ আবিষ্কার আধুনিক উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে' আমরা তার প্রথম অস্ফুট প্রকাশ লক্ষ্য করি। বর্ণনা আর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাসে' মানবজীবনের অপ্রতিবিধেয় দুঃখনিয়তির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের গভীর গহনে সুপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দ-বেদনাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ক'রে মানুষের একটি পরিপূর্ণ ছবি দেবার চেষ্টা করেছেন।

'শকুন্তলা'য় বিদ্যাসাগর মূল কাহিনীর অলৌকিকতা বাদ দিয়ে কাহিনীতে অধিকতর বাস্তবতা আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়াসে 'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগর আরও সাহসী হ'য়ে উঠেছেন। সীতার কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে পাতাল প্রবেশে তাঁর অন্তিম পরিণতির কথা। বাল্মীকি রামায়ণে সীতার শপথ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাতাল প্রবেশের কাহিনীটি এমনভাবে সংঘটিত হয়েছে যে, সর্ব-প্রকার অবিশ্বাস্যতার উর্ধ্বে তা একটা নাটকীয় ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্যতায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর সেই নাটকীয়ত্বের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে দুঃখবেদনাকাতর সীতার স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা ক'রে কাহিনীটির বাস্তবতা যেমন বজায় রেখেছেন, তেমনি নারী জীবনের চরমতম বঞ্চনাকে অলৌকিক মাহাত্ম্যের আবরণে ঢেকে দিয়ে, তার দুঃখের তীব্রতাকে ভক্তির ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে হ্রাস করার পরিহাসপ্রবণতাও দমন করেছেন। 'সীতার বনবাস' তাই রাঘব গৃহিণী সীতার কাহিনী হ'য়েও বাংলাদেশের অসম সমাজ ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত নারীজাতির দুঃখবেদনার জীবন্ত বিগ্রহ হ'য়ে উঠেছে।

পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সংস্কৃত মূল থেকে অনূদিত হ'লেও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' আর সীতার বনবাস' বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাপথে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ক'রছিল। বাংলা উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত এখানেই প্রথম পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তার আগে বাংলা কথা সাহিত্য ছিল নায়িকাহীন নাবালক, বিদ্যাসাগরই সেখানে প্রথম-নায়িকা সমাগম ঘটিয়ে তাকে কৈশোরের অনুপলব্ধি থেকে যৌবনের পরিপূর্ণতায় মুক্তি দিয়েছিলেন। ভবানীচরণ তাঁর 'বাবু' জাতীয় নক্সাগুলিতে এবং বিলাসাখ্য রচনাত্রয়ীতে বাংলা

উপন্যাসের নায়কের প্রথম আবির্ভাব সূচিত করেছেন আর বিদ্যাসাগর তাঁর 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে' প্রথম বাংলা উপন্যাসের চিরন্তনী নায়িকাকে সৃজন করেছেন। অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ধারায় এই আদি নায়ক ও নায়িকাই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হ'য়ে আসছে। ভবানীচরণের সংসারবিরক্ত ও সাংসারিক জ্ঞানবির্বজিত নায়ক আর বিদ্যাসাগরের সর্বংসহা স্নেহময়ী নায়িকাই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতি আধুনিককাল পর্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিভিন্ন পরিবেশে আবির্ভূত হ'য়ে এসেছে।

৫

বিদ্যাসাগরের সারস্বতপ্রেরণার আলোচনায় এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন,

'তাঁহার রচিত সাহিত্য তাঁহার কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, তাহার পরে কর্মের আর যাওয়া সম্ভব নয়। কর্ম যেখানে থামিয়াছে, সাহিত্যের সেখানে সূত্রপাত হইয়াছে।[১]

বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের কয়েকটি রচনা, বিশেষভাবে, 'ভ্রান্তিবিলাস' সম্বন্ধে এই মন্তব্য যথার্থ ব'লেই মনে হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ভ্রান্তিবিলাসে'র রচনাকালে বিদ্যাসাগর যেন ধীরে ধীরে তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে হৃদয় লোকের অভ্যন্তরে স'রে আসছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মপ্রেরণামূলক হ'লেও 'ভ্রান্তিবিলাস' তাই তার আশ্চর্য ব্যতিক্রমরূপেই আবির্ভূত হয়েছিল। কোন সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে নয়, পাঠক সাধারণকে সাহিত্যের নির্মল আনন্দ পরিবেশনের জন্যেই বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেছিলেন। 'বিজ্ঞাপনে' তিনি নিজেও এই বক্তব্যই সমর্থন করেছেন,

'কিছুদিন পূর্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সংকলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।'

বিদ্যাসাগরজীবনে এই ভ্রান্তিবিলাসেই সমালোচক বর্ণিত কর্মের স্বাভাবিক

[১] প্রমথনাথ বিশী—বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, প্রথম সংস্করণ, পৃ· ॥৶৹

সীমা প্রথম অতিক্রান্ত হয়েছে ব'লে মনে হয়, তাই এখানেই যথার্থ সাহিত্যের সূচনা হয়েছে বলা চলে। এই যথার্থ সাহিত্যের সূত্রপাত ক'রে বিদ্যাসাগর কর্মের স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘনের কেন চিন্তা করেছিলেন, তার কারণ অনুসন্ধান করলে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যমানসের প্রকাশব্যাকুলতার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সামাজিকও সাহিত্যিক প্রেরণার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়।

'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র রচনাকাল বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন লগ্নেই বলা চলে। বাংলাদেশের সমাজ জীবন তখন বিদ্যাসাগরের সংস্কারচিন্তার চতুর্দিকেই আবর্তিত হচ্ছিল। সব্যসাচীর মতো দুই হাতে শরচালনা ক'রে তিনি একদিকে প্রাচীন, অন্যদিকে অতি আধুনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন বাঙালীজাতির ভিত্তি রচনায় সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে তখন নবজাগরণের কলকোলাহল, দেশের মাটি তখন সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টায় উর্বরা, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা আর চিন্তাপদ্ধতি তখন বিদ্যাসাগরের সর্ববিধ সংস্কার প্রয়াসে অফুরন্ত প্রেরণা দান ক'রে চলেছে।

কিন্তু এই পরিবেশ যেন অতি দ্রুত পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। পাশ্চাত্য-শিক্ষার উদার আদর্শের তলদেশ থেকে উগ্র স্বাজাত্যাভিমান আর ঐতিহ্য প্রীতির প্রকাশ বাংলার নবশিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে যেন আবৃত ক'রে ফেললো। 'ইয়ংবেঙ্গলে'র ঐতিহ্যবিনাশী জীবনচেতনার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা কিছু প্রাচীন আর হিন্দু তাই তর্কাতীত ভক্তির বস্তু হ'য়ে দাঁড়ালো। উনিশ শতকের প্রারম্ভে যে মানবতাবোধ যুক্তিবাদ ও নির্মোহ জ্ঞানের অন্বেষণে বাহির হ'য়ে বাঙালীজীবনে নবজাগরণের সূচনা করেছিল, অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই সেই প্রবণতায় শৈথিল্য দেখা দিল, দিকপরিবর্তন ক'রে সে রোম্যান্টিক জাতীয়তাবাদের পথে পা বাড়িয়ে দিলে। বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনার প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেল। নির্মোহ যুক্তি আর প্রখর বাস্তবজ্ঞানকে সম্বল ক'রে যিনি পথে নেমেছিলেন, রোম্যান্সের বর্ণাঢ্য পথে যেন তাঁর প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গেল। তথাপি তখনও তিনি বহু বিবাহনিবারণের জন্যে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নবীন চিন্তানায়করা তখন তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ সুরু ক'রে দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিরও তাঁকে 'ডন কুইক্‌সোট' ব'লে ব্যঙ্গ করতে সম্ভ্রমবোধে আটকাচ্ছিল না। সমকালীন সমাজের এই প্রবল প্রতিকূলতা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের গতি কিছুটা মন্থর ক'রে দিয়েছিল। ফলে, এইসময় থেকেই, কোন প্রয়োজনে

নয়, বিশুদ্ধভাবে পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যেই তিনি কয়েকটি গ্রন্থরচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর মৌলিক রচনার প্রায় সবগুলিই এই সময়ের পর থেকেই রচিত হ'তে থাকে। 'ভ্রান্তিবিলাস' এই সময়েরই রচনা। 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনার পিছনে তাই কোন সামাজিক প্রেরণা ছিল না, বিদ্যাসাগর মানসের সারস্বতপ্রেরণাই প্রধানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

কিন্তু প্রেরণা যাই হোক না কেন, 'ভ্রান্তিবিলাস'ও অনুবাদ। যে অনুবাদ প্রাধান্যের জন্যে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের সারস্বত সাধনাকে স্থান দিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি, এই 'ভ্রন্তিবিলাস'ও সেই অনুবাদ। বিদ্যাসাগর নিজেও এই অনুবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য সচেতনতাই তাঁকে এই অনুবাদে প্রবৃত্ত করেছিল। সাহিত্যজগতে সচেতনভাবে কোনদিনই তিনি স্রষ্টার স্থান গ্রহণ করতে চাননি, 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনার সময়ও তাঁর সেই উদ্দেশ্য ছিল না। তবে অন্যান্য রচনার সঙ্গে এর পার্থক্য হোল, অন্যান্য রচনাগুলির পিছনে যেমন সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল, 'ভ্রান্তিবিলাসে'র পশ্চাতে সেরকম কোন উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল না, সাহিত্যপাঠজনিত নির্মল আনন্দ থেকেই এর উৎপত্তি। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'কমেডি অফ এরার্স' পাঠ ক'রে তাঁর যে আনন্দ হয়েছিল সেই আনন্দই তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। তাই 'ভ্রান্তিবিলাসে' অবচেতন মনে তাঁর সৃষ্টিকামী প্রতিভার জাগরণ ঘটলেও সচেতনভাবে তিনি পাঠকমাত্র।

এই পাঠক বিদ্যাসাগর 'কমেডি অফ এরার্স' পাঠ ক'রে কাহিনীটির প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণবোধ করেছিলেন। বুঝেছিলেন হাস্যরসাত্মক রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা কাহিনীর উদ্ভটত্বেরই আকর্ষণ বেশি। তাই অন্যান্য নাটকে কবিত্ব-শক্তির যতোই প্রকাশ ঘটুক না কেন, 'কমেডি অফ এরার্সে' শেকসপীয়ার নানা উদ্ভট ঘটনার সংযোজনায় এমন একটি উতরোল হাস্যাত্মক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন যে, কবি অকবি, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছেই তা পরম উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। উপভোগ্যতার এই সর্বজনীনতার জন্যেই বিদ্যাসাগর 'কমেডি অফ এরার্সে'র বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাস' হোল সেই বঙ্গানুবাদ।

বঙ্গানুবাদ বটে, কিন্তু বিচিত্র ধরণের বঙ্গানুবাদ। বৈচিত্র্য প্রাধান্যের জন্য 'ভ্রান্তিবিলাস' মৌলিক বঙ্গানুবাদ হিসেবেও পরিচিত হ'তে পারে। 'শকুন্তলা'র গদ্যানুবাদ দিয়ে মৌলিক নাটকের বর্ণনাত্মক বঙ্গানুবাদে বিদ্যাসাগরের প্রথম

কৃতিত্ব এসেছিল আর নানাবিধ ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গানুবাদে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। এই দুইএর সংমিশ্রণ ঘটেছে 'ভ্রান্তি-বিলাসে'। সেখানে তিনি নাটকের গদ্যানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিভাষার সাহিত্যসৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছিলেন। তথাপি 'ভ্রান্তিবিলাসে'র কৃতিত্ব অনুবাদ হিসেবে বিচার্য নয়। 'ভ্রান্তিবিলাস' বিচারে একটা ভিন্ন মাপকাঠিই আমাদের গ্রহণ করতে হয় এবং তা যে আমাদের একদিন গ্রহণ করতেই হবে, তা বিদ্যাসাগরও বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই 'শকুন্তলা'র অনুবাদে নিজের অযোগ্যতা ঘোষণা ক'রে তিনি যেখানে বলেছিলেন, 'বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি,' 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভূমিকায় তিনি সেখানে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক কৃতিত্ব দাবী ক'রে লিখেছিলেন, 'যদি ভ্রান্তিবিলাস পড়িয়া এক ব্যক্তিরও চিত্তে কিঞ্চিৎমাত্র প্রীতিসঞ্চার হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব'। এই বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি 'ভ্রান্তিবিলাস' অনুবাদের জন্যে বিদ্যাসাগরকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তার জন্যে সাফল্যের কিছু পারিশ্রমিক তিনি আশা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সে আশা কিছুটা পূর্ণও হয়েছিল। 'ভ্রান্তিবিলাস' সে-যুগের অনেক পাঠকের কাছে উপন্যাস হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। জীবনীকার বিহারীলাল স্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছিলেন, 'ফলতঃ ভ্রান্তিবিলাস একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস হইয়াছে।' 'ভ্রান্তিবিলাসে'র পূর্বে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল,' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' এবং বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বাঙালীর ঘরের কাহিনী যতোটা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে ততোটা সাহিত্য গুণান্বিত হ'য়ে ওঠেনি। তাই সমকালীন জীবনের একটা বাস্তব প্রতিবেদন এবং কিছুটা আদর্শবাদী উপদেশ নিয়ে আলাল একটা সীমাবদ্ধ পরিধির বাইরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই আলালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 'ভ্রান্তিবিলাস'কে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাসে বাংলাসাহিত্যের এক নতুন দিক উন্মোচিত হ'লেও বাঙালীজীবনের সার্থক প্রতিবিম্বন সেখানে ঘটেনি। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'য় ষোড়শ শতাব্দীর দূর ইতিহাসের রঙিন রোম্যান্সের মধ্যে সাধারণ বাঙালীজীবনের কোন প্রকাশ ঘটেনি, মোগল পাঠানের সংঘর্ষে অথবা সেনাপতি ও সামন্ত

শ্রেণীর মন দেয়া-নেওয়াতে সাধারণ বাঙালী পাঠক পথিপার্শ্বস্থ দর্শক মাত্র, সেখানে তাদের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। 'মৃণালিনীর' পটভূমিকা আরও দূরবর্তী। দ্বাদশ শতাব্দীর আলো আঁধারে সেনরাজার পরাভবে বাংলাদেশে তুর্কী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা আজ ইতিহাসের বস্তু মাত্র, সাধারণ জীবনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। তাই একটি অসফল বাস্তব-কাহিনী আর তিনটি রোম্যান্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রেই বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'কে পাঠকচিত্ত জয় করতে হয়েছিল।

পাঠকসমাজে কথাসাহিত্য হিসেবে গৃহীত হ'য়ে 'ভ্রান্তিবিলাস' যে সমাদর লাভ করেছিল, শেকস্‌পীয়ারের কাহিনীর ভাবানুবাদ ব'লে সে সমাদরে কোন ঘাটতি হয়নি। কারণ, আগেই দেখেছি, বাঙালীর সমকালীন সমাজজীবন তখনও কথাসাহিত্যের জগতে উপস্থিত হয়নি। প্রতিটি গ্রন্থের কাহিনীই পাঠকের কাছে অপরিচিত জগতের বস্তু ছিল, তা তার উৎস প্রাচীন ইতিহাস বা ঐতিহাসিক তত্ত্বই হোক অথবা বিদেশী কাহিনীর ভাবানুবাদই হোক।

কিন্তু তা সত্বেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'ভ্রান্তিবিলাসে'র একটি গুরুত্ব-পূর্ণ আসন নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। 'ভ্রান্তিবিলাস'ই প্রথম বাংলা উপন্যাসের ভাষা-রীতি নির্ণয় ক'রে দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অত্যধিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ আনলেও তাঁর নিজের উপন্যাসগুলিতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের আধিক্যে মাঝে মাঝে বক্তব্যবিষয়কেও ঝাপসা ক'রে তুলে-ছিলেন। প্যারীচাঁদের ভাষারীতি ফারসী শব্দের বাহুল্যে আর সাধুচলিতের মিশ্রণে এমন এক কৃত্রিম ভাষা হ'য়ে উঠেছিল যে, লেখকের বক্তব্য উপলব্ধির জন্যে মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হয়। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভাষা কিন্তু স্বচ্ছ, সাবলীল, সঙ্গতিপূর্ণ এবং সর্বজনবোধ্য। 'ভ্রান্তিবিলাসে' বাংলা সাধু ভাষার প্রাণশক্তির প্রথম যে প্রকাশ ঘটেছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসবলীতে আমরা তার চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করি। বাংলা কথ্য ভাষার ভিত্তিতে সেই সাধু ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে পরবর্তী যুগে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অভিশ্রুতি পরিবর্তনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এই ভাষার আদলেই বর্তমান চলিত ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'কে তাই অনায়াসে চলিত ভাষায় পরিবর্তন ক'রে নেওয়া যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তা সহজসাধ্য নয়।

৬

বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের শেষদিকে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন যে, এদেশের সমাজসংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই, শাস্ত্রপ্রমাণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই ; তথাকথিত শিক্ষিত পণ্ডিতসমাজে কেবলমাত্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর কটু ভর্ৎসনার মাধ্যমে নিজ বক্তব্য প্রমাণের অসদুদ্দেশ্যই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তাই তাঁর শেষজীবনের গ্রন্থগুলিতে তিনি কেবল শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিদের বোধগম্যতার দিকে নজর না দিয়ে আপন বক্তব্যকে সাধারণ সাক্ষর মানুষের উপলব্ধিগম্য ক'রে উপস্থাপনার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাই সেক্ষেত্রে তিনি কেবল যুক্তি বা প্রমাণের ওপরই নির্ভর না ক'রে ছোট ছোট গল্পের অবতারণা ক'রে সাধারণ মানুষকে নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে চাইতেন। গল্পগুলির ঘনপিনদ্ধ গঠনরীতি, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী প্রকাশভঙ্গী এবং চমক লাগানো আকস্মিক পরিণতি আমাদের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পৃষ্ট ছোটগল্পগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সচেতনভাবে তিনি যেমন উপন্যাস রচনা করতে চাননি, তেমনি ছোটগল্প রচনার চিন্তাও তাঁর মনে জাগেনি। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে গিয়ে অবচেতনভাবে তিনি যেমন বাংলা উপন্যাসের বক্তব্যবিষয় এবং প্রকাশরীতির একটা ক্ষীণ আভাস দান করেছিলেন, নানা বিষাদাত্মক এবং হাস্যরসাত্মক গল্পের অবতারণা ক'রে তিনি বাংলা ছোটগল্পেরও একটা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করতে পারি। বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে ধর্মের নামে কুলীন ব্রাহ্মণদের জঘন্য অধর্মাচারের পরিচয় দিয়ে বিদ্যাসাগর একটি গল্পের অবতারণা করেছেন,

'অমুক গ্রামে, অমুক নামে, একটি প্রধান কুলীন ছিলেন। তিনি তিন চারটি বিবাহ করেন। অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মে। কন্যারা, জন্মাবধি, মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন, এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কোনও কালে, তাহাদের কোনও তত্ত্বাবধান করিতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের বিবাহ কার্য নির্বাহ করতে পারেন নাই। প্রথমা কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ

পাইলেন ; এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি, গলদশ্রুলোচনে, আকুল বচনে, কহিতে লাগিলেন, ভাই, এতকালের পর, আমায় কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন ; আর আমার জীবনধারণ বৃথা ; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবেন কেন। আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যাপহারীর শরণাগত হইলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিন মাসের জন্য, কন্যা দুটি দেন ; আমি তিন মাসের মধ্যে উহাদিগকে আপনার নিকট পঁহুছাইয়া দিব। কন্যাপহারী যাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীন ঠাকুরের কাতরতা দর্শনে ও আর্তবাক্য শ্রবণে অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য, সেই দুটি কন্যাকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করাইলেন। তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন, এবং এক ব্যক্তি, অঘরে বিবাহ দিবার জন্য, চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল ; অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার করিয়া দিলেন। কন্যারা না পলায়ন করিতে পারে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সেই রক্ষক, সর্বক্ষণ, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কুলীন ঠাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন ; এবং একমাস পরে, ভাদ্র মাসের শেষে, বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ পূর্বক, এক ষষ্ঠিবর্ষীয় বর সমভিব্যাহারে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বর, কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে, সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু, অগ্রে কোনও অংশে আপত্তি উত্থাপন বা অসম্মতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়, উপস্থিত সর্বজন সমক্ষে, অম্লান মুখে কহিলেন, আমি শুনিলাম, এই দুই কন্যা অতি দুশ্চরিত্রা ; আমি ইহাদের পাণিগ্রহণ করিব না। কন্যাকর্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিয়মিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই এই অসম্মতি প্রদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সামান্যরূপ বাদানুবাদ ও উপরোধ অনুরোধের পর, বর, আর বার টাকা পাইলে বিবাহ করিতে পারেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কন্যাকর্তা, এক বিঘা ব্রহ্মত্রভূমি বন্ধক রাখিয়া, বার টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ করিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্বিবাদে, কন্যাদ্বয়ের সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুলীন ঠাকুরের কুলরক্ষা

হইল। যাঁহারা বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কুললক্ষ্মী বিচালতা হইলেন না, এই আনন্দে ব্রাহ্মণের নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি, আর কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লইলেন না; এবং সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। তাঁহারা পিতার কুলরক্ষা করিয়াছেন; অতঃপর তাঁহারা যথেচ্ছ-চারিণী বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধর্ম অনুসারে আর তাঁহাদের পিতার কুলোচ্ছেদের বা কলঙ্ক ঘটনার আশঙ্কা ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাঁহার নিকট পঁহুছাইয়া দিবেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত সময় উত্তীর্ণপ্রায় হয়। এজন্য, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদার-চরিত কুলীন ঠাকুর, সেই দুই কন্যা লইয়া, কন্যাপহারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই কুলপালিকাদিগকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ পূর্বক, তদীয় দয়া ও সৌজন্যের প্রশংসাকীর্তন, ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক, প্রতিশ্রুত সময় মধ্যে, কন্যাপ্রত্যর্পণপ্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ, ও আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া, প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সে যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া, লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে, কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আস্পদ নহেন।'

বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রাবল্য ঘটলে প্রাচীনপন্থী ধর্মধ্বজীরা সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা ক'রে প্রচার চালাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হ'লে কুলীন ব্রাহ্মণের জাতিপাত ও ধর্মনাশ ঘটবে। বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং সমাজজীবনের গতিধারা বিশ্লেষণ ক'রে বর্তমান যুগে বাঙালী ব্রাহ্মণের কৌলীন্য যে সামান্যতমও অবশিষ্ট নেই সে কথা প্রমাণ করেছিলেন। বর্তমান গল্পটিতে তার সঙ্গে সঙ্গে কৌলীন্যপ্রথা কেমনভাবে সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচারে পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে চলেছিল তার একটি জীবন্ত উদাহরণ দিয়েছেন। বহুবিবাহের সমর্থনকারী পণ্ডিতরা বহুবিবাহবিরোধী আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি খাড়া ক'রে বলেছিলেন বহুবিবাহ প্রথা রহিত হ'লে ভঙ্গ-কুলীনদের সর্বনাশ হবে। ভঙ্গকুলীনদের উৎপত্তি, তাদের গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি বিচার ক'রে বিদ্যাসাগর ভঙ্গকুলীনদের

সর্বনাশ হবার মতো যে আর কিছু বাকি ছিল না তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছিলেন। এই সত্য ঘটনা বিবৃত ক'রে বিদ্যাসাগর, তার সঙ্গে সঙ্গে, ভঙ্গকুলীনদের বিবাহ ব্যবসা কেমন ক'রে সমাজে অবর্ণনীয় দুর্নীতির পরিপোষকতা ক'রে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার অশালীন ও অমানবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, আর উদাহরণ দিয়েছিলেন,

'কোনও ব্যক্তি, মধ্যাহ্নকালে, বাটীর মধ্যে আহার করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দু'টি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুরবস্থার একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাঁহাদের মুখে বিষাদ ও হতাশার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইঁহারা কে, কি জন্যে এখানে বসিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি চট্টরাজের স্ত্রী, এবং অল্পবয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি তাঁহার কন্যা। ইঁহারা, তোমার কাছে, আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন।

চট্টরাজ দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীন; ৫।৬টি বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান; এজন্য, তাঁহার যথেষ্ট খাতির রাখেন। তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকেন, তাঁহার কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

সেই দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহার বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট্টরাজের ভার্যা; এটি তাঁহার কন্যা, আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছুদিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি তোমাদের দুজনকে অন্নবস্ত্র দিতে পারিব না। আমি বলিলাম, বাছা বল কি; আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী; তুমি অন্ন না দিলে, আমরা কার কাছে যাইব। তুমি একজনকে অন্ন দিবে, আর একজন কোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া, পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্নবস্ত্র, যেরূপে পারি, দিব; উহার ভার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেশ্যা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানি না; তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত আমার বিষম মনান্তর ঘটিয়া উঠিল; এবং অবশেষে, আমায় কন্যা সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

কিছুদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তুত ভগিনীর বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কর্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২।৪ দিন পূর্বে, তাঁহারা পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, কি করি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান, চটের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন ; তাঁহার দয়া ধর্মও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী ; কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম, বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যতদিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণ পোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে, আমি আহ্লাদে গদ্গদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল, এই বলিয়া, তাঁহারা, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন। সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। একদিন আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন ; মাস মাস, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন ; আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

এইরূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই, এবং দুরবস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্নবস্ত্র দিতে, পারিব না। অনেকে বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পারে, এজন্য এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রু-

পাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি চট্টরাজের বাটীতে গিয়া, যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি, কোন বিবেচনায়, তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কিনা, স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া, বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন, তুমি বাটীতে যাও, আমি ঘরে বুঝিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি।

অপরাহ্নকালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহা-দিগকে বাটীতে রাখিতে পারি। ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, এইরূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব; এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল। আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া, গৃহ প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা দুর্দান্ত দস্যু; তাঁহাদের ভয়ে, ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী কন্যাকে পূর্বোক্ত নির্ঘাত জবাব দিয়াছিলেন। বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন। চট্টরাজ, কখনও, কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই কারণে, কস্মিনকালেও আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয়, ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, বাটীতে গিয়া, তিনি, সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে; আর তাহা কোনও কারণে রহিত হইবার নহে; তদনুসারে, চট্টরাজ, ভগিনীদের উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারও, গত্যন্তর-বিহীন হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং জননীর সহিত, স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।'

যুক্তি নয়, তর্ক নয়, বাস্তব সত্য ঘটনার বিবৃতি। কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না, মিথ্যা ব'লে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না, কারণ এ ঘটনার সাক্ষী স্বয়ং বিদ্যাসাগর, বৃত্তিদাতা ব্যক্তি স্বয়ং তিনি নিজে আর চট্টরাজ তাঁরই বাল্যজীবনের গুরু কালীকান্ত। কিন্তু ঘটনার সত্যাসত্যবিচার অন্য প্রসঙ্গ, এক্ষেত্রে আমরা ঘটনাটির পরিবেশনভঙ্গী লক্ষ্য করতে পারি। পূর্বোক্ত ঘটনাটির মতো এই ঘটনাটিও বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের অসার যুক্তির শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই বিবৃত হয়েছিল। কুলীন ব্রাহ্মণদের মতো ভঙ্গ-কুলীনরাও বিবাহকে ব্যবসায়ে পরিণত ক'রে দেশে ব্যভিচারের যে স্রোত নির্বারিত ক'রে তুলেছিল, এই গল্পটির মধ্যে বিদ্যাসাগর তারই উদাহরণ দিয়েছেন।

গল্পদুটি প্রকাশকালে, বিদ্যাসাগরের যে সামান্যতমও সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ছিল না, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঘোরতর বিদ্যাসাগরবিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারতেন না। বিদ্যাসাগর নিজেও এই ধরণের গল্পগুলিকেই কেবলমাত্র নয়, তাঁর কোন রচনাকেই সচেতন সাহিত্যসাধনার পরিণতি ব'লে মনে করতেন না। এ-যুগের পাঠক হিসেবে আমরাও তা মনে করতে পারি না। কিন্তু বহুবিবাহের আন্দোলনের ডামাডোল থেকে বহু দূরে স'রে এসেছি ব'লে এই রচনাগুলি এখন তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারপ্রবণতা হারিয়ে আমাদের কাছে উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি মূল্যবান দলিলে পরিণত হয়েছে। সেই দলিলগুলির আলোচনা করতে গিয়েই নিতান্ত অবহেলাভাবে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া কয়েকটি অসাধারণ সাহিত্য-গুণসম্পন্ন মণিমুক্তা দেখে আমরা চমকে উঠি, আমাদের অন্তর হায় হায় ক'রে ওঠে, মনে হয় যে উপাদান দিয়ে জাতীয় সাহিত্যের সোনার ভাণ্ডার ভ'রে তোলা যেত, তার সবটাই প্রায় কতকগুলো হীন কুচক্রী লোকের সঙ্গে বাদানুবাদেই আমরা বিনষ্ট করে ফেলেছি। উদাহরণস্বরূপ আমরা উপরোক্ত গল্প দুটিকেই গ্রহণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটোগল্পের 'ছিন্নপত্র'-ধৃত মূল এবং 'গল্পগুচ্ছে' তাদের সাহিত্যিক পরিণতির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখি বিদ্যাসাগরের সামাজিক প্রয়োজনজাত এবং সম্পূর্ণভাবে অসাহিত্যিক কারণে রচিত এই গল্পদু'টি সাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতার দিনলিপি থেকে অনেক বেশি প্রাগ্রসর, সাহিত্যিক পরিণতির অনেক কাছাকাছি এসে পৌছেছে। কয়েকটি স্থাননাম এবং কয়েকটি ব্যক্তিনামের সঙ্গে সামান্যতম সাহিত্যিক সচেতনতা

যুক্ত হ'লে গল্পদুটির মধ্যে বাস্তব সামাজিক নিষ্ঠুর গল্পের পরিণতি ঘটতো অতি সহজেই। দু'টি গল্পেই আকস্মিক পরিণতির তীব্র তীক্ষ্ণ লেখক-মন্তব্য এক সুগভীর ও বিশালব্যাপ্ত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি ক'রে লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতাকে তুচ্ছ ক'রে দিয়ে সার্থক ছোটোগল্পের দিকেই যেন অঙ্গুলী নির্দেশ করেছে,

'সে যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। চঞ্চলা বলিয়া, লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে; কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আস্পদ নহেন।' এবং 'তাঁহারাও গত্যন্তরবিহীন হইয়া, স্থানান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং জননীর সহিত, স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।'

কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মানোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দু'টি মেয়ের বারাঙ্গনায় পরিণতির যে গভীর ট্র্যাজেডি, তারই ভিত্তিতে কুলীন পাত্রে কন্যাসমর্পণরূপ প্রহসনের ধর্মগৃহে যে কুললক্ষ্মীর অবস্থান, তাঁর চঞ্চলা হওয়ার, স্বাভাবিকভাবেই, কোন আশঙ্কা নেই। কারণ, পাপেই যাঁর অস্তিত্ব, পাপ তাঁকে কোনক্রমেই চঞ্চলা করতে পারে। কুলীন সমাজের কদর্যতার ব্যঞ্জনায়, শেষ মন্তব্যটি তাই যেমন হৃদয় বিদারক হ'য়ে উঠেছে তেমনি সাহিত্য গুণান্বিত হ'য়ে উঠেছে। দ্বিতীয় গল্পটির শেষ মন্তব্যটি আরও ব্যঞ্জনাময়। একটি সুশ্রী যুবতী নারী কেবল মাত্র ভঙ্গকুলীনের কন্যা ব'লে পিতৃগৃহে অথবা স্বামীগৃহে সুস্থ জীবনযাপনে বঞ্চিত হোল। ক্রূর সমাজবিধানের অসহায় বলি সেই মেয়েটিকে সমাজ সর্বভাবে বঞ্চনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মেয়েটিই যখন অসামাজিক জীবন বেছে নিল তখন সমাজই তার সামনে দিনযাপনের সহস্র উপকরণ এগিয়ে দিয়েছে। 'কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা। বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং জননীর সহিত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন'—এই বাক্যটি পাঠকের মুখের ওপর প্রচণ্ড চাবুকের মত যখন এসে পড়ে তখন তার প্রতিক্রিয়া বোঝা না গেলেও অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে অবিরাম রক্তক্ষরণ করে এবং একটি মেয়ের স্বচ্ছন্দ দিনপাতের জন্যে দেহবিক্রয়ের চরম পরিণতি মোপাসাঁর কোন কোন ছোটোগল্প পাঠের ফলশ্রুতিকে মনে করিয়ে দেয়। বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীনদের নিজের হাতে স্ত্রী-কন্যাকে গণিকালয়ে প্রেরণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারেই বিদ্যাসাগর দুই বাস্তব উদাহরণ আহরণ করেছিলেন। সাহিত্য রচনার সামান্যতম ইচ্ছা না থাকলেও গল্পদু'টির প্রকাশকালে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা গল্পদু'টিকে এমনভাবে প্রকাশ করেছে, যাতে তাঁর অজানিতেই দু'টি সার্থক ছোটো

গল্পের উপকরণবাহী হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর সাহিত্য করতে চাননি, প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের অটল অচল দুর্জয় মনুষ্যত্বের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সহজাত সাহিত্যিক প্রতিভা। এই প্রকাশেচ্ছা ও সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাভাবিক মিলন ঘটেছিল তাঁর লেখনী চালনায়। তাই তাঁর নিজের কাছেই অপরিচিত ঔপন্যাসিকচেতনার মত সার্থক ছোটোগল্প রচনার এই প্রতিভা ও এ-যুগের পাঠক হৃদয়ে সবিস্ময় খেদের সঞ্চার ক'রে, হায়, বিদ্যাসাগর যদি একটু সচেতন হতেন, তাহলে সার্থক বাংলা ছোটোগল্পের জন্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আরও বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হ'ত না!

সমাজবিধির অমানবিকতা এবং নৃশংসতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতি স্মার্তপণ্ডিত সম্প্রদায়ের জঘন্য পাশবিকতার পরিচয়ও বিদ্যাসাগর সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পক্ষের পৌত্রদের মধ্যে শ্রাদ্ধাধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজনমান্য স্মার্তপণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এক পক্ষকে সমর্থন করলেও পরে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ ক'রে অন্যপক্ষের প্রতি সমর্থন জানালেন এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মতো তাঁর পরিবর্তিত মত সমর্থন করার জন্যে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ জানালেন। বিস্মিত বিদ্যাসাগর আগের বিধানদানের সময় তিনি শাস্ত্রবচন দেখেছিলেন কিনা প্রশ্ন করায় বিদ্যারত্ন অম্লানবদনে উত্তর দিলেন বিধান দেবার সময় বচন ফচন দেখা যায় না। এই ব্যক্তিই বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ ক'রে শাস্ত্রবচনের দোহাই পেড়েছিলেন। এই ব্রজনাথ বিদ্যারত্নই ছিলেন সে-যুগের স্মার্তপণ্ডিতদের প্রতীক, এদের শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের কোন কোন যোগ ছিল না। অন্যকে ধর্মোপদেশ দিয়ে এঁরা নিজেরা অধর্মের পাঁকে ডুবে থাকতেন। এঁদের এই ধরণের জীবনযাত্রার একটা সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্যে বিদ্যাসাগর ১২৯১ সালে প্রকাশিত 'ব্রজবিলাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন,

'কিছুকাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, কৃষ্ণহরি শিরোমনি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্যায়

নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী, গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে কাহিয়াছিলেন, যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি-বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধ দেশ, অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি-বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিক প্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ আলিঙ্গনদান করিতে, এক্ষণে, এই শাল্মলি-বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন-দান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে, সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতি করুণস্বরে, বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পর-পুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর, আর আমি প্রাণান্তেও, পর-পুরুষে উপগতা হইব না।' সেদিন, সন্ধ্যার পর, তিনি পূর্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণ সেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণ পূর্বক, বাংরবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি,

তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি ! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছে না ? আমরা, পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমুল গাছ, পূর্বে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে ; কিন্তু, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্বশরীর শীতল ও পুলকিত হয়'। এই বলিয়া অভয় প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে পূর্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন'।

কৃষ্ণহরি শিরোমণি নরকে নারীর ব্যভিচার দোষের শাস্তির বিস্তৃত বর্ণনা করেছিলেন। পুরুষ রচিত শাস্ত্রে তাঁর মতো লম্পটের শাস্তিবিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। তাই শাস্ত্রের নামে একদিকে ধর্মকথা প্রচার অন্যদিকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হ'য়ে তাঁরা সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের ধর্ম কর্ম ও অস্তিত্বই এই ব্যভিচার দোষের ওপর নির্ভর ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল। তাই কুলীন ও ভঙ্গকুলীন কন্যাদের বারাঙ্গনা পরিণতির প্রতিবিধান তো দূরের কথা, তাঁরা সে অবস্থার পৃষ্ঠপোষকতাই করতেন। অনভিজ্ঞতাবশতঃ বিদ্যাসাগর এই শ্রেণীর মানুষের বোধোদয়ের জন্যেই শাস্ত্রবচনের সাহায্য নিয়েছিলেন। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি তারা শাস্ত্রবচন আওড়ায় লোক ঠকাবার জন্যে, কাজের সময় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সচেতনভাবে সেই শাস্ত্র বচনের বিপরীত কাজই ক'রে থাকে। যখন বুঝতে পারলেন তখন যুক্তিতর্ক বা শাস্ত্রবচন উদ্ধারের পথ পরিত্যাগ ক'রে তাদের মুখোশ টেনে খুলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বেনামী ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি এই উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ব্যঙ্গ রচনাগুলির মধ্যে তিনি নাম ধ'রে ধ'রে বিভিন্ন পণ্ডিতের অন্তঃসারশূন্যতা যেমন প্রমাণ করেছিলেন, তেমনি এই ধরণের উদাহরণ তুলে ধ'রে সমগ্রভাবে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিলেন।

উদাহরণগুলি বিদ্যাসাগরের সচেতন সামাজিক উদ্দেশ্য কতটা সার্থক ক'রে তুলেছিল তার বিচারে প্রবৃত্ত না হ'য়েই একথা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, পূর্বোল্লিখিত গল্পদু'টির মতো এই গল্পগুলিও সার্থক বাংলা ছোটগল্পের ভূমিকা রচনা করেছিল। মানবজীবনের বা জাতীয় সমাজের বিস্তৃত কর্ম

প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নয়, স্বল্প পরিসরে একটি বিশেষ বক্তব্যের উপস্থাপনাই এই গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য। মানুষের একটি বিশেষ প্রবৃত্তির সার্থক উদ্ঘাটনে গল্পগুলি সার্থক ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অসচেতন সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে সামান্যতমও সাহিত্যমনস্কতা যদি যুক্ত হ'ত, এগুলি সার্থক ছোটগল্পের সাফল্য অর্জন ক'রতো।

এই রকম গল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর রচনার মধ্যে অজস্র ছোটোগল্পের উপকরণ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'ছিন্নপত্রে'র বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপকরণগুলি যেমন এক একটি সার্থক ছোটোগল্প সৃষ্টি করেছিল, বিদ্যাসাগরের সমাজবিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের যে সমস্ত টুকরো কাহিনী ছড়িয়ে আছে, সেগুলি তেমনি সার্থক ছোটোগল্প হ'য়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি, সার্থকতার বীজ বুকে নিয়ে লেখকের অসচেতনতা বা অনীহার সাক্ষী হ'য়ে উত্তরকালের মানুষের আক্ষেপের বিষয় হ'য়েই প'ড়ে আছে। বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে এইরকম দু'টি কাহিনী চুম্বক আছে,

'কুলীন মহিলারা নাম মাত্র বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন, পিত্রালয়ে কাল যাপন করেন। স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই; এবং তাঁহারাও সে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা, শ্বশুরালয়ে আসিয়া, দুই চারিদিন অবস্থিতি করেন; কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ত্রুটি হইলে, এজন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই একদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তাঁহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া, পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহকারী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয়, উপায় অতি সহজ, সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যা দেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে, প্রতিবেশীদিগের বাটিতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ্ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর, কাল রাত্রিতে জামাই

আসিয়াছিলেন ; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব ; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই ; অনেক বলিলাম, একবেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও ; তিনি কিছুতেই রহিলেন না ; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না ; সন্ধ্যার পরেই, অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক, পরে, অমুক দিন অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে ; সেখানেও যাইতে হইবেক ; যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময়, এইদিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন্ ; তারা জামাইএর সঙ্গে, খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ী কিছুতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাইয়া, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা, তোরা যাস্, ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতাকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।'

দ্বিতীয় কাহিনীটি আরও নক্কারজনক এক সামাজিক দুর্নীতির জলন্ত উদাহরণ,

'বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই ; তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্যা, ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতি-বর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয় ; এজন্য তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া সর্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।'

'ব্রজবিলাস' গ্রন্থে ব্যঙ্গরসাত্মক একটি হাসির গল্পের কাহিনীচুম্বক বিদ্যা-সাগরের সাহিত্যমানসের স্নেহদৃষ্টি বঞ্চিত হ'য়ে অসীম সম্ভাবনা নিয়ে কাঠামো আকারেই প'ড়ে আছে। স্বল্পপরিসরের মধ্যেও কাহিনীচুম্বকটি হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজজীবনের একটি তথ্যচিত্রকে উপস্থাপিত করেছে,

'কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতায় এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি একবারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার গুরুদেব, উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই', গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, "আপনি দেখুন, যত প্রবল প্রতাপ রাজারাজড়া, সব নরকে

যাইবেন ; যত ধনে মানে পূর্ণ বড়লোক, সব নরকে যাইবেন ; যত দিলদরিয়া, তুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন ; যত মৃদুভাষিনী, চারুহাসিনী বারবিলাসিনী সব নরকে যাইবেন ; স্বর্গে যাইবার মধ্যে কেবল আপনাদের মত টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। সুতরাং, অতঃপর নরকই গুলজার ; এবং নরকে যাওয়াই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়" ।'

অধিক উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বিদ্যাসাগরের অসাহিত্যিক, উদ্দেশ্য-মূলক, সমাজবিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে আধুনিক অর্থে সার্থক ছোটোগল্পের উপকরণ আর প্রায়সম্পূর্ণ একাধিক উদাহরণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার আলোকে বিচার করলে, বা বিচার করার যোগ্যতা অর্জন করলে, বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাঁর মতামত পালটাতে হ'ত, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবে বিদ্যাসাগরকে তিনি তুচ্ছ করতে পারতেন না, বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক ছিলেন না ব'লে কোন চরম মন্তব্য না ক'রে বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও, শিক্ষা ও সমাজচিন্তায় নিমগ্ন থাকার জন্যে, তিনি সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করার সময় বা সুযোগ পাননি ব'লেও তাঁকে আক্ষেপ করতে হ'ত !

৭

বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও সচেতনভাবে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত না হ'য়ে বিদ্যাসাগর বাংলাসাহিত্যের যে কি অপূরণীয় ক্ষতি ক'রে গেছেন তার প্রমাণ তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী। নানা কাজের চাপ ও শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তিনি আত্মজীবনী রচনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি বটে, কিন্তু একথা কোন-ক্রমে অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্যমানসের প্রবণতা ও প্রেরণা থাকলে তিনি যেমন ক'রে হোক এটি শেষ করতেন। কোন অবস্থাতেই শেষ করতে না পারলে তাঁর কণ্ঠ থেকে অন্তত সামান্য খেদোক্তিও নিঃসৃত হ'ত। বিদ্যা-সাগর এটি শেষও করেননি, এবং শেষ করতে না পারার জন্যে তাঁর মনে কোন খেদও ছিল না। কারণ, তাঁর শিক্ষাদর্শ ও সমাজসংস্কারের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি কলম ধরা তাঁর কাছে সময়ের অপব্যয় এবং কাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ব'লে বোধ হ'ত। কবিসাহিত্যিকদের মনে সাহিত্যরচনার দুর্দমনীয় আবেগ প্রশাসিত করার ক্ষমতা তাঁদের নিজেদের নাই তাই মোহা-বিষ্টের মতো একটা বিশেষ প্রবণতা বা চেতনার ঘোরে তাঁরা সাহিত্যরচনা ক'রে যান। তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা তখন মানবীয় সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে

প্রভাবিত ক'রে ফেলে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিপরীত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করি। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রখর প্রকাশ সাহিত্যপ্রতিভাকে কখনই প্রাধান্য লাভ করার সুযোগ দেয়নি। অনুগত ভৃত্যের মতো সেই সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁর ব্যক্তিমহিমার আদেশে কখনও রচনা করেছে পাঠ্যপুস্তক, কখনও বিবাহবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, আবার কখনও বা ব্যঙ্গরসাত্মক পুস্তিকা। সাহিত্য-প্রতিভার ওপর বিদ্যাসাগরের এই চরিত্রমাহাত্ম্যের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁর প্রতিভার ওপর নির্ভর করেনি, কারণ সে প্রতিভাই তাঁর সমস্তটা ছিল না, তা ছিল তাঁর মনুষ্যত্বের খণ্ডাংশ মাত্র। তাঁর পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্য তাঁর প্রতিভার কীর্তিকে তাই নিতান্ত খর্ব ক'রে রেখেছিল।

ব্যক্তিমাহাত্ম্যের কাছে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভার এই খর্বতাই ব্যক্তি প্রতিভার অনুশাসনে সাহিত্যপ্রতিভাকে সর্বকর্মে নিযুক্ত করতে পেরেছে। ব্যক্তিপ্রতিভার কাছে সাহিত্যপ্রতিভার এই আনুগত্য আত্মজীবনীরচনার সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করে। তখন সাহিত্যপ্রতিভা আবেগের উচ্ছ্বাসে ব্যক্তি-জীবনকে কেবল ভালো বা কেবল মন্দের চূড়ান্তরূপে চিত্রিত করতে পারে না, অথবা, সাহিত্যকল্পনার মাধুরী মিশিয়ে ব্যক্তিজীবনের যথাযথ চিত্ররচনার নামে এক স্বপ্নকল্পনাময় রূপকথার জীবন রচনা করতে পারেন না। তাই মাত্র দুই পরিচ্ছেদে রচিত বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী অনেক দিক থেকে বাংলা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত এই আত্মজীবনীটি পাঠ করলেই মনে হয় এ যেন অন্য এক বিদ্যাসাগরের লেখা আমাদের সর্বজনপরিচিত বিদ্যাসাগরের জীবনী। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে অভিভূত করা তো দূরের কথা, নিতান্ত সমীহ সহকারে যেন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-গুলিকে পর্যবেক্ষণ করছে। এর ফলে তাঁর পিতামহের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, পিতার দুঃখময় জীবনযাত্রা এবং অতি বাল্যকালেই প্রকাশিত তাঁর নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে কোথাও উত্তম পুরুষের আত্মমাহাত্ম্য প্রচার প্রকট হ'য়ে ওঠেনি. নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ-ধারায় একটা সাহিত্যিক সর্বজন উপলব্ধি বিশ্বসত্যের বিকাশ ঘটিয়েছে। যেমন, তাঁর বাল্যকালে পুত্রসম স্নেহে রাইমণি দেবী তাঁকে যেভাবে পালন করেছিলেন তার বর্ণনার উপসংহারে পরিণত বয়স্ক বিদ্যাসাগর আত্মস্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন,

'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে।'

এই বৈশিষ্ট্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি নিজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক কোন কথা তো দূরের কথা, উত্তম পুরুষের মাধ্যমেই কোন কথা বলেননি, প্রথম পুরুষের প্রকাশভঙ্গিতে স্ত্রীজাতির প্রতি পক্ষপাতের অবশ্যম্ভাবিতার একটি সাধারণ ভূমি নির্দেশ করেছেন,

'যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'

অর্থাৎ, বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী হয়েছিলেন, তাঁর নিজের মতে, তাতে নতুনত্ব বা বিশেষত্ব কিছু নাই। যে কোন ব্যক্তিই রাইমণির মাতৃহৃদয়ের অমৃতসান্নিধ্যে এলে বিদ্যাসাগরের মতোই নারীজাতির পক্ষপাতী হ'য়ে উঠতেন। বিদ্যাসাগরের এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। নিজ হৃদয়ের মহত্ত্বহেতু প্রকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও তিনি কোন মানুষকেই ছোট ব'লে ভাবতে পারেননি, এবং তা পারেননি ব'লেই তাঁর মূল্যায়ন এখানে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে এবং সেই ত্রুটির জন্যেই তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্ব যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি আত্মজীবনী রচনার উপযুক্ত নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যিকপ্রতিভারও পরিচয় দান করেছে।

ব্যক্তিপ্রতিভার পাশাপাশি সাহিত্যপ্রতিভার যে প্রধানতায় বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত এই আত্মজীবনীটি সার্থক আত্মজীবনীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'য়ে উঠতে পারতো, সাহিত্যপ্রতিভার ওপরে ব্যক্তিপ্রতিভার সেই কর্তৃত্ববোধই কিন্তু এই আত্মজীবনীটিকে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিপ্রতিভা কর্মপ্রেরণায় বরাবর বাহিরজীবনে ছুটে গেছে, বারবার অবহেলিত হয়েছে সাহিত্যপ্রতিভা অবশেষে বাংলাসাহিত্য একটি অমূল্য সম্পদ থেকে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত হয়েছে।

কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের আপন অন্তরের নিভৃত প্রদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপের একটি বিরল দৃষ্টান্ত লুকিয়ে আছে 'প্রভাবতী সম্ভাষণে'। এখানেও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিপ্রতিভার কাছে সাহিত্যপ্রতিভার অপহ্নুতি। কোন সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য নয়, শোককে শ্লোকে পরিণত করার আদি সাহিত্যিক উদ্দেশ্যেও নয়, কর্মযোগী মহাপুরুষ কর্মমরুক্ষেত্রে সান্ত্বনার এক স্নিগ্ধ মরুদ্যান সৃজন ক'রে কর্মপথে নতুন প্রেরণা লাভের জন্যেই অকালে লোকান্তরিতা তিন বছরের দেবকন্যা প্রভাবতীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কল্পনা করতেন। প্রকাশই যেহেতু সাহিত্য,

বিদ্যাসাগর তাই প্রভাবতী সম্ভাষণ রচনা ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাননি, কারণ প্রকাশের জন্যে তিনি এ গ্রন্থ রচনাও করেননি, প্রকাশও করেননি। কিন্তু প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকলেও এই শোকগাথা রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাকেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই বিদ্যাসাগরের যে দু'একটি রচনা তাঁর কীর্তিগত পরিচয়কে ব্যক্তিগত পরিচয়ের দ্বারা পূর্ণতর ক'রে তুলেছে, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তাদের মধ্যে প্রধানতম।

ক্ষুদ্র এই শোকোচ্ছ্বাসটি বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি, এমন কি এটির অস্তিত্বই সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল। প্রভাবতী নামে তিন বছরের একটি ছোট্ট মেয়ের অকাল মৃত্যু 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' সেই মহান পুরুষের 'মৃদুনি কুসুমাদপি' হৃদয়কে আকস্মিক শোকের নিদারুণ বেদনায় যেন কেন্দ্রচ্যুত ক'রে দিয়েছিল। তাঁর প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, জীবনমরুক্ষেত্রের একমাত্র সান্ত্বনাদায়িনী মরুদ্যান সেই শিশুকন্যা প্রভাবতীর একটি বিকল্প মূর্তি স্থাপনের প্রয়াসেই বিদ্যাসাগর রচনা করেছিলেন এই 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগর দেবারাধনার সুযোগ পাননি, মানুষ ছেড়ে দেবতার চিন্তায় মনোনিবেশের তিনি কল্পনাও করেননি, কিন্তু 'প্রভাবতী সম্ভাষণে' দেখি স্বর্গীয় বিভায় মহিমান্বিত হ'য়ে মানুষই তাঁর কাছে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবী প্রতিমার মাধ্যমে সাধক যেমন বিশ্ববিধাত্রী জীবপালিনী মহাশক্তির অব্যক্ত অচিন্ত্য ঐশীসত্তারই আরাধনা করতে চায়, বিদ্যাসাগরও যেন তেমনিভাবে প্রভাবতীর এক সারস্বতপ্রতিমা নির্মাণ ক'রে, তারই আরাধনায় আপনার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে স্বর্গীয় শান্তির অমৃতস্পর্শ লাভ করতে চেয়েছিলেন। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বিদ্যাসাগরের স্বহস্তনির্মিত দেবীপ্রতিমা। প্রায় তিনদশক ধ'রে আমৃত্যুকাল বিশ্ববিহীন বিজনে ব'সে বিদ্যাসাগর জীবনমরণহরণকাহিনী সেই ক্ষুদ্র বালিকামূর্তিকে প্রতিনিয়ত চিত্তভ'রে স্মরণ ক'রে গিয়েছেন। তাঁর গহীনগোপন হৃদয়কন্দরে পরম স্নেহচ্ছায়ায় রক্ষিত নিবাতনিস্পন্দ প্রদীপশিখার মতো চিরজাগরূক প্রভাবতীস্মৃতি এই 'প্রভাবতী সম্ভাষণে' বিদ্যাসাগর-হৃদয়ের নিরাবরণ যে একান্ত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর অন্য কোন রচনাতেই আমরা তার পরিচয় পাই না। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা এখানে হাহাকাররবে ক্রন্দিত হ'য়ে ওঠেনি, মর্মান্তিক যন্ত্রণার করুণ কাতরতা বক্ষরক্ত নিংড়ে বিন্দু বিন্দু ক্ষরণে হৃদয়কে নিত্যই অভিষিক্ত ক'রে চলেছে। এ বেদনা তাই পরিপার্শ্বকে সচকিত ক'রে তোলে না, প্রকাশহীন রুদ্ধ ক্রন্দনে আপনার হৃদয়কেই উন্মথিত ক'রে চলে। এ রচনা তাই প্রকাশযোগ্য নয়, প্রকাশের

জন্তে রচিতও নয়; প্রকাশহীন বেদনার মতো একান্ত ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠেছে। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পড়তে গিয়ে তাই মোহিতলালের মন্তব্যটি অতি সঙ্গত-ভাবেই মনে পড়ে,

'এখানে আমরা যেন মানবহৃদয়ের এমন একটি নিভৃত গোপন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, যেখানে প্রবেশের অধিকার আমাদের নাই,—সে কাজ করিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়। আমার মনে হয়, ইহাতে মৃত মহাত্মার অনুমতি ছিল না, আমরা যেন সত্যই অন্যায় কাজ করিয়াছি; তথাপি ইহা পাঠ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।'[১]

কিন্তু ধন্য হ'লেও আমরা তৃপ্তি পাই না। তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র অবহেলা-ভরে ছড়িয়ে থাকা অমূল্য রত্নরাজির দিকে তাকিয়ে সর্বদাই আক্ষেপ হয়, যাঁর দানে জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মিটে যেতো, তিনি শুধু মুষ্টিভিক্ষা দিয়েই আমাদের বিদায় করেছেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভার উপযুক্ত প্রকাশ না ঘটলেও তাঁর অনন্ত সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উপলব্ধি করেছিলেন কর্মপ্রেরণায় নিজের সৃষ্টিক্ষমতাকে অসাহিত্যিক পথে পরিচালিত করলেও তাঁর লেখনীচালনার পরোক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে যেটুকু সারস্বতসাধনার প্রকাশ ঘটেছিল, বাংলাভাষার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বাংলাসাহিত্যেরও ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরে বাংলাসাহিত্যের এই যে প্রথম সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথেই তার চূড়ান্ত পরিণতি। এই কথা স্মরণ ক'রেই সত্তর বৎসরের সুবৃদ্ধ বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভার চূড়ান্ত মূল্যায়ন ক'রে মন্তব্য করেছিলেন,

'বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'[২]

১ 'সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর', সাহিত্য-বিতান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃ. ৩৭

২ 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি', চারিত্রপূজা

নয়

‘বিদ্যাসাগরের সম্মাননার বিশেষ সার্থকতা’

১

বাঙালীজীবনে বিদ্যাসাগরের প্রভাবের গভীরতা বর্ণনা ক’রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

‘তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে।’[১]

সেই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে তীর্থপতি দেবতার মাহাত্ম্য কিন্তু বাঙালীজাতি সহজে উপলব্ধি করতে পারেনি। অনেক বিরূপতা, অনেক বিরুদ্ধতার স্তর পেরিয়ে আজ আমরা অনস্বীকার্য বিদ্যাসাগর-প্রভাবকে স্বীকার ক’রে নিতে বাধ্য হয়েছি। জীবিত অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে যে বাধার সম্মুখীন হ’তে হয়েছিল, সেই বাধাই যেমন তাঁর স্বকীয়তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক হয়েছে, তেমনি সচেতনভাবে এবং সর্বোতোভাবে তাঁর প্রভাব অস্বীকারের ব্যর্থ প্রয়াসই তাঁর প্রভাবের অনপনেয়তা প্রমাণ করেছে। সাধারণ অশিক্ষিত অসচেতন মানুষের মানসিকতা বিচার করলে তাদের বিদ্যাসাগর বিরোধিতায় অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে বাধা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির কাছ থেকে আসে, তখন আমরা সেই প্রভাবের অতলান্ত গভীরতা সম্বন্ধে আরও সচেতন হ’য়ে উঠি।

বাংলাভাষা, বংলাসাহিত্য এবং বাঙালীসমাজজীবনে বিদ্যাসাগরের প্রভাব অস্বীকার করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অক্লান্ত প্রয়াস বর্তমান যুগের গবেষণায় যতোই শূন্যগর্ভ ব’লে বোধ হোক না কেন, বিদ্যাসাগরের সমকালীন জীবনে তার সক্রিয়তাকে আমরা কিন্তু কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না।

আধুনিক বাংলাভাষার ক্রমবিবর্তনধারায় বিদ্যাসাগরের স্থান অস্বীকারের চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য ভাষার উৎসটিকেও কুয়াসাচ্ছন্ন ক’রে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে বিদ্যাসাগরের ভাষার মূল ছিল ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদী প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের কৃত্রিম বাক্যকথন-প্রণালীর মধ্যে, তার

সঙ্গে সজীব সচল বাংলা বাক্যকথন-প্রণালীর কোন যোগই ছিল না। প্রাচীন-পন্থী, সংস্কৃতানুসারীদের এইভাষা ছিল 'অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাংলা সমাজে অপরিচিত'। এই ভাষার কৃত্রিমতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বাল্য-স্মৃতিকে সাক্ষ্য হিসেবে হাজির করেছেন,

'আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ 'চিনি' বলিতেন না —'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চিৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানেন না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন এই কৃত্রিম অদ্ভুত বাক্যকথন-প্রণালী থেকেই বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের ভাষারীতি উদ্ভূত হয়েছিল,—'এই সংস্কৃতানুসারী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল।'[২] তাই বিদ্যাসাগরীয় ভাষারীতি অনুসরণে বাংলাভাষার ক্ষতি ভিন্ন উন্নতি হবার সম্ভাবনা নাই ব'লে ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে তিনি বলেছিলেন,—'বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন ; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।'[৩]

এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ ক'রে বাঙালী লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, 'তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা

১ 'বাঙলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'
২ 'বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারিচাঁদ মিত্রের স্থান'
৩ 'বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'

সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষায় আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।'[১]

এই প্রয়োজনের স্বরূপ আলোচনা ক'রে তিনি বলেছেন,—'যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা।'[২]

বিদ্যাসাগরের ভাষার সৌন্দর্য অস্বীকার করতে না পারলেও তা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক ব'লে তিনি বিশ্বাস করেননি,—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলাগদ্য লিখিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকলপ্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকলপ্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙলা সাহিত্য পূর্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।'[৩]

বিদ্যাসাগরের ভাষার এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধতা প্যারীচাঁদের ভাষাতেই প্রথম মুক্তিলাভ করেছিল ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন,—'যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন

১ 'বাঙ্গালা ভাষা', বিবিধ প্রবন্ধ

২ 'বাঙ্গালা ভাষা', বিবিধ প্রবন্ধ

৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'

করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'[১]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্যা হোল বিদ্যাসাগরের ভাষার কৃত্রিমতা প্রদর্শন ক'রে প্যারীচাঁদের ভাষার সর্বজনবোধ্যতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেও সে ভাষাকে আদর্শ বাংলাভাষা হিসেবেও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি,—'আমি এমন বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল. সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, এবং যে সর্বজন হৃদয় গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এভাষার তাহা সহজ গুণ ... ... প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।'[২]

নিজের এই অক্ষয় কীর্তি সম্বন্ধে প্যারীচাঁদের নিজেরও খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁর ভাষার মূলগত দুর্বলতা মধুসূদন খুব সহজেই ধ'রে ফেলেছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগানবাড়িতে একবার এই ভাষা প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। সমবেত সুধীমণ্ডলী উচ্ছ্বসিতভাবে প্যারীচাঁদের গদ্যভাষার প্রশংসা সুরু করলে মধুসূদন সোজাসুজি প্যারীচাঁদকে অনুযোগ করেছিলেন,—'আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন? লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মজনসকাশে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলে না। পোষাকী পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাইরে, সভা সমাজে, সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখনও সম্ভব?' উত্তেজিত প্যারীচাঁদ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন,—"তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত রচনাপদ্ধতিই বাঙ্গালাভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত ও চিরস্থায়ী হইবে।' অবিশ্বাসের সুরে হাস্যসহকারে মধুসূদন উত্তর দিয়েছিলেন,

১ 'বাঙ্গালা ভাষা,' বিবিধ প্রবন্ধ

২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'

'It is the language of fishermen unless you import largely from Sanskrit.[১]

বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে মধুসূদন এই যে পন্থা নির্দেশ করেছিলেন, কাব্যের ক্ষেত্রে তা যেমন তাঁর নিজের কৃতিত্বে প্রতিপাদিত হয়েছিল, গদ্যে সেই বক্তব্যের যাথার্থ্য তেমনি প্রতিপাদিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের রচনায়। অথচ বিদ্যাসাগরের ভাষায় এই সংস্কৃতশব্দবাহুল্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র আপত্তি ছিল। সেকথা বিদ্যাসাগরও শুনেছিলেন এবং সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার-বাহুল্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর অপেক্ষাও বেশী দোষী ছিলেন, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল,— 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—'বারাসাতে কালীকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ি একদিন এই কথা উঠিয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, 'ছাপাখানায় 'এম' কাকে বলে তুই জানিস?' আমি বললাম—না। তিনি আমাকে 'এম্' বুঝাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বঙ্কিমের একখানা ও আমার একখানা বই আনিলেন। আমার বইয়ে যতগুলো 'এম' ছিল বঙ্কিমের বইয়েও ততগুলো 'এম্' লইলেন। তাহার পর কথা গণিতে লাগিলেন। আমার সেইটুকুতে ৫৫টা সংস্কৃত কথা ছিল, আর বঙ্কিমের ৬৫টা। আমি কালীকৃষ্ণবাবুকে দেখাইয়া দিলাম—এই ত, কার সংস্কৃত বেশী দেখ; তার উপর আমি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। আর উনি অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।'[২]

কেবলমাত্র সংস্কৃত অর্থে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারেই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়নি, তাঁর কৃতিত্ব বাংলা শব্দভাণ্ডারে আরও গভীর প্রভাব মুদ্রিত ক'রে বাংলা সাহিত্যভাষার গতিপথ নির্ণয়ে আজও দিক নির্দেশ ক'রে চলেছে। বিদ্যাসাগরের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের প্রাতিভ দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা পড়েছিল। অননুকরণীয় ভাষায় উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে তিনি লিখেছেন,

'ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে; সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলাভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃতভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত

১ নগেন্দ্রনাথ সোম—'মধুস্মৃতি ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬১ ; পৃ. ৮২-৮৩

২ [বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ], হরপ্রসাদ রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার

উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলাভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হ'য়ে যায়নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হ'য়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারেনি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব।.....বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয়নি।'[১]

বাধাই আমাদের দেশের প্রধান দেবতা, সেই দেবতার বেদিমূলে যারা মাথা বিকিয়ে দেয়, গতানুগতিকতার প্রবাহপথে তাদের কোন বিরূপতার সম্মুখীন হ'তে হয় না। কিন্তু সহজে যাঁদের নাগাল পায় না, সেই মহাপুরুষদের দেশের লোক সম্মান দিতে চায় না। বাংলাভাষার নির্মাণকার্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করার বঙ্কিমপ্রয়াস তাই বিদ্যাসাগরকে ছোট করেনি, তাঁর সমকালীন দেশ ও সমাজ যে তাঁর চেয়ে কতো ছোট. সে কথাই প্রমাণ করেছে। সমকালীন দেশ ও সমাজ ছোট ছিল ব'লেই বিদ্যা-সাগরের গগনচুম্বী মস্তক শতাব্দীপাদের এপার থেকেও আজ স্পষ্ট দৃশ্যমান।

২

কেবলমাত্র শব্দব্যবহার এবং ভাষারীতির দিক থেকেই নয়, বিষয়বৈচিত্র্যের বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সারস্বতসাধনার ব্যর্থতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাঠ্যপুস্তকরচনা প্রয়াস এবং অনুবাদ প্রবণতা, এই দু'টি মারাত্মক ত্রুটিই বিদ্যাসাগরের রচনাবলীকে সার্থক সাহিত্য হ'তে দেয়নি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Review-তে প্রকাশিত 'Bengali Literature' নামক একটি প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সারস্বত সাধনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন,

If successful translations from other languages constitute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidyasagar's case ; and if the compilation of very good primerts for infants can on any way stengthen his claim, his claim, is strong. But we deny that either translating

'বিদ্যাসাগর স্মৃতি' , চারিত্রপূজা

or primer-making evinces a high order of genius ; and beyond translating and primer-making Vidyasagar has done nothing. প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব বিচার কালে তিনি আবার বিদ্যাসাগরের অনুবাদ প্রবণতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

'যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনি সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত।'[১]

তাই প্যারীচাঁদ মিত্রকেই বাংলাসাহিত্যে মৌলিক বিষয়বস্তু আবিষ্কারের আদি কৃতিত্বের জন্যে শতকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

'তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয় না। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালাদেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।"[২]

প্যারীচাঁদের ভাষাব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বকীয়ত্বের বিচারের মতো তাঁর বিষয় নির্বাচনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বকীয়ত্বের বিচারেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার বিভ্রান্তি ঘটেছিল। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ভাষারীতির বিবর্তনধারা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর ইতিহাস আলোচনাতেও তেমনি ইতিহাস-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বিদ্বেষের আত্যন্তিকতায় তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলেছিল। তা না হ'লে তিনি দেখতে পেতেন বাংলাদেশের কাহিনী নিয়ে প্রথম যে সাহিত্য রচনার জন্যে তিনি প্যারীচাঁদকে সাধুবাদ দিয়েছিলেন, সে গৌরব প্যারীচাঁদের প্রাপ্য নয়। সে-বিষয়ে প্রথম কৃতিত্ব ভবানীচরণ

১ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'
২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'

বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভবানীচরণের রচনাই যে প্যারীচাঁদের সাহিত্য সাধনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল, সে-যুগের অনেকেই তা জানতেন। ১৭৮০ শকাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, "পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নামক এক ক্ষুদ্র সাময়িকপত্রে 'আলালের ঘরের দুলাল' শিরোনামে একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়। তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টিকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে।......ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবু বিলাস।[১] অতএব বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের কোন মৌলিকত্ব ছিল না, তিনি একজন পূর্বসূরীর পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বিষয়বস্তু স্বকীয় পরকীয় যাই হোক না কেন, প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র আকর্ষণ আজও সামান্যমাত্র হ্রাস হয়নি। তাই মনে হয়, ভাষার সর্বজনবোধ্যতা বা কাহিনীর মৌলিকত্বের জন্যে নয়, প্যারীচাঁদের গ্রন্থের আকর্ষণ ভিন্ন কারণে। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলিও তেমনি ভাষার সর্বজনবোধ্যতা বা কাহিনীর মৌলিকত্বের বিচার-বিশ্লেষণে নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণেই পাঠকমনকে আকৃষ্ট করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাসাগর-বিষয়ক মন্তব্যগুলি সতর্কভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলি সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল, আর সেই গ্রন্থগুলি থেকে বাঙালী পাঠক যে-রস আহরণ করতো, তারই ধারা অনুসরণ ক'রে প্যারীচাঁদের 'আলালে'র আবির্ভাব হয়েছিল। প্যারীচাঁদের গ্রন্থের সমালোচনায় তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে অনিবার্যভাবে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করতে হয়েছিল। এ অনুমান আরও দৃঢ় হয়, যখন দেখি বিদ্যাসাগর রচনাবলীর নির্বিচার উল্লেখ না ক'রে, বঙ্কিমচন্দ্র বেছে বেছে যে গ্রন্থগুলির নাম করেছিলেন, সেগুলি সে-যুগে অতি সহজেই পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছিল এবং সে-যুগের পাঠক সেগুলির মাধ্যমেই কাহিনী এবং গল্পের নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই 'আলালের ঘরের দুলাল'কে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল ; কারণ, আধুনিক-পূর্ব যুগে সেগুলিই বাঙালীপাঠককে উপন্যাস পাঠের স্বাদ প্রদান করেছিল। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থগুলিই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি প্রয়াসে অনন্যপূর্ব একটি দিগ্‌নির্দেশ করেছিল। সেই বৈশিষ্ট্যের বিচারেই বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' এবং 'ভ্রান্তিবিলাস' বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্মযোগী

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পুস্তিকা সং—৪, পৃ. ২৬

বিদ্যাসাগর সাহিত্যকেই একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলে তিনিই যে প্রথম সার্থক মৌলিক বাংলা উপন্যাস রচনা করতেন, এই গ্রন্থগুলিই তা প্রমাণ করে।

বিদ্যাসাগরের শব্দচয়ন এবং বিষয়-গৌরবকে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, পরবর্তীকাল কিন্তু তাঁর সে প্রয়াসকে সমর্থন করেনি। ভাষার রীতি বিচারে তিনি কেবল সংস্কৃত ও দেশী শব্দ ব্যবহারের অনুপাত নির্ণয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চেয়েছেন এবং নির্বিচার সংস্কৃত শব্দের অযথা ব্যবহারে ভাষাকে গুরুভার ও দুর্বোধ্য ক'রে তোলার অভিযোগে বিদ্যাসাগরকে অভিযুক্ত করেছেন। পূর্ববর্তী এক রবীন্দ্র-মন্তব্যের অলোকে আমরা দেখেছি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শিল্পীজনোচিত সহানুভূতি দিয়ে তিনি বাংলাভাষার প্রকৃতিকে উপলব্ধি ক'রে তার সাধর্ম্য অনুযায়ী সংস্কৃত শব্দ আহরণ করেছিলেন। কেবলমাত্র তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আশ্রয় ক'রে অগ্রসর হ'লে আমরা দেখতে পাই, ভাষারীতি বলতে বিদ্যাসাগর সেখানে আরও কিছু বুঝেছিলেন যার প্রকৃতি আরও মহৎ, যার প্রকাশ আরও সুন্দর, যার প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী এবং যার অনুসরণ আরও ফলপ্রসূ।

বাংলাভাষার রূপনির্মাণে এবং বাংলাসাহিত্যের ভাব-গঠনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অস্বীকারের বঙ্কিমী-প্রয়াসকে অগ্রাহ্য ক'রে বিনম্র নত মস্তকে অপরিশোধ্য বিদ্যাসাগর-ঋণস্বীকারের মধ্যে বাঙালী জাতি তার জাতীয় জীবনের মর্মবাণী আবিষ্কার করেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির প্রশংসা করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র রামগতি ন্যায়রত্নকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির ভিত্তিতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক-ভাষার রূপ নির্মিত হয়েছে ব'লে তাঁকে বাংলাভাষার প্রথম শিল্পী ব'লে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তাঁর এই শিল্পচেতনায় কেবল সুষম শব্দ-ব্যবহারের সুষ্ঠু নিপুণতাই ছিল না, তার সঙ্গে বক্তব্যকে সরল, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করার জন্যে কলানৈপুণ্যেরও অবতারণা ঘটেছিল। তিনি জানতেন ভাষার মধ্যে যেমন তেমন ক'রে কতকগুলো কথা পুরে দিলেই কর্তব্য শেষ হয় না। তাই বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল শব্দসম্ভারকে তিনি সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত ক'রে তার মধ্যে সহজগতি ও স্বচ্ছন্দ কর্মকুশলতা দান করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষা তাই

কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য ভাষামাধ্যমই হ'য়ে ওঠেনি, সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার সহযোগে তারমধ্যে শোভনতারও আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই বাংলা গদ্যভাষা সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের অবদানের স্বকীয়ত্ব আলোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করেছেন,

'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি, ইহাকে (বাংলাভাষাকে) পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।'[১]

অসাধারণ মনীষা এবং প্রতিভার মিলনে বিদ্যাসাগর এই যে গদ্যভাষা-রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তার ছাঁদটিই বাংলাভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করেছিল। বিদ্যাসাগরের এই অনন্যসাধারণ সার্থকতা রবীন্দ্র-নাথকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, বাংলাভাষার চূড়ান্ত সিদ্ধির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসের একমাত্র সার্থকতা কল্পনা ক'রে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

'যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোক দুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।'[২]

বাংলাসাহিত্যের চূড়ান্ত উন্নতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির চরম পরিণতির এই আশা তরুণ রবীন্দ্রনাথের যে লেখনী আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই লেখনীই একদিন সেই উন্নতির দ্বার খুলে দিয়েছিল। বিশ্ব-সাহিত্যের রাজসভায় আমাদের দীনা মাতৃভাষার জন্যে তিনিই একটি স্থায়ী আসন নির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন, বাংলাভাষাকে বিশ্বপৃথিবীর ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জ্বল রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের আদি উৎস হিসেবে তিনি বিদ্যাসাগরকেই প্রণাম জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বাঙালীজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাই রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই বাঙালীজাতি বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে,

'সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত,' চারিত্রপূজা
২ 'বিদ্যাসাগর চরিত', চারিত্রপূজা

সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম ক'রে সম্মানের অর্ঘ নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে গণ্য হয়।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের অস্বীকৃতি তাই রবীন্দ্রবাণীর বিনম্রতায় বহুগুণে স্বীকৃতিধন্য হ'য়ে উঠেছে। কেবলমাত্র ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের বিষয় বিচারেও বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বিদ্যাসাগরকে 'অনুবাদক' ও 'পাঠ্যপুস্তক রচয়িতামাত্র' প্রতিপন্ন ক'রে তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছেন, সেখানে বিদ্যাসাগরের লেখনী আশ্রয় ক'রেই বাংলা সাহিত্যভাষার দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুটন লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন,

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথ খননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে।'[২]

বিদ্যাসাগরে যার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথে তারই পরিণতি, বিদ্যাসাগরে যার উৎসমুখ রবীন্দ্রনাথে তারই সাগরসঙ্গম, বিদ্যাসাগরে যার দ্বারোদ্ঘাটন রবীন্দ্রনাথে তারই চরম বিকাশ। সত্তর বৎসরের সুবৃদ্ধ বিশ্ববন্দিত কবি তাই বিদ্যাসাগর-মহিমার প্রতি তাঁর কবিহৃদয়ের চরম শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন,

'বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'[৩]

৩

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদানকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বাংলার সমাজজীবনের সংস্কার সাধনায় বিদ্যাসাগরের প্রয়াসকেও তিনি তেমনি ভাঁড়ামিপূর্ণ হাস্যকরতায় অকিঞ্চিৎকর ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে

১ 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি', চারিত্রপূজা

২ 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি', চারিত্রপূজা

৩ 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি', চারিত্রপূজা

সঙ্গে ১২৮০ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের যে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর অকারণ বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষের প্রকৃতি ও পরিমাণ উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকেই জানা যায়, 'বঙ্গদর্শনে'র এই বিরূপ সমালোচনায় বিদ্যাসাগর কিছুটা বিরক্ত বোধ করেছিলেন ব'লে তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্র এই সমালোচনাটি আর প্রকাশ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা কাট-ছাঁট ক'রে সমালোচনাটি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। পুনঃপ্রকাশের কারণ হিসেবে প্রারম্ভে একটি নাতিদীর্ঘ পরিচায়িকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,

'এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোনদিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।'[১] তীব্র সমালোচনামূলক অংশটি উঠিয়ে দিলেও, যে অংশটি উত্তরকালের মানুষদের বিচারের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর বক্তব্যের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে ব'লে তিনি মনে করেছিলেন। সেই অংশটির আলোচনাতেই বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচারে দ্বিতীয় গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনের ভ্রান্তি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ব'লে তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি আর প্রকাশ করেননি বটে কিন্তু বহুল প্রচারিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হ'য়ে প্রবন্ধটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমতের বিরুদ্ধতাই যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য, সেকথাও অনেক লোকেই বুঝতে পেরেছিল। বহুদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'কোন না

---

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

কোনদিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার না আমার'। সেই অনাগতদিনের বিচারের কালে তাঁর বক্তব্য যাতে ভবিষ্যতের পাঠক-বিচারকদের সামনে যথযথ-ভাবে উপস্থাপিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই সমালোচনাটি বিলুপ্ত না ক'রে, 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। তবে অনেক বিচার বিবেচনা ক'রে তীব্র সমালোচনাত্মক অংশটি তিনি উঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তিনি নিজেই তাঁর সমালোচনাটির কোন কোন অংশের অপ্রয়োজনীয়তা ও অযৌক্তিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য বিচার হবে তার সারবত্তা অনুযায়ী, প্রকাশভঙ্গীর তীব্রতা কখনও নিরপেক্ষ বিচারবোধকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তাই, 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে আমরা বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর চিন্তাপ্রসূত সুনিশ্চিত বক্তব্য, মন্তব্য ও যুক্তিধারার সঙ্গেই পরিচিত হই, কোন ক্ষণিক উত্তেজনার তীব্র প্রকাশরীতি এখানে তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট ক'রে তোলেনি। বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থ দু'টিতে বিদ্যাসাগরও তাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাই বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনাতে আমরা—দোষ কার, বিদ্যাসাগরের না বঙ্কিমচন্দ্রের—তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। একটি জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে সে-যুগের দুই দিকপাল মহাপুরুষের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'লে, শতাব্দী-পাদের এপারে ব'সেও আজ আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি, কার বিচার ছিল যথাযথ, একটি সমকালীন সমস্যাকে কে বেশি স্বচ্ছভাবে, সুষ্ঠুভাবে এবং চিরকালের পটভূমিকায় বিচার ক'রে তার সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পেরেছিলেন!

সমালোচনার প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের বিচার্য বিষয় নির্দেশ করেছেন, 'ইহার বিচার্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত কি না!' বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থ দু'টিতে এই বিষয়টি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ক'রে প্রমাণ করেছিলেন যে, বাল্যবিবাহের এবং বহুবিবাহের প্রাবল্যের সঙ্গে বিধবা-বিবাহের অকারণ বিরোধিতায় বাঙালী হিন্দুর বিবাহ ব্যবস্থায় শাস্ত্রের স্থানে দেশাচারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ক'রে অশিক্ষিত, দুরভিসন্ধিপরায়ণ এবং ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজপতিরা নানা নিয়মবিধির প্রচলন ক'রে শাস্ত্রকে অস্বীকার ক'রে চলেছে। অথচ সেইসব অশাস্ত্রীয় নিয়মবিধি শাস্ত্রীয় ব'লেই জনসমাজে প্রচার করা হয়েছে। সেই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ক'রে বিদ্যাসাগর

প্রমাণ করেছিলেন শাস্ত্রের বেনামীতে প্রচারিত দেশাচারের প্রবল প্রতাপই এই বিবাহবিধির জন্যে দায়ী, এ-বিষয়ে শাস্ত্রের কোন নির্দেশই নেই। এই বিকৃত বিবাহবিধি পরিহার করলে তাই শাস্ত্রের কোন বিধিই লঙ্ঘিত হবে না, অথচ দূরীভূত করা হবে অমানবীয় দেশাচারকে। দেশাচারের কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই, তাই দেশাচারকে অস্বীকার করার অর্থ শাস্ত্রকে অমান্য করা নয়। কারণ, শাস্ত্রের মধ্যেই স্পষ্ট বিধান আছে যে, শাস্ত্র আর দেশাচারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে দেশাচার পরিত্যাগ ক'রে শাস্ত্রই গ্রহণযোগ্য। দেশাচার অনুযায়ী এই বহুবিবাহ বহুল প্রচলিত হ'লেও অশাস্ত্রীয় ব'লে শাস্ত্রমতেই তা নিষিদ্ধ। বহুবিবাহের বিরুদ্ধতাকল্পে বিদ্যাসাগর তাই অতি সঙ্গত কারণেই দেশাচারকে অস্বীকার ক'রে শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়ে বহুবিবাহ বিরোধী একটা পরিবেশ গঠন করতে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গ্রন্থের বিচার্য বিষয় 'যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত কিনা' ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র যে নির্দেশ দিয়েছেন, আপাত নির্দোষ হ'লেও, সেই শিরোনাম দিয়ে বিদ্যাসাগরের মূল প্রতিপাদ্যবিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় না ব'লেই মনে হয়। বঙ্কিম নির্দিষ্ট শিরোনাম দেখে অতি স্বাভাবিকভাবেই মনে হ'তে পারে, বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের পণ্ডিতী বিচারই বুঝি বিদ্যাসাগরের গ্রন্থরচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তখন স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা জন্মাতে পারে যে, শাস্ত্রে বিধি থাকলে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের সমর্থক হতেন, নিষেধ আছে ব'লেই তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অনুযায়ী বহুবিবাহের সমর্থন বা বিরুদ্ধতায় অগ্রসর হননি। বহুবিবাহরূপ যে কুৎসিত সামাজিক-প্রথা বাঙালী হিন্দুসমাজে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যাদোষের প্রবাহমুখ নির্বারিত ক'রে দিয়েছিল, তারই নিরাকরণকল্পে তিনি বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনে নেমেছিলেন, সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের জন্যেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই আইন প্রণয়নের জন্যে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যেই তাঁকে শাস্ত্র বিচারে নামতে হয়েছিল, কারণ, এদেশের মানুষ যুক্তি বা ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে যতোই আবেগপূর্ণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারই করুক না কেন, সামাজিক জীবনে তারা অন্ধভাবে শাস্ত্রকেই অনুসরণ করতো। সমাজমানসের এই শাস্ত্রানুগত্যচেতনায় বিদ্যাসাগর ছিলেন এক বিরল ব্যতিক্রম। 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে আট-নয় বছরের মেয়ের বিবাহদানের বিধিকে তিনি তাই 'কল্পিত ফল মৃগতৃষ্ণা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাই মনে হয়, বিধবা-

বিবাহ প্রচলনের মতো বহুবিবাহ বিরোধিতার ক্ষেত্রেও, শাস্ত্রীয় বিধিপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র ছিল। শাস্ত্রে তাঁর অনুকূল বিধির সন্ধান না পেলে তিনি শাস্ত্রকেও অস্বীকারের আহ্বান জানাতেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই, সেক্ষেত্রে তাঁর বিচার-পদ্ধতি বা আন্দোলনের ধারা ভিন্নপথেই পরিচালিত হ'ত। তাই বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের বিচার্য বিষয় 'যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত কিনা' ব'লে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে কিছুটা অব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে ব'লে মনে হয়। বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থ দু'টিতে বিদ্যাসাগরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বহুবিবাহ বিরোধী একটি জনমত গঠন ক'রে এব্যাপারে সরকারকে দিয়ে এমন একটি আইন পাশ করানো, যার ফলে এই কুপ্রথা হিন্দুসমাজ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। সেই উদ্দেশ্যেই, সামাজিক ব্যাপারে এদেশের মানুষের শাস্ত্রবিহিত পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণের অপারগতায়, বিদ্যাসাগরকে বাধ্য হ'য়েই শাস্ত্রমার্গ অবলম্বন করতে হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের বিচার্যবিষয় নির্ণয় ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সেই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবেশকালে সচেতন বিদ্যাসাগর-বিরোধিতায় আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে লিখেছেন,

'আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্মশস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; সুতরাং এবিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের বক্তব্যেই এখানে পরস্পর বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজেই যে গ্রন্থের বিচার্যবিষয় সম্পূর্ণভাবে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ব'লে মনে করেছেন, সেই গ্রন্থের সমালোচনার প্রারম্ভে তিনি ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে আপন অজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে গ্রন্থ সমালোচনার প্রাথমিক অধিকারটিই হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এবং আমাদের মন্তব্যের কোনটিই যথার্থ নয়। বিদ্যাসাগরের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সমালোচনায় খুব কম লোকেরই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যোগ্যতা ছিল। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজের অযোগ্যতার কথা প্রথমে প্রচার না করলে তাঁকে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রারম্ভেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ত। সচেতনভাবে বিদ্যাসাগর-

১ 'বহুবিবাহ,' বিবিধ প্রবন্ধ

বিরোধিতায় অবতীর্ণ হ'য়ে প্রথমেই বিদ্যাসাগরের জয় ঘোষণা তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ছিল ব'লে তিনি, 'সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙ্গে' পদ্ধতিতে অতি নির্দোষ ভঙ্গীতে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আপন অজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে সে-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতামত দানের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু প্রকাশভঙ্গী যতোই নির্দোষ হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য তত নির্দোষ ছিল না। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তির ধর্মশাস্ত্রীয় আলোচনা-পুস্তকের সমালোচনার কোন অধিকার নাই। অনধিকারীর আলোচনা পক্ষপাত দুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এবং তা হ'তে যে বাধ্য তিনি তা ভালোভাবেই জানতেন। তাই অনধিকারীর আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখে তিনি সচেতন বিদ্যাসাগর-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অনধিকারীর বক্তব্য প্রকাশের সপক্ষে তাই তাঁকে একটি হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে,

'তবে, এবিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।'[১]

সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় একটি বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কোন বক্তব্য থাকতে পারে কি না, সে-বিষয়ে পাঠকমনে সন্দেহ জাগা অতি স্বাভাবিক। কারণ, শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ব্যক্তির শাস্ত্রীয় বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশে শাস্ত্রের মাহাত্ম্যও বাড়ে না, বক্তব্যবিষয়ের সারবত্তাও থাকে না। সেই ধরণের ব্যক্তির যখন শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিচারে ইচ্ছা জাগে, তখন সে-বিচার ত্রুটিপূর্ণ এবং একদেশদর্শী হ'তে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাতেও সে দোষ ঘটেছে। তবে তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব নয়, তার কারণ নিহিত আছে আরও গভীরে। 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতার শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা যে কতোবড়ো প্রলোপোক্তি তা ওই গ্রন্থগুলি পাঠ করলে অনায়াসেই বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে, একথা সত্যও নয়, বৈষ্ণববিনয়ও নয়, বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করার একটি কৌশলমাত্র। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারবিষয়ক গ্রন্থগুলি সমালোচনা করার জন্যে যে পরিমাণে সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, বঙ্কিমচন্দ্রের তা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীনতার ঘোষণা সত্ত্বেও সমালোচনার সর্বত্রই সে-জ্ঞানের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনাটি তাই কোনক্রমেই একজন অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির শাস্ত্রালোচনার ধৃষ্টতা ব'লে তুচ্ছ করা যায় না।

---

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

সমগ্র সমালোচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য সর্বত্রই এমন প্রকটভাবে পরস্পর-বিরোধী হ'য়ে উঠেছে যে, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানসম্পন্ন পাঠকেরও প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে সন্দেহ জাগে যে বিদ্যাসাগর-প্রতিপাদিত একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা বর্ষিত হয়েছিল না, বিষয়নিরপেক্ষভাবে বিদ্যাসাগর-বিরোধিতার জন্যেই তাঁর লেখনী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল! বহুবিবাহ যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ ও সকলের পক্ষে বর্জনীয়, সে-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও যেমন কোন সন্দেহ ছিল না, তেমনি সাধারণ মানুষের মনেও কোন সন্দেহ আছে ব'লে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানাবিধ শাস্ত্রীয় এবং মানবিক যুক্তিপূর্ণ বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের কোন যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি বা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিরোধী প্রচারকার্যের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এতোদূর নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সমর্থনকারী পণ্ডিতকুলকেও তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধতাকারী ব'লে চিত্রিত করতে ইতস্ততঃ করেননি,

'যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদেরও এইমাত্র উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 'ভাবের ঘরে চুরি' করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর-প্রতিবাদীরা কেউ বহুবিবাহকে সুপ্রথা বলেননি, কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রথা বলেছেন। শাস্ত্র অনুযায়ী সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই বহুবিবাহকে শাস্ত্রীয় ব'লে ঘোষণা ক'রে তাঁরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বহুবিবাহকে সুপ্রথা বলেননি, কিন্তু বহুবিবাহ রহিত হ'লে কুলীনদের কুলক্ষয় হ'বে ব'লে চিৎকার করেছিলেন, ভঙ্গকুলীনদের স্বার্থহানি হবে ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, কায়স্থদের আত্মরসের ব্যাঘাত ঘটবে ব'লে আঁতকে উঠেছিলেন। তাঁরা বহুবিবাহকে সুপ্রথা বলেননি, কিন্তু বহুবিবাহের নিরাকরণে যে সমস্ত ক্ষতির খতিয়ান দিয়েছিলেন, সেইসব ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে বহুবিবাহের বহুল প্রচলন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিবাদীদের গ্রন্থ পড়েননি বলেছেন, প্রথমে সে কথা বৈষ্ণব বিনয় বা কথার কথা

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

ব'লে মনে হ'লেও তাঁকে বিদ্যাসাগর-প্রতিবাদীদের ঢালাও প্রশংসাপত্র দিতে দেখে মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় সত্যিই তিনি সে-সব গ্রন্থ পড়েননি। না প'ড়েই তাঁদের বক্তব্যবিষয় অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন এবং সেই বক্তব্যে দোষের কিছু খুঁজে পাননি। তাই অকারণে বিদ্যাসাগরকে খুঁচিয়ে ঘা করতে দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মর্মাহত হবার ভাণ ক'রে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধের পরিত্যক্ত তীব্র সমালোচনা অংশটি আমরা বিচার্য হিসেবে গ্রহণ করিনি, তা না হ'লে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সে ক্রোধের পরিমাপ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারতাম।

সমাজসংস্কারের আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল যে, এ দেশের হিন্দুসমাজে, ভালোমন্দ নির্বিশেষে, প্রতিটি সামাজিক প্রথারই সমান সম্মান। শাস্ত্রীয়ত্ব হেতু যে-কোন অমানবিক প্রথাও তার কাছে সমানভাবেই আদরণীয়। অমানবীয় প্রথা যতক্ষণ না অশাস্ত্রীয় ব'লে প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ তার প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে সমাজ-মনে কোন বিচার বিবেচনা জাগবে না। সেইজন্যেই সর্বাগ্রে তিনি শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন ক'রে বহু-বিবাহের নিষেধাজ্ঞা অন্বেষণ করেছিলেন, পরিত্যাজ্য বহুবিবাহপ্রথার অশাস্ত্রীয়-তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-অন্বেষণকারী বিদ্যাসাগর-বিরোধীদের উদ্দেশ্য ছিল বহুবিবাহের প্রচলন অব্যাহত রাখা, তাই তাঁদের বক্তব্যে বা মনোভাবে বহুবিবাহ-বিরোধিতার কোন পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু প্রাচীনপন্থী সংস্কারবিরোধী এই একদেশদর্শী গোঁড়া পণ্ডিত সমাজকেও সেই গৌরব দান করতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের ঘাড়ে বহনাতীত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। সমাজ-ব্যাপারে এদেশের জনমনের বিশেষ প্রবণতা বিদ্যাসাগরের মতো তাঁর প্রতিবাদীরাও বুঝেছিলেন ব'লে বিদ্যাসাগরের মত তাঁরাও শাস্ত্রমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের যেখানে উদ্দেশ্য ছিল বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন, তাঁর বিরোধীরা সেখানে তার শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনেই তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন। তাই বহুবিবাহের বিলোপসাধনই যেখানে বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য ছিল, অতি স্বাভাবিক-ভাবেই সেখানে তাঁর বিরোধীদের সে প্রথার প্রচলন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য কোথাও গোপন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁদের সেই মূল উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বহুবিবাহ-বিরোধী হ'য়েও তাঁরা বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা মাত্র প্রমাণ করতে চান। এর দ্বারা কিন্তু

এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যাসাগর-বিরোধীরাও যেহেতু বহুবিবাহ-বিরোধী তাই সেই অসমর্থনীয় প্রথার শাস্ত্রীয়তাহেতু তাঁরা শাস্ত্রেরও বিরোধী। বিদ্যাসাগর-বিরোধীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বা তাঁদের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস বশতঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করতে চাননি, তাঁদের বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতাই তাঁকে একাজে প্রবৃত্ত করেছিল। 'তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই' ব'লে তিনি অজ্ঞতার ভাণ ক'রে বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করার সুযোগের পরিধি বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। সত্যিই তাঁর সেই সুযোগ লাভ ঘটেছে; কারণ, বিদ্যাসাগর বিরোধীদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে তাঁর মতো যুক্তিবাদীর পক্ষে তাঁদের বক্তব্য কোন ক্রমেই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

বহুবিবাহ বিষয়ে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক আগে থেকেই একটা বিরুদ্ধ মনোভাব গ'ড়ে উঠলেও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাতেই সেই বিরুদ্ধতা একটা সজীব আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। বহুবিবাহের লজ্জাকরতা ও অনিষ্টকারকতা সম্বন্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের কোন কৃতিত্বই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করতে চাননি। এই প্রথার জঘন্যতা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চিরকালীন সচেতনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বহুবিবাহকারীদেরও এই প্রথার বিরুদ্ধতাকারী ক'রে চিত্রিত করতে চেয়েছেন,

'যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ-প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের ওপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন সে স্বতন্ত্র কথা।'[১]

এই 'স্বতন্ত্র কথা'টি বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করেননি। তা যদি তিনি করতেন তাহ'লে বহুবিবাহপ্রথা ও কৌলীন্যের নিন্দাকারী বহুবিবাহ পরায়ণ ব্রাহ্মণদের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে যেতো আর তাতে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যই আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ত। সেই 'স্বতন্ত্র কথা'টি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করতে না চাইলেও তা একেবারে অপ্রকাশিত থাকেনি। বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে বিদ্যসাগর সেকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছিলেন।

বহুবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর-বিরোধীরা বহুবিবাহের সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান যুক্তি ছিল যে, বহুবিবাহের নিরাকরণে কেবলমাত্র ধর্ম ও শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধাচরণ হবে না, কুলীন ব্রাহ্মণদের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটবে, ভঙ্গ কুলীনদের সর্বনাশ হ'বে আর কায়স্থ জাতির

[১] 'বহুবিবাহ,' বিবিধ প্রবন্ধ

আত্মরসের ব্যাঘাত ঘটবে। জাতিপাত ও ধর্মলোপের কথা ছিল মূল্যহীন, পরবর্তী কারণগুলিই ছিল প্রধান। বহুবিবাহকে কেন্দ্র ক'রে সে-যুগে কুলীন ও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণ এবং কুলীন কায়স্থদের মধ্যে বেশ একটি লাভজনক বিবাহ ব্যবসায় গ'ড়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র দয়া ক'রে একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করলে কিঞ্চিৎ নগদ অর্থলাভ ঘটতো, অথচ বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্যে কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'ত না। এইরকম সামাজিক পরিস্থিতেতে কুলীন বা ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণ এবং কুলীন কায়স্থদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিতান্ত দুরাচারী, অর্থলোলুপ, পাষণ্ড বিবাহব্যবসায়ী গ'ড়ে উঠেছিল। বিবাহ করা তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায়ই ছিল না, প্রভূত অর্থ উপার্জনেরও একটি সহজ পন্থা ছিল। কুলীন গৃহে আকস্মিক জন্মগ্রহণ-জনিত মহাপুণ্যের ফলে এমনিভাবে বিবাহ ব্যবসার দ্বারা তারা আনন্দ ও আরাম উপভোগ করতো। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা ধর্মের ধ্বজাধারী এই সমস্ত পাষণ্ডের নীচ প্রকৃতি সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিলেন। মুখে বহুবিবাহের নিন্দা করলেও নির্বিচারে বহুবিবাহ ক'রে কিঞ্চিৎ নগদ প্রাপ্তির এই অর্থ নৈতিক কারণই ছিল বঙ্কিম-কথিত সেই 'স্বতন্ত্র কথা'। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধতাকল্পে অত্যন্ত তীব্রভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বতন্ত্র কথা'র দোহাই দিয়ে এই অর্থ নৈতিক কারণটিকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন।

কেবলমাত্র যুক্তিতর্কেই আপন বক্তব্য সীমাবদ্ধ না রেখে বহুবিবাহের ফলে বাঙালী হিন্দুসমাজের দুরবস্থার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার বহুবিবাহ-কারীদের একটি তালিকাও বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন। সত্যাসত্য নির্ণয়ের সুবিধার জন্যে তিনি কলকাতা থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাত্মাদের একটি পৃথক তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই তালিকা সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,

'আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশদ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই।'[১]

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অন্যায়ভাবে পাঠকচিত্তের ওপর অযথা অত্যাচার করেছেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে অনৃতভাষণের অভিযোগ আনছেন যাঁর যশ ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সত্যবাদিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর নিজের যুগেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা তালিকা প্রদানের অভিযোগের কথা অনেকের মুখে শুনেই তিনি বিশ্বাস ক'রে ফেলেছিলেন, কেউ কেউ যা বলে তিনি তা নির্বিচারে ছেপে দিয়েছিলেন। আবার তাঁর দু'একটি জানা ব্যাপার বিদ্যাসাগরের তালিকার সঙ্গে না মেলায় আমরা বিদ্যাসাগরের তালিকার ওপর দোষারোপ করতে পারি না। তাঁর কথাতে পাঠক বিশ্বাস রাখবে ব'লে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা থাকলেও বিদ্যাসাগরের তালিকা থেকেও তিনি যেখানে ভুল বার করতে পারেন, সেখানে তাঁর প্রমাণহীন কথাও পাঠকদের বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত নয়। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের ঋজুতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের এই অস্পষ্টতার তুলনা ক'রে মনে হয় বিদ্যাসাগর-বিরোধিতায় অত্যুৎসাহী হ'য়ে প'ড়ে বঙ্কিমচন্দ্র সবদিক ঠিকমতো বিবেচনা ক'রে চলতে পারেননি ; তাই বিদ্যাসাগর-উদাহৃত তালিকার ভ্রান্তি প্রমাণ কালে কোন যুক্তি বা পালটা তালিকা পেশ না ক'রে অজানা লোকেদের মুখের কথার ওপর পাঠকসাধারণকে নির্ভর করতে ব'লে তাদের ওপর বড়ো বেশি অত্যাচার ক'রে ফেলেছেন। বিশেষ ক'রে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধতাকালে বিদ্যাসাগরের মতো লোক, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন, সেখানে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও যে মিথ্যাকথা বলবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়! 'অনেকের মুখে' শুনে বা 'কেহ কেহ বলেন' দেখে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অনুসারে আপন বক্তব্য গ'ড়ে তুললেও তাঁর সংবাদসূত্র এই বায়বীয় 'অনেকের মুখ' অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের লেখনীর দাম বা সম্মান অনেক বেশি ; তাই আধুনিক যুগের পাঠক 'অনেকের মুখ' অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের ওপরই বেশি আস্থাশীল। তালিকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিজেই লিখেছিলেন,

'কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিক সংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে

কোনও কথা নাই ; যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছাপূর্বক সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই ; অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি ; জ্ঞানপূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।'[১]

গ্রন্থের পরিশিষ্টেও এই তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর আবার বলেছিলেন যে, বিবাহব্যবসায়ীরা কখনও পিতার মাতুলালয়ে, কখনও নিজের মাতুলালয়ে আবার কখনও বা পুত্রের মাতুলালয়ে বাস ক'রে থাকেন, অনেকের আবার সেরকমও কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই। তাই তাঁর তালিকাতেও তাঁদের যে বাসস্থান নির্দেশ করা হয়েছে, কোন কোন জায়গায় তার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। তাঁদের বয়স সম্বন্ধে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন পাঁচ বছর পূর্বে সংগৃহীত ব্যক্তিদের বয়স বর্তমানে আরও পাঁচ বছর বেড়ে গেছে, কেউ বা আবার মারাও গেছেন। বিদ্যাসাগরের এতো সতর্কতা সত্ত্বেও যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সন্দেহ করেছেন, তখন কেবলমাত্র 'অনেকের মুখে' শুনে আপনার বক্তব্য গ'ড়ে তুলে তার ওপর পাঠক সাধারণকে নির্ভর করতে ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির সম্বন্ধে সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বহুবিবাহের স্বল্পতা নির্দেশ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তারপর বলেছেন,

'এই বাঙ্গালায় এককোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে ; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদন পরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।'[২]

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতঃই 'ভাবের ঘরে চুরি' করেছেন। বিদ্যাসাগর কোন প্রসঙ্গেই বর্ণনির্বিশেষে সমস্ত বাঙালী হিন্দুকেই বহুবিবাহপরায়ণ ব'লে বর্ণনা করেননি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই কুৎসিত, মানবতাবিরোধী বহু-বিবাহের প্রাবল্য ঘটেছিল। অধঃপতিত ব্রাহ্মণসমাজ ঘটক দেবীবরের মেল-বন্ধন স্বীকার ক'রে কাল্পনিক কুলরক্ষার জন্যেই এই সর্বনাশা বিষবৃক্ষের চারা রোপণ করেছিল। ব্রাহ্মণদের মতো প্রবলভাবে না হ'লেও কায়স্থদের মধ্যেও এই কুপ্রথার কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়-গুলি কোনদিনই ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মতো শাস্ত্রের নামে মনুষ্যত্বের মস্তকে পদাঘাত করেনি। হিন্দুসমাজের কয়েকটি দুষ্টবর্ণের ঘৃণিত ব্যবহারের

১ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার'

২ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

ওপর কিছুটা প্রলেপ দেবার জন্তেই যেন, বঙ্কিমচন্দ্র সব কয়টি বর্ণের কথা টেনে এনে আনুপাতিক হিসেবে বহুবিবাহের স্বল্পতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

কেবলমাত্র তাই নয়, স্বল্পপ্রচলিত বহুবিবাহ প্রথাও যে অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে, সে-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

'কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুক্তিতে নতুনত্ব কিছু নেই। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থরচনার বহুপূর্ব থেকেই এই যুক্তি তথাকথিত আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করেছিল। বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম গ্রন্থে এই যুক্তির সমালোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

'কলিকাতাবাসী নব্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না; সুতরাং তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্কুচিতচিত্তে, তাহা করিয়া, থাকেন। তাঁহারা কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন। ঐ সকল মহোদয়েরা বলেন, এদেশে বিদ্যার সবিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে লিখেছিলেন, 'ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল'। কিন্তু কলকাতার মতো বাংলাদেশের সুদূর পল্লী অঞ্চলেও কি এই সুশিক্ষাপ্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচারের কোন সুবিধা ছিল? সেকথাই আলোচনা ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

'একথা যথার্থ বটে, বহুকাল ইংরেজীবিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইংরেজ জাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও কলিকাতার অব্যবহিত স্থানে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের, অনেক অংশে, নিবৃত্তি হইয়াছে; কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থানে, ইংরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না, ও ইংরেজ জাতির সহিত

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

২ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'

তদ্রূপ ভুয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না; সুতরাং সেই সেই স্থানে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তদবস্থাই রহিয়াছে। ফলতঃ পল্লীগ্রামের অবস্থা কোনও অংশে, কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ অসঙ্গত।... ...কলিকাতায় যত কাল ইংরেজীবিদ্যার যেরূপ অনুশীলন এবং ইংরেজজাতির সহিত যেরূপ ভুয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে; পল্লীগ্রামে যাবৎ, সর্বতোভাবে, ঐরূপ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ, কোনও মতে, সম্ভবিতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা।'[১]

কলকাতার অবস্থা বিচার ক'রেই সারা বাংলাদেশের সামাজিক প্রকৃতি ও প্রগতি সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন ব'লেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের কারণ ও প্রকৃতি যথার্থভাবে অনুধাবন ক'রে উঠতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের প্রয়াসকে তাই তাঁর বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয়েছিল এবং সে-সম্বন্ধে তাঁর চরম মন্তব্য শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল,

'এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।'[২]

বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে, লোকাচার নিয়ন্ত্রিত বিবাহবিধির সংস্কার সাধন ক'রে, ধর্মশাস্ত্রসম্মত বিবাহবিধি প্রচলনের জন্যেই বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল। সেই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিধি উদ্ধার ক'রে শাস্ত্র ও লোকাচারের বিরোধে লোকাচার পরিত্যাগ ক'রে শাস্ত্রমার্গ অবলম্বন করার জন্যে তিনি যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতিবাদ ক'রে লিখেছিলেন, 'বাস্তবিক মানবাদি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজ মধ্যে সম্ভব নহে'।[৩] কেবলমাত্র তাই নয়, আরও অগ্রসর হ'য়ে তিনি ধর্মশাস্ত্রের বিশুদ্ধি ও মঙ্গলকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, 'যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না,।[৪] এই একটি ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মানসের কিছুটা কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন ব'লে মনে

১ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'

২ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

৩ 'বহুবিধাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

৪ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

হয়। কোন রকম ধর্মশাস্ত্রীয় বিধানের অমোঘ মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সামান্যতমও বিশ্বাস ছিল না। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমাজসংস্কার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বা উত্তপ্ত সংবাদপত্র কলম মাত্র ছিল না। তিনি যা করা উচিত ব'লে মনে করতেন, তা করতেও চেষ্টা করতেন। বাঙালীহিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সংস্কার করা উচিত ব'লে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু সংস্কার কার্যে ব্রতী হ'তে গিয়ে দেখেছিলেন এদেশের লোক বলবার বেলায় যুক্তি প্রমাণ মানে, কিন্তু করবার বেলায় তাদের চাই শাস্ত্রের পাতি, তা না হ'লে একপাও অগ্রসর হতে পারে না। তাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিবিধানকে মরীচিকার মতো কল্পলোকের অমৃতফল দানকারী ব'লে মনে করলেও সাধারণ মানুষের প্রতীতির জন্যে তাঁকে সেই শাস্ত্রীয়বিধিবিধানেরই অন্বেষণ করতে হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কিছুটা বিদ্যাসাগর সন্নিকটবর্তী হ'লেও বিদ্যাসাগর যে-লোকাচারকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঘৃণা করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই লোকাচারকেই সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি ব'লে ঘোষণা করলেন,

'বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। সে সমাজ মধ্যে ধর্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচার সম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না।'[১]

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রসম্মত অথবা লোকাচার সম্মত কোন প্রথারই গুণগান করেননি, কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবতা সম্মত প্রথাসমূহের প্রচলন করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হিসেবেই তিনি শাস্ত্রমার্গ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত প্রথার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। তেমনি তাঁর কণামাত্রও আনুগত্য ছিল না লোকাচারের প্রতি। মানবতাবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতিকে বিচার করতে গিয়ে যেখানেই লোকাচারের বাধা দেখতে পেয়েছেন, সেখানেই তাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে তিনি নতুন পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এটা কেবল বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালের মহাপুরুষদেরই এই হোল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র কুসংস্কারের কারাগারে লোকাচারের

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

শিকলদেবীর চিরন্তনত্বের বন্দনা গানে কেবল বিদ্যাসাগরকেই নয়, বিশ্বপৃথিবীর মহামানব-চেতনাকেই যেন পরিহাস করেছেন!

বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর হিন্দুবিবাহের রীতি-পদ্ধতি উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে আমরা দেখেছি নিত্য, নিত্যনৈমিত্তিক এবং নৈমিত্তিক বিবাহ ভিন্ন বিবাহেচ্ছা থাকলে সবর্ণাব্যতীত অণুলোমক্রমে কাম্য বিবাহের বিধি আছে। এরপরই তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহের রীতি অপ্রচলিত হ'য়ে পড়ায় এই কাম্য বিবাহের বিধি আর প্রযোজ্য নয়। বিদ্যাসাগরের হিন্দু বিবাহবিধি সঙ্কলনের এই প্রয়াসকে ব্যঙ্গ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেছিলেন,

'আপনি কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেন না, সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয় কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব।'[১]

বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপনের উদগ্র কামনায় নিতান্ত সাধারণ অপরাধীর মতো কুযুক্তি প্রয়োগ ক'রে ফেলেছেন। তাঁর সেই কুযুক্তি আবার সত্য ঘটনা গোপন প্রয়াসের ওপরই গ'ড়ে উঠেছে। 'কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে, সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই'—এই বিদ্যাসাগর সিদ্ধান্তের অসারতা বা অযৌক্তিকতা প্রমাণ না ক'রে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে অনুলোমক্রমে একাধিক বিবাহের সুবিধা নাই দেখে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেই সিদ্ধান্তটি বেমালুম চেপে গেছেন। ভবিষ্যতের উত্তর পুরুষের কাছে বিচারের জন্যে দাখিল করার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। প্রতিবাদী বিদ্যাসাগরের লেখাগুলিও যে তারা বিচার ক'রে তবেই রায় দেবে, অভিজ্ঞ বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র তা, কেমন ক'রে ভুলে গেলেন বুঝতে পারা যায় না। কিম্বা, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়েও বিদ্যাসাগর বিদ্বেষের তীব্রতায় বঙ্কিমচন্দ্র কি তর্কবিজ্ঞানের ন্যূনতম জ্ঞানও বিস্মৃত হয়েছিলেন?

[১] 'বহুবিবাহ,' বিবিধ প্রবন্ধ

এই কুতর্কের পরিণতিতে কুসিদ্ধান্তে পৌঁছে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিধি উদ্ধারের নিষ্ফলতা উপলব্ধি ক'রে প্রশ্ন করেছেন, 'এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না, বৃদ্ধি হয়?'[১] বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রমার্গ অবলম্বনের কারণ কি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তা জানার চেষ্টা করেননি, করলে এ প্রশ্ন তাঁকে করতে হ'ত না। তিনি বুঝতে পারতেন শাস্ত্রের দোহাই দিলে বহুবিবাহ নিবারিতও হয় না, বর্ধিতও হয় না, শুধু বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধতার ভিত্তি ন'ড়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা করলেও বিদ্যাসাগরকে বুঝতে পেরেছিলেন ব'লেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। বহুবিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিবিধান সংগ্রহের পিছনে বিদ্যাসাগরের যে উদ্দেশ্য ছিল তা বর্ণনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সেই উদ্দেশ্যেরও সমালোচনা করেছিলেন,

'বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা এক মতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। ......সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়ক স্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এবিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না।'[২]

বিদ্যাসাগরের মনোভাব এবং উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই ধরেছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের সাহায্যে বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার দিবাস্বপ্ন বিদ্যাসাগর কোনদিনই দেখেননি। যে কোন উপায়ে হোক বহুবিবাহ নিরাকরণই বিদ্যাসাগরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবে রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়নের সাহায্যেই সে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। বিরোধী পণ্ডিতেরা সেই রাজকীয় আইন প্রণীত হওয়ার আশঙ্কাতেই বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সেইজন্যেই ভীত হ'য়ে প'ড়ে লিখেছিলেন, 'রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এবিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের

১ 'বহুবিবাহ.' বিবিধ প্রবন্ধ
২ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

উপযুক্ত বোধ হয় না। এবিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই?'[১] বহুবিবাহের শাস্ত্রবিরুদ্ধতা স্বীকার ক'রে সরকার আইন প্রণয়ন করলে, বঙ্কিমচন্দ্রের দাবী 'সদ্যস্বপ্রিয়বাদিনী, ক্ষত্রবিট্‌শূদ্র কন্যাস্তু......বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে।'[২] এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র আবার বিদ্যাসাগর কথিত কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহের অপ্রচলনের বিষয়টি অনুল্লিখিত রেখেছেন।

বহুবিবাহের নিরাকরণকল্পে আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধতা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র আরও একটি হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। আইন প্রণয়ন করা হ'লে তিনি মুসলমানদেরও সেই আইনের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন, 'এদেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত।'[৩] হিন্দু ধর্মশাস্ত্রবিধির ওপর নির্ভর ক'রে প্রস্তুত আইনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করার হাস্যকরতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সচেতন ছিলেন এবং সচেতনভাবেই এই যুক্তি দিয়েই আইন প্রণয়ন প্রয়াসকেই হাস্যকর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগে থেকেই মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ প্রথার কুফল নিয়ে হিন্দু পণ্ডিতরা খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের যথোচিত উত্তরও দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের ওপর হিন্দুধর্মের দোষগুণের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা যেমন কম, হিন্দুধর্মকে তাদের প্রভাবিত করারও সম্ভাবনা তেমনি কম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বহুবিবাহের বিপক্ষে আইন প্রণয়ন করার সম্ভাবনা থাকলে বিদ্যাসাগর তারই সপক্ষে কথা বলতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রভিত্তিক এই প্রথার বিরুদ্ধতাচরণ করতে গিয়ে স্বধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকেই তিনি যে পরিমাণ বিরুদ্ধতা লাভ করেছিলেন, মুসলমান ধর্মের শাস্ত্রবিধির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় মুসলমান ধর্মের বহুবিবাহবিধির বিরুদ্ধতা করলে যে অপ্রতিরোধনীয় বিরূপতার সম্মুখীন হ'তে হ'ত তা তাঁর উপলব্ধির অতীত ছিল না। তাঁর প্রায় একশো বছর পরেও বহুবিবাহবিরোধী

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ
২ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ
৩ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

আইন প্রণয়নের সময়, কেবলমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জন্যেই সে আইনের বক্তব্য গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকেই সে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় কেবলমাত্র বাঙালী হিন্দুদের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধতা ক'রে সে-যুগে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু বহুবিবাহের দোষদুষ্ট বাঙালী হিন্দুসমাজ শাস্ত্রবাক্য ছাড়া কোন সামাজিকবিধির সংস্কারের কথায় কান দিতে রাজি ছিল না, তাই তাঁকে শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ উদ্ধার করতে হয়েছিল।

এই শাস্ত্রবচন উদ্ধারের কারণ সম্বন্ধে প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্য প্রকাশ ক'রে আসছিলেন। এদেশের লোক সামাজিক ব্যাপারে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রের আপ্তবাক্যের ওপরই অধিক বিশ্বাস স্থাপন ক'রে থাকে। তাই বাধ্য হ'য়েই তাঁকে শাস্ত্রমার্গ অবলম্বন করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এ-বিষয় অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু, ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাব এবং ধর্ম শাস্ত্রের বচন উদ্ধারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে জেনেও, কেবলমাত্র ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি ছদ্মভক্তির আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, 'যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়।'[১] কোন সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এতো 'যদি' সহযোগে বাক্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি। পরের বাক্যেই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে, 'আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে ওইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যিনি কপটাচার করেন তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। ······যিনি এই পাপপূর্ণ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।'[২]

১ 'বহুবিবাহ', বিবিধ প্রবন্ধ

২ 'বহুবিবাহ . বিবিধ প্রবন্ধ

বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর রচিত গ্রন্থাদি পাঠ না ক'রে থাকেন, তাহ'লে বলবো এতো স্বল্পজ্ঞান নিয়ে বিদ্যাসাগরের মতো একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁর কথা বলা উচিত হয়নি। আর যদি তিনি তাঁর গ্রন্থাদি পাঠ করার পর এই সিদ্ধান্তে এসে থাকেন তাহ'লে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে তিনি যে কাপট্যের অভিযোগ এনেছেন, সেই অভিযোগে তিনি নিজেও অভিযুক্ত হ'য়ে পড়েন।

উত্তরকালের মানুষদের বিচারের জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধটি বিলুপ্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। উত্তরকালের নিরপেক্ষ বিচার কিন্তু তাঁর সপক্ষে রায় দিতে সক্ষম হবে না। ১২৯১ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রচারে' 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' ক'রে তিনি কয়েকটি অনুশাসন প্রচার করেছিলেন। তার মধ্যে চতুর্থ অনুশাসনটি হোল, 'যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।' বিদ্যাসাগর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কিন্তু এই অনুশাসন মেনে চলেননি। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয় যে, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রয়াসের বিরূপ সমালোচনার উদ্দেশ্যে রচিত 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার উপযুক্ত হয়নি।

বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় বঙ্কিমমানসের এই অব্যাপ্তিদোষ কিন্তু বিদ্যাসাগর বন্দনায় রবীন্দ্রনাথকে সামান্যতমও প্রভাবিত করেনি। তাই বাংলাদেশের নারীদের জীবন থেকে অন্যায় আর অত্যাচার বিদূরিত করার জন্যে বিদ্যাসাগরের যে আপোষহীন সংগ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ডন কুইক্সোটের ভাঁড়ামী ব'লে মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়েছিল অভ্রান্তভাবে,

'দীনদুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন, সেকথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা আরও অনেক বেশি, কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়—তাঁর বীরত্ব।'[১]

শাস্ত্রবচনে নিজের বিশ্বাস থাক আর না থাক, দেশের মানুষের বিশ্বাস

'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', চারিত্রপূজা

উৎপাদনের জন্যে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রমার্গ অবলম্বন করা বঙ্কিমচন্দ্র কপটতা মনে ক'রে তাঁকে 'কুশিক্ষার পরমগুরু' ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শাস্ত্রমার্গ অবলম্বনের পিছনে বিদ্যাসাগরের গভীর সহানুভূতি ও বেদনা-বোধকে উপলব্ধি ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের যেন প্রতিবাদ করেছিলেন,

'অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেননি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হ'য়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার ক'রে গেছেন।'[১]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর এই হৃদয়গুণেই পার্থক্য সূচিত হয়েছে। হৃদয়হীন সাধারণ মানুষ এদেশে স্ত্রীজাতির প্রতি একটা ঈর্ষাভাব পোষণ ক'রে থাকে; নারীর সুখ, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা তাদের কাছে পরিহাসের বিষয় প্রহসনের উপকরণ। মেয়েদের সেবা—তাদের সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ ক'রে তারা তাদের কৃতার্থ ক'রে থাকে। নারীর সেবা তাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সঙ্গে জড়িত ক'রে দেখে ব'লে তা তাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কৃতজ্ঞতা জাগাবার অবকাশ পায় না। এই গতানুগতিক উদাসীনতার মধ্যে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম হিসেবেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটেছিল। নারীর প্রতি স্নেহপূর্ণ ভক্তির প্রাবল্য তাঁর সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণরূপে নারীজাতির সুচিরকাল প্রবাহিত দুঃখ-বেদনার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহরূপে প্রকাশিত হ'য়ে নিস্তরঙ্গ বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, বাঙালীজীবনের দূরদিকচক্রবালে আজও তার সোনালী রেখার চিহ্ন বর্তমান। দেশের লোক তাঁর এই নতুন চিন্তাধারাকে সহজমনে গ্রহণ করেনি, বাধার পর বাধা সৃষ্টি ক'রে তাঁর কর্মপ্রয়াসকে স্তব্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বীর্যবত্তা, তাঁর সমস্ত বল উৎসাহের সঙ্গে আজন্মকালের জিদ যুক্ত হ'য়ে যে কর্মপ্রয়াসের সৃষ্টি করেছিল, তার দ্বারা সব বাধাই তিনি অক্লেশে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। প্রাণপণ প্রয়াসে বিদ্যাসাগরের এই বিজয়লাভের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলনের

[১] 'বিদ্যাসাগর', চারিত্রপূজা,

চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।'[১]

কিন্তু এই ব্রাহ্মণবীরের বিজয়লাভের ফল গ্রহণে এই দেশ ও সমাজ ব্যর্থ হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ বাধাই যে দেশের দেবতা, সে দেশ বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে না। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হ'য়ে থাকবে'। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সেই পরিচয় বাঙালীজাতির পক্ষে গৌরবের নয়। দেশের কাছ থেকে শাস্তি পানিনি ব'লে বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাতের যে বেদনা আজীবন বহন ক'রে গেছেন বাইরের অগৌরব আর অসম্মানের যে পুরস্কার তাঁর সর্ববিধ কর্মপ্রয়াসকে ভূষিত করেছিল, তার স্বরূপ উপলব্ধি এবং প্রকৃতি নির্ণয়ের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের সম্মাননার বিশেষ সার্থকতা লুকিয়ে আছে। এই প্রয়াসেই আমরা যে কেবলমাত্র যথার্থভাবে বিদ্যাসাগর প্রতিভাকে সম্মান জানাতে পারবো, তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের ধারাটিও যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবো, আর সেই উপলব্ধির আলোকেই আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রাপথের নিশানাটিও খুঁজে পাবো।

১ 'বিদ্যাসাগর চরিত', চারিত্রপূজা,

দশ

‘চিরকালের পথিক, চিরকালের পথ প্রদর্শক’

১

‘বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ! পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষাও মহত্তর, যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি দানশীলতা প্রকাশের সহিত বিষয় বাসনা ও আত্মগৌরবের ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন।’[১]

প্রতিভার সঙ্গে তেজস্বিতা, তেজস্বিতার সঙ্গে স্বার্থত্যাগ, স্বার্থত্যাগের সঙ্গে দানশীলতা এবং দানশীলতার সঙ্গে প্রকাশবিমুখতার সংযোগে বিদ্যাসাগর চরিত্রে যে বিরল বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিরলদর্শন ব্যক্তিচরিত্রের দুর্লভ বৈশিষ্ট্যে বিদ্যাসাগর তাঁর কীর্তি খ্যাতিকে ছাড়িয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। বাঙালীজীবনে বিরলদর্শন এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজ শতাধিক বৎসর ধ’রেই অন্তহীন প্রশ্নমালার সৃষ্টি ক’রে চলেছে,

‘বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।’[২]

‘এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।’[৩]

খেয়ালী বিধাতা কয়েক কোটি বাঙালী নির্মাণ করতে গিয়ে নিজের নিয়মের মধ্যে আশ্চর্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক’রে হঠাৎ বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ গ’ড়ে ফেলেছিলেন ব’লেই তাঁর আবির্ভাব বাংলাদেশের সমাজজীবনে একটা

১ রজনীকান্ত গুপ্ত—বিহারীলাল সরকারের ‘বিদ্যাসাগরে’ উদ্ধৃত; পৃ. ৬৩৭-৩৮

২ ‘রবীন্দ্রনাথ—‘বিদ্যাসাগরচরিত’, চারিত্রপূজা

৩ রামেন্দ্রসুন্দর—‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’, চরিতকথা

অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনা ব'লে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনা কেবলমাত্র ইতিহাসের নিষ্প্রাণ পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত ক'রেই বিগত শতাব্দীর বাঙালীজীবনের ঐশ্বর্যের পরিচয়ই বহন করছে না, সর্বকালের বাঙালীজীবনের প্রাণপ্রবাহে সার্থকতার চিরনবীন আদর্শরূপে স্পন্দমান হ'য়ে আছে। বিদ্যাসাগর দয়া মায়া স্নেহ মমতা পরোপচিকীর্ষা অথবা সাহিত্যিক প্রতিভার কোন একটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে কর্মক্ষেত্রে না নেমে মহান মানব যজ্ঞে তাঁর সামগ্রিক জীবনটিকেই আহুতি দিয়েছিলেন ব'লে বাঙালীর ইতিহাসে বিরল-বৈশিষ্ট্য এক অধ্যায় রচনা করে চিরন্তনত্বের অনন্ত উৎস হ'য়ে আছেন।

দয়া মায়া করুণা প্রভৃতির আদর্শ তুলে ধ'রে বিদ্যাসাগর বাঙালীজীবনে আর একটি অবতারের আবির্ভাবকে প্রকট ক'রে তুলতে চাননি। আজীবন সাধনায় তার মনুষ্যত্বের একটা মেরুদণ্ড গ'ড়ে দিতে চেয়েছিলেন, নিছক বাঙালীত্বের আবরণ ছিন্ন ক'রে তিনি বাঙালীকে মনুষ্যত্বের স্বর্গলোকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, আর এই মনুষ্যত্বের আদর্শ হিসেবে তিনি অপ্রাকৃত কোন স্বর্গীয় চরিত্রকে তার সামনে তুলে ধরেননি, পরিপূর্ণ মনুষ্যমহিমায় সুসজ্জিত নিজের জীবনটিকেই উপস্থাপিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনায় চিরদিনই এই বৈশিষ্ট্যটি ধ্রুবতারকার মতো তাঁর সর্ববিধ কর্মপ্রেরণার দিক নির্দেশ করেছে। তাঁর চরিত্রবিচারে এই বৈশিষ্ট্যই তাই রবীন্দ্রনাথকে প্রথমেই বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে তুলেছিল,

'বিদ্যাসাগরের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।'[১]

মানুষ ছিলেন ব'লেই মনুষ্যত্বের সাধনা বিদ্যাসাগরের জীবনে একমাত্র ব্রত হ'য়ে উঠেছিল। সেই সাধনায় বিদ্যাসাগরজীবনে উপদেশের স্থান ছিল না, বাণীপ্রদানের অবসর ছিল না ; ছিল কেবল নিচ্ছিদ্র কর্ম-প্রেরণা আর নিরুদ্যম কর্মপ্রয়াস। তাই কর্মময় জীবনটিকে ইতিহাসের সামনে তুলে ধ'রে সে-যুগে একমাত্র তিনিই শুধু দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারতেন,—'আমার জীবনই আমার বাণী '।

এই মনুষ্যমহিমা বিদ্যাসাগরকে সমকালীন জীবনধারায় যেমন বৈশিষ্ট্য দান

---

১ 'বিদ্যাসাগর-চরিত', চারিত্রপূজা

করেছিল, চিরকালীন মানবসভ্যতায় তাই আবার তাঁর জীবনধারাকে বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। জীবন মৃত্যুর সীমানা নির্ধারণে তাই উনিশ শতকের মানুষ হ'লেও বিদ্যাসাগর ছিলেন চিরকালের আধুনিক, বর্তমান যুগচেতনার সঙ্গে তাই তাঁর আশ্চর্য সমধর্মিতা আর অসীম সহধর্মিতা। বর্তমান যুগচেতনার আলোকে বিচার করলে দেখি এ-যুগেও তিনি আধুনিকোত্তম, একশো বছর আগেই তিনি যে মানসিকতায় সহজে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আজও আমরা তার থেকে বহু পশ্চাতে প'ড়ে আছি। তাই বুঝতে পারি তিনি কেবল ভবিষ্যতের যাত্রাপথের চিরন্তন পথিকই নন, অভ্রান্তদৃষ্টি পথ প্রদর্শকও।

২

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন হোল নিরবচ্ছিন্ন অপরিতৃপ্তির এক ক্ষুব্ধ ইতিহাস। আপাত সাফল্যের অভ্যন্তরে সেই অপরিতৃপ্তি আর ক্ষুব্ধতা কোথাও চাপা পড়েনি। গুরু জয়গোপাল তাই যখন বয়সের দোহাই দিয়ে তাঁকে সাহিত্য-শ্রেণীতে গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বালক বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে যথোপযুক্ত পরীক্ষা ক'রে গ্রহণ করার জিদ ধরেছিলেন এবং সে পরীক্ষায় তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো ছেলেদের অপেক্ষা অনেক ভালো ফল ক'রে গুরুকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। গুরু প্রেমচাঁদের আগ্রহে মাত্র একঘণ্টার মধ্যে উত্তর ক'রে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত রচনার জন্যেও প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই জজ পণ্ডিতের চাকরির জন্যে পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। ছাত্র-জীবনের এইসব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-জীবনের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে, সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ আহরণকে তিনি কোনদিনই হেলা করেননি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেবিদ্যা আহরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেও উত্তরজীবনে তাঁর কর্মধারায় দেখা যায় সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ পূর্বপুরুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ আহরণকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উদ্যমী পুরুষ কেবলমাত্র সঞ্চিত সম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, বিচিত্র পথে তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আরও ঐশ্বর্যবৃদ্ধিই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানযুগের উপযোগিতার বিচারে পূর্ব-পুরুষের অর্জিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সবটুকুই গ্রাহ্য না হ'লেও তার কতটুকু প্রয়োজন আর কতটুকুই বা পরিত্যাজ্য সামগ্রিকভাবে সংস্কৃত ভাষা ভাণ্ডারের ওপর পূর্ণ অধিকার না জন্মালে তা যে বোঝা যাবে না তা ছাত্রাবস্থাতেই বিদ্যাসাগর ভালোভাবেই

বুঝতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ প্রত্যাহৃত হ'লে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও তার পুনঃ প্রবর্তনের আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনে এই কথাটার ওপর তাঁরা জোর দিয়েছিলেন যে, সংস্কৃত ভাণ্ডারের অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও ইংরেজি-জ্ঞানের অভাবে আধুনিক জীবনোপযোগী কোন কর্ম গ্রহণেই তাঁরা সক্ষম হবেন না। তাঁদের সে আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। তথাপি সংস্কৃত শিক্ষার অতি সীমায়িত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েও বিদ্যাসাগর সে শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাননি। তাই হৃদয়ের অতৃপ্তি সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন প্রচলিত শিক্ষাবিধির প্রতি একাগ্রচিত্ত আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তারপর প্রথম সুযোগেই সে জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি আদর্শ শিক্ষাদর্শন গ'ড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর শিক্ষাদর্শনে প্রাচীনবিদ্যার প্রতি অযথা আনুকূল্য প্রদর্শিত হয়নি। ছাত্রজীবনে প্রচলিত শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে সর্ববিধ্বংসী বিদ্রোহের তিনি যেমন কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি, তেমনি শিক্ষাবিধির সংস্কার কল্পনাকালেও সেই শিক্ষাকেই চরম উৎকর্ষময় ব'লেও গ্রহণ করতে পারেননি।

পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য আহরণের পর বিদ্যাসাগর আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যা আহরণের জন্যে ইংরেজিভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তার ফলে ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের দ্বার তাঁর কাছে অবারিত হ'য়ে গিয়েছিল। তার অতুল ঐশ্বর্য, প্রচণ্ড ক্ষমতা, মানবাভিমুখী জীবনচেতনা আর বর্তমান বিশ্বসভ্যতার ভবিষ্যৎ বিবর্তনধারা উপলব্ধি ক'রে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন অতীতের সীমানায় পরলোকের চিন্তায় আবদ্ধ জাতিকে আধুনিক বিশ্বজীবন-ধারার প্রবাহপথে এগিয়ে দিতে গেলে তাকে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানে দীক্ষা দিতে হবে, অলৌকিক অবাস্তব পরলোকতত্ত্ব থেকে মানবচেতনায় নামিয়ে আনতে হবে, দৈবানুগ্রহের স্থানে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে হবে। আবার এই শিক্ষাকে চরিত্রের সঙ্গে জীবনচেতনার সঙ্গে সংপৃক্ত ক'রে তুলতে গেলে মাতৃভাষার মাধ্যমই একমাত্র উপায়। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক মানবীয় শিক্ষাদানই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের মূল প্রস্তাবনা হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছিল। বর্তমান বাঙালী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার যেটুকু আলোক বর্ষিত হয়েছে এই বিদ্যাসাগরীয় শিক্ষা চিন্তাই তার মূল উৎস, আবার আধুনিক শিক্ষার সুফল থেকে তার জীবনে যেটুকু বঞ্চনা জুটেছে, তার মূলে আছে বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এই ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তাই একজন আধুনিক সমালোচক যথার্থ মন্তব্য করেছেন,

'প্রকৃতপক্ষে নব্য শিক্ষারীতির স্রষ্টা বিদ্যাসাগর ; রামমোহন, ডেভিড হেয়ার বা অপর কেহ নহেন। হিন্দু-কলেজের শিক্ষিতসমাজকে ইয়ং বেঙ্গল বলা হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগরীয় রীতির শিক্ষিতসমাজকে মডার্নম্যান বলা অন্যায় হইবে না। বিংশ শতক বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে শিক্ষিত সমাজের উত্তর পুরুষ—বিদ্যাসাগরকে তাহার আত্মীয় মনে না হওয়া অসম্ভব।'[১]

বাংলাভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্ববিজ্ঞান শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যাসাগর যে বাংলাভাষার প্রকাশ ক্ষমতাবৃদ্ধি ও অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আহরণের জন্যে আনুপাতিক হারে সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তা যে কতোটা ফলপ্রসূ হ'য়ে বাঙালীজীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারতো, কয়েকজন মনীষীর মন্তব্যেই তা বোঝা যায়। বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে মধুসূদন একবার মন্তব্য করেছিলেন,

'After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. · If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe ; but when we speak of the world, let us speak in our own language.···I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language.'

ভার্সাই নগরে ফরাসী, ইটালীয়ান আর জার্মাণ ভাষা শিক্ষাকালেই মধুসূদনের এই উপলব্ধি ঘটেছিল। কবি তখন এক একটি ভাষা আয়ত্ত করেছেন আর অনাবিষ্কৃত ঐশ্বর্যময় এক একটি জগতের দ্বার তাঁর কাছে অবারিত হ'য়ে পড়ছে—'that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state —intellectual of course,' সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে সেই 'intellectual' ঐশ্বর্যসম্ভার দিয়ে মাতৃভাষাকে সুসজ্জিত করতে ইচ্ছা জেগেছিল, Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with

১ প্রমথনাথ বিশী—ভূমিকা, বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার, পৃ. ॥৶,

these languages through the medium of our own tongue.' এই সঙ্কল্পের পক্ষে বাংলাভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধেও কবির কোন সংশয় ছিল না, 'Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong.'[১]

বাংলাদেশের ছাত্রসমাজকে এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করার জন্মে বঙ্কিমচন্দ্রও সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যম সম্বন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে প্রস্তাব তুলতে গিয়ে তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইংরাজির যুপকাষ্ঠে অসংখ্য বালক বলিদানরূপ মহা পুণ্যবলে সেনেট চরম সদ্‌গতির অধিকারী হয়েছে।

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ। বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটি সুষ্ঠু জাতীয় নীতির সপক্ষে সারা জীবন ধ'রে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আবেদন নিবেদনেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি, সেই শিক্ষার সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের বাল্যকথাকে উপস্থাপিত করে লিখেছিলেন,

'আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করতো। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসেবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তারপরে, ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল মাস্টারের শাসন হ'তে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।'

'এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশীভাষার চড়াইপথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয়নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হ'তে হয়নি।'[২]

১ গৌরদাস বসাককে লিখিত চিঠি ; ভার্সাই ২৬শে জানুয়ারী, ১৮৬৫

২ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ.'

নিজের বাল্যজীবনের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে এদেশে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানপদ্ধতির তুলনা ক'রে তিনি বুঝেছিলেন,

'ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন-রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।'[১]

বাঙালী জাতিকেও বিধাতা ইংরেজদের থেকে পৃথক ক'রেই সৃষ্টি করেছেন। তাই ইংরেজির মাধ্যমে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থা চমৎকারভাবে সম্পাদিত হ'লেও বাঙালীর পক্ষে বাংলাটাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। তা' না হ'লে দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই প্রহসনে পরিণত হবে, কারণ,

'দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না —সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।'[২]

এই অকৃতার্থতার বেদনা থেকে জাতির চিত্তকে মুক্ত করাই ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের মূল প্রেরণা। ঔপনিবেশিকতাবাদী বিদেশী সরকারের ডিগ্রির প্রয়োজনে গৃহীত শিক্ষানীতিতে বিদ্যাসাগরের এই আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে কলকাতাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাতে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনার সহায়তাকল্পে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন এক শ্রেণীর কেরানী সৃষ্টি করা। তাই নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যা-লয়টির শিক্ষাধারায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা যেমন অবহেলিত হয়েছিল, তেমনি যথার্থ শিক্ষার সঙ্গেও তার সর্ববিধ সম্পর্ক অস্বীকৃত হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের নবপ্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চরম মন্তব্যই তার স্বরূপ ও প্রকৃতিকে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে,

'ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাশ করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিতেছে।'[৩]

১ 'শিক্ষা সংস্কার.'
২ 'শিক্ষার বাহন.'
৩ 'শিক্ষার বাহন.'

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি বিদেশী ব্রিটিশরাজের শিক্ষাচিন্তায় সামান্যতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারলেও স্বাধীনতার পর স্বদেশী সরকার কিন্তু প্রশ্নটিকে বেশিদিন বিবেচনা না ক'রে ফেলে রাখতে পারেননি। সরকার নিয়োজিত 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন' ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত প্রতিবেদনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন,

'English cannot continue to occupy the place of state language as in the past. Use of English as such divides the people into two nations, the few who govern and the many who are governed, the one unable to talk the language of the other, and naturally uncomprehending. This is a negation of democracy.

And not only the individual but the nation develops a split consciousness, the 'Babu Mind'. This is what happened in India under British rule. We have paid a heavy price for learning in the past. Instead of laying stress upon thinking and reasoning we emphasised memorising, in place of acquiring knowledge of things and realities, we acquired a sort of mastery over words. It affected originality of thought and development of literature in the mother tongue. We have impoverished ourselves without being able to enrich the language we so assiduously studied. It is a rare phenomenon to find the speaker of one tongue contributing to great literature in a different language. The paucity of great literature which is the inevitable consequence of devotion by the educated to a language other than their own is a double loss—intellectual and social, for great literature is a powerful factor in fostering culture, refinement and true fellowship'.[১]

অর্থাৎ, পূর্বের মতো ইংরেজি আর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চলতে পারে না। ইংরেজির সে রকম ব্যবহার জনসাধারণকে, স্বল্প সংখ্যক শাসকশ্রেণী এবং অধিকাংশ শাসিত শ্রেণীর দুই ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ক'রে ফেলে। এদের এক

১ 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের প্রতিবেদন', পৃ. ৩১৬-১৭

শ্রেণী তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বোধ্য অন্যশ্রেণীর ভাষায় কথা বলতে পারে না। এ অবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

এর ফলে, কেবলমাত্র ব্যক্তির স্তরেই নয়, সমগ্র জাতির মধ্যেই 'বাবু মন' ব'লে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী-চেতনার আবির্ভাব ঘটে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষে তাই-ই হয়েছিল। অতীতে শিক্ষার জন্যে আমরা যথেষ্ট খেসারত দিয়েছি। মনন ও যুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপের পরিবর্তে আমরা মুখস্তবিদ্যার ওপরই জোর দিয়েছি। তারফলে, বস্তু এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে, এক ধরণের শব্দব্যবহারের ওপরই আমাদের দক্ষতা জন্মেছে। সেই জন্যে চিন্তাশক্তির মৌলিকতা এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যে ভাষা শিক্ষা করি, তার কোনরকম উন্নতিতে লাগতে না পেরে আমরা নিজেদেরই বঞ্চিত করেছি। ভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অবদানসৃষ্টি এক অসম্ভাবিত ব্যাপার। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্যভাষায় শিক্ষিতদের একাগ্রতার পরিণতিতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যে স্বল্পতম বিকাশ, তা মানসিক ও সামাজিক দুই ধরণেরই ক্ষতি সাধন করে। কারণ, সংস্কৃতির বিকাশে, উৎকর্ষতা সাধনে এবং যথার্থ সহমর্মিতা সৃষ্টিতে উন্নত সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে।

এই নীতিগত স্বীকৃতি এখনও যথার্থভাবে কাজে রূপায়িত হয়নি ব'লেই সারাদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে ভীতি সঞ্জাত একটা বিরূপতার ভাব আজও বর্তমান। অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতাজনিত শূন্যতাবোধ বর্তমান যুবমানসে যে নৈরাজ্যচেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছে, তার প্রকৃতি ও মূল অনুসন্ধান ক'রে সচেতন শিক্ষিত মানুষের কাছে একথা আজ সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে বিশ্বের বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ এবং তার সাহায্যে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের একমাত্র উপায় হোল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ। অনেক পথ পেরিয়ে, অনেক কাঁটা মাড়িয়ে আজ আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনকে বুঝতে পেরেছি। সেই দর্শনকে কার্যে রূপায়ণ করা এখনও বহু মেধা, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিসাধ্য হ'লেও তাঁর শিক্ষাদর্শনের উপলব্ধির আলোকে আমরা এতোদিনে বিদ্যাসাগরের স্বাধর্ম্য অর্জন করেছি, নিজেদের বিদ্যাসাগর-চেতনার মানুষ ব'লে পরিচয়দানের যোগ্যতা অর্জন করেছি।

৩

সমাজ, ধর্ম ও ঈশ্বরের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের সঙ্গে এ-যুগের বাঙালীজীবনের আশ্চর্য ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, এমন কি এক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগর যেন এ-যুগের থেকেও প্রাগ্রসর। যে শাস্ত্রবিধি সে-যুগের বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের ভিত্তি ছিল, শত মানবতাবিরোধী হ'লেও তার বিরুদ্ধে কোনরকম প্রশ্ন তোলা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। তাই সাধারণ মানবীয়-চেতনাকে অস্বীকার ক'রে বিবাহরূপ যূপকাষ্ঠে আট নয় বছরের মেয়েদের বলি দেওয়ার প্রচলিত জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধতা করার কোন উপায় ছিল না, মা-বাবার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে গেলেও গত্যন্তর ছিল না। বিদ্যাসাগরের অনেক আগে থেকেই এই অমানবীয় প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা দেখা দিলেও বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসকে অবলম্বন ক'রেই সর্ব প্রথম এর বিরুদ্ধে একটা কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছিল। এই জঘন্য সমাজবিধিকে 'কল্পিত ফল মৃগতৃষ্ণা' ব'লে ঘোষণা ক'রে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সর্বসমক্ষে এই মায়া-মরীচিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে সাধারণ মানুষের মনে এই শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের বীজ বপন করেছিলেন। আজকের দিনের মানুষ মেয়ের বিয়ে দেবার সময় পাত্রের শিক্ষা, চাকরি, পৈতৃক সম্পত্তি, এমন কি উপরি আয় সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নিয়ে তবে সম্বন্ধ স্থির করে। সর্বাবস্থাতেই মেয়ের সুখ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তাই বিয়ে দেবার সময় তাদের মনে প্রধান হ'য়ে ওঠে; কোন অবস্থাতেই বিশেষ এক বংশোদ্ভূত পাত্রে আট বছরের মেয়ে দান ক'রে পুণ্যলাভ, নয় বছরের মেয়ে দান ক'রে পৃথ্বীদানের ফললাভ বা দশবছরের মেয়ে দান ক'রে সশরীরে স্বর্গলাভের বাসনা তাদের বিন্দুমাত্রও প্ররোচিত করতে পারে না। অর্থাৎ, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আজকাল লক্ষ কথায় নানা অকথা আসে, কুকথাও আসে, কিন্তু ভুলেও কোন শাস্ত্রকথা আসে না। শাস্ত্রকথার স্থানে সাংসারিক প্রয়োজন, ব্যক্তিগত রুচিঅভিরুচি আর মানবীয় বিচারের মানদণ্ডে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের এই প্রবণতার ব্যাপারে বর্তমান যুগের সঙ্গে গত শতাব্দীর একমাত্র বিদ্যাসাগরেরই মিল। কেবলমাত্র মিলই নয়, এ-যুগের বিবাহনিয়মের শক্তিশালী যে প্রবণতাটি দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান হ'য়ে উঠছে, বিদ্যাসাগরেরা চিন্তাতেই তার প্রথম পূর্বাভাস। অতি অল্পবয়স্ক বালকবালিকার বিবাহব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধতার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন, কারণ এই বিবাহে 'অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের

আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না,' অথচ চিরজীবনের মতো অবিচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধনে তারা আবদ্ধ হ'তে বাধ্য হয়। এই বক্তব্যে বিদ্যাসাগরের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি তাঁর ইচ্ছা ছিল বিবাহের পূর্বে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবে, পরস্পরের মনোভাব বুঝবে, আলাপ-পরিচয়ের দ্বারা পরস্পরের চরিত্র অনুধাবন করবে ; অর্থাৎ, আধুনিক অর্থে বিবাহের আগে একটা 'কোর্টশিপে'র ব্যবস্থা করতে হবে। সে-যুগে বিদ্যাসাগরের এই চিন্তা অবাস্তব আকাশ-কুসুম কল্পনা ব'লে মনে হ'লেও এ-যুগের সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল। শিক্ষার যতো প্রসার ঘটেছে, ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও যতো আত্মসম্মানবোধের বিকাশ ঘটেছে, ততোই স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকূল পরিবেশের আবির্ভাব ঘটেছে। মেয়েদের বিবাহের বেলায় তাই মা-বাবার স্বর্গলাভের পুণ্য অর্জন অপেক্ষা মেয়ের নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবাধ মেলামেশার সুযোগে কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের পরিচয় যদি প্রণয়ে পরিণত হয়, তাদের পরিণয়পথে শাস্ত্রকথা তাই কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারে না। ছেলেমেয়েদের এই পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়ের স্তর পরম্পরাকে অভিভাবকরা সর্বত্রই যে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছেন, তা নয় ; কিন্তু বিরুদ্ধতা সর্বত্রই তীব্রতা হারিয়ে ফেলছে, সমাজ ধীরে ধীরে এটাকে অন্যতম সামাজিক বিধি ব'লেই স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর আইনের সাহায্যে বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতি সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেক মনীষী পণ্ডিত তার প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলেন, আইন ক'রে বিবাহবিধি সংস্কারের ব্যাপারে কোন সুফল পাওয়া যাবে না, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই এই কুপ্রথা দূর হ'য়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সে-যুগে এ-যুগে কারো চেয়ে কম সচেতন ছিলেন না, কিন্তু তবু তিনি আইন প্রণয়নের ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ তত্ত্ব হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ধারণা অতি সুন্দর হ'লেও সে-ধারণার বাস্তব কার্যকারিতা সন্দেহের অতীত ছিল না। যে বছর বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী একশো বছরে এদেশে শিক্ষার

প্রসার ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির হিসেব নিলে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আশা অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার এদেশে ঘটেনি এবং আধুনিক শিক্ষাসঞ্জাত উদারতার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক বৈষম্যেরও অবসান ঘটেনি। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রসারে সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার ফলে বিদ্যাসাগর স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পৌঁছে দেবার জন্যে যে বিরাট উদ্যোগের প্রয়োজন, বাঙালীর সমাজমানসে এবং বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় তার কোন চিহ্ন মাত্রও নেই। তাই সামাজিক কুসংস্কারের অবলুপ্তির জন্যে শিক্ষার প্রসারের ওপর বরাত দিয়ে ব'সে থাকার ক্লীবত্ব তাঁর চিন্তাধারাকে কোনদিনই বিকল করতে পারেনি। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের বাস্তববুদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যে কতোটা অভ্রান্ত ছিল অতি নিকট অতীতে ভারতের স্বদেশী সরকারের দ্বারা প্রবর্তিত 'হিন্দু বিবাহ আইন' তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যে শিক্ষা বিস্তারের দোহাই দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর বিবাহ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের তীব্র বিরোধিতা করেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নেও তাঁর প্রার্থিত সেই শিক্ষাপ্রসার জাতির সমাজজীবনকে কলুষমুক্ত করতে পারেনি, তাই বিংশশতাব্দীর পঞ্চম দশকে অনেক প্রথার বিরুদ্ধতা ক'রে এবং অনেক সংস্কারকে স্বীকার ক'রে হিন্দুর বিবাহবিধির মধ্যে সাম্য এবং মানবতা আনয়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। সামাজিক অন্যায় এবং অসাম্য দূর করার জন্য বিদ্যাসাগরের একাগ্র কামনা তাই আজ আমাদের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো 'ডন কুইক্সোটে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সার্থক উদাহরণ হিসেবে আমাদের মন গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত ক'রে তোলে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অতিরিক্ত আগ্রহ এ-যুগেও কিছুটা বিরূপ সমালোচনার ঢেউ তুলেছে। কোন কোন সমালোচক আজও ব'লে থাকেন, এদেশে আইন ক'রেও বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা যায়নি অথচ আইনের সাহায্য ছাড়াই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রহিত হ'য়ে গেছে। এই ধরণের নির্বিচার সমালোচনার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র এইটুকুই বলা চলে যে, কোন ব্যাপার বা বিষয়ের পরিণতিটুকুমাত্র দেখে সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত, মতামত দেওয়া নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর মাত্র। কারণ, কোন অবস্থাতেই একথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, সে-যুগে আট থেকে আঠারো বছর বয়সের গণনাতীত যে বিধবার ভয়াবহ সংখ্যা বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুর ঘরে ঘরে

বীভৎস নাটকের অবতারণা করেছিল, তার থেকে হিন্দুসমাজকে মুক্তি দেবার জন্যেই বিদ্যাসাগর বাঙালী হিন্দুর বিকৃত বিবাহপদ্ধতির সংস্কার সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসের তীব্র বিরুদ্ধতা এবং সেই বিরুদ্ধতা উত্তরণে তাঁর প্রাণান্তকর কর্মোদ্যম আমাদের কাছে তাঁর সর্ববিধ সংস্কার কর্মের পশ্চাদ্‌বর্তী শিক্ষাসাধনার মূল উদ্দেশ্যকেও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ক'রে তোলে বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর এই সংস্কারকর্মের সার্থক ফলশ্রুতিকে আজ অস্বীকার করা যায় না। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে তাঁর আকুল আকাঙ্ক্ষা ও তীব্র প্রয়াসের সূত্র ধ'রে এদেশে বিকৃত শাস্ত্রবিধির স্থানে যে মানবতাবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তারই সার্থক পরিণতিস্বরূপ আজ আর কোন মাতাপিতা অক্ষয় স্বর্গলাভের অলীক লোলুপতার অথবা নিষ্করুণ সমাজবিধির অন্তঃসারশূন্য কঠিনতায় আট বছরের মেয়ের বিবাহদানের চিন্তাও মনে স্থান দেন না। আট কেন, আঠারো বছর বয়সের আগে কোন মেয়ের বিবাহ প্রসঙ্গও কোন গুরুত্বও লাভ করে না, আটাশ বছরের মেয়ের বিবাহও অশালীন কৌতূহলমুখরতার সরস বিষয়বস্তু হ'য়ে ওঠে না। তাই শত শতাব্দীর কুসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বাল্যবিধবা যে মাসী-পিসির দল ক্ষীণ পরিচয় সূত্রে অবৈতনিক পরিচারিকার যথার্থ স্বরূপ গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টায় মাথা কুটে মরছিল, বাংলার জনজীবনে তাদের সংখ্যা আজ দ্রুত লয়ে ক্ষীয়মাণ। বিদ্যাসাগরের সুদূর প্রসারী চারিত্রমহিমাই এক্ষেত্রে সংস্কার সাধনার রূপ ধ'রে কার্যকরী পরিণতিদানের সিদ্ধিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আজকের দিনে সব অভিভাবকই যে স্ত্রীশিক্ষার বিদ্যাসাগরীয় উদ্দেশ্য উপলব্ধি ক'রে বাল্যবিবাহের বিরোধী হ'য়ে উঠেছেন, তা নয়; কিন্তু অলীক স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিতফল মৃগতৃষ্ণায় আজ আর কেউ ভুলতে রাজী হন না। সেই মরীচিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে বিদ্যাসাগর সন্তানস্নেহের ওপরকার শাস্ত্রশাসনের মায়াবরণ ছিন্ন ক'রে দিয়েছেন। নিষ্প্রাণ শাস্ত্রের স্থানে মানবত্ববোধের উজ্জীবন ঘটিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনজীবনে সর্বত্রই বিদ্যাসাগর সন্তানস্নেহের শুষ্ক ধারাপথে ভরা কোটালের বন্যা প্রবাহিত ক'রে দিয়েছেন। বাঙালীর সন্তানস্নেহের মধ্যেও তাই আজ বিদ্যাসাগরের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি।

উনিশ শতকের নবজাগরণে আমাদের দেশ ধর্ম একটা প্রধান প্রেরণাদায়িনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকল মহাপুরুষই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং সেই

চিন্তাজাত ফলশ্রুতিকেই জনজীবনের সংস্কার সাধনায় নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধ উদাহরণ হিসেবে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ধর্মদ্রোহের কথা উদ্ধৃত হ'লেও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ধর্মদ্রোহ প্রধানতঃ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধর্মের মোহময়ী আকর্ষণকে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কেউই অস্বীকার করতে পারেননি, তাই শেষ জীবনে তাঁদের মধ্যে কেউ বা অন্য ধর্মের বন্দরে তরী ভিড়িয়েছিলেন, কেউ বা স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি অনেক কাজ করেছিলেন, অনেক তর্ক-বিতর্কে নেমেছিলেন, অনেক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন ; কিন্তু ধর্ম নিয়ে কোনদিন কোন বাদ-প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেননি, অধিকন্তু ধর্মের প্রচারকে ঘৃণাই করেছিলেন। এই দুনিয়ার একজন মালিক আছেন ব'লে স্বীকার করলেও সেই দুনিয়ার মালিকের মাহাত্ম্য উপলব্ধি কোনদিনই তাঁকে স্তব্ধবিস্মৃত করেনি, তাই তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারে তিনি কোনদিনই উচ্চকণ্ঠ হ'তে পারেননি। তাই সে-যুগে তাঁকে 'নাস্তিক' ব'লে কেউ কেউ ফতোয়া জারি করেছিলেন, 'অজ্ঞেয়বাদী' ব'লে কেউ আবার তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন আবার 'খ্রীষ্টান' ব'লে 'টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল' তাঁকে সমাজচ্যুত করারও চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক নির্বিকার ও নীরব ছিলেন ব'লেই বিদ্যাসাগর ভালো মন্দ নির্বিশেষে সমকালের সকলেরই প্রায় বিরক্তি বা বিরূপতা উৎপাদন করলেও এই একটি বিষয়ে এ-যুগের সঙ্গে তাঁর আত্যন্ত মিল। এই মিলের কথা আলোচনা ক'রে বিদগ্ধ সমালোচক সার্থকভাবেই মন্তব্য করেছেন,

'বিংশ শতকী বাঙালীর জীবনের কেন্দ্র আর যাই হোক—ধর্ম নয়। রাজনীতি হইতে পারে, ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে পারে। আবার কেন্দ্রহীন হইতেও ঠেক নাই।·····বিংশ শতকের বাংলাদেশ ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, তত্ত্বের চেয়ে কার্যকারিতার প্রতি তাহার বেশি ঝোঁক, সেইজন্যই বিজ্ঞানের চেয়ে তাহার অনেক বেশি প্রিয় technology, দর্শনের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ অর্থনীতির প্রীতি। এখন সে নিজকালের এই লক্ষণগুলি উনিশ শতকের বাঙালী মনীষিগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করিয়াছে—তাই পুনর্বিচারে তাঁহার মূল্য কমে নাই, বরঞ্চ আত্মীয়তাবোধের সূত্রে সে মূল্য যেন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।'[১]

১ প্রমথনাথ বিশী 'ভূমিকা', বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ।।৵৹

৪

বাংলাভাষা আজ স্বকীয় ক্ষমতার দ্বারাই বিশ্বভাষাসমাজে নিজের স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার পরিচয় সূত্রে অগণিত ভাষার মধ্যে বাংলাভাষার আজ আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলার কোন সম্ভাবনা নেই। বাংলাভাষার এই উন্নতির মূলেও বিদ্যাসাগরের প্রবর্তনা আজও স্পন্দমান। বিদ্যাসাগরই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন মাতৃভাষার উন্নতি ভিন্ন জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের কোন আশা নাই। তাই জাতীয় শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি হিসেবে তিনি বাংলাভাষার উন্নতিবিধানেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, 'The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal' অর্থাৎ, যাঁদের ওপর বাংলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে, একটি উন্নত বাংলাসাহিত্য সৃষ্টিই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এ-বিষয়ে কেবলমাত্র দিক নির্দেশ ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হ'তে পারেননি, বিষয়টিকে সার্থক ক'রে তোলার জন্যে যা কিছু করণীয়, তার সম্পাদনের গুরুদায়িত্বের সিংহভাগ বহন করার জন্যে নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন। এই প্রয়োজনের সূত্র ধ'রেই তাঁর লেখনীচালনা—পাঠ্যপুস্তক রচনা আর তার মাধ্যমে বাংলাভাষায় সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বজনবোধ্য রীতিটির আবিষ্কারই ছিল সেই লেখনীচালনার সার্থক পরিণতি।

বিদ্যাসাগরীয় ভাষারীতিই যে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম সহজবোধ্য এবং স্বাভাবিক রীতি, সে-বিষয়ে পণ্ডিতমহলে আজ আর কোন দ্বিমত আছে ব'লে মনে হয় না। সমকালীন শিষ্টসমাজের কথ্যভাষার ওপর ভিত্তি ক'রেই তৎকালপ্রচলিত সাধুভাষার মধ্যে বিদ্যাসাগর মেরুদণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিবর্তনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এই ভাষা তাই অতি সহজেই আধুনিক শিষ্টসমাজের মুখের ভাষা 'চলিতভাষা'র জন্মদান করেছে। আধুনিক শিক্ষিত সচেতন বাঙালী যে ভাষার কথা ব'লে প্রাত্যহিক আলাপ আলোচনা চালায়, তা কোন আঞ্চলিক উপভাষা নয়; তা হোল বিদ্যাসাগরীয় ভাষারীতির ওপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠা এই সর্ববঙ্গীয় সাধারণ চলিত ভাষা। মায়ের মুখ থেকেই আমরা মাতৃভাষা শিক্ষা করি, আমাদের মাতৃভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বিচার ক'রে সমালোচক তাঁকে এই মায়ের আসনে স্থাপন ক'রে মন্তব্য করেছেন,

'মায়ের মুখের ভাষা মাতৃভাষা—এখানে বিদ্যাসাগরকে মাতা মনে করিলে অন্যায় হইবে না—তাঁহার মুখের ভাষা পরবর্তী যুগকে মুখর করিয়া ।'[১]

বিদ্যাসাগরের এই অভূতপূর্ব অসাধারণ কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি হোল বাংলাভাষার রূপ নির্মাণ ; মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগরই ছিলেন বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। নিজের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে সে-কৃতিত্বের অতুলনীয় এবং অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্বীকার ক'রে মুক্ত কণ্ঠে উচ্চ ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন,

'বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন বিদ্যাসাগর।'[২]

ভাষারীতিগঠনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব যতোই যুগান্তকারী হোক না কেন, সেই ভাষারীতিকে কিন্তু তিনি সার্থক রসসাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োগ না ক'রে তার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যেই নিজের প্রতিভা ও প্রয়াসকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি তাই সার্থক ভাষারীতিরই শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ হ'য়ে নেই, সার্থক পাঠ্যপুস্তকেরও চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে আছে। 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির স্বরূপ আবিষ্কার ক'রে সমালোচক লিখেছেন,

'এক শতাব্দী পরে বাংলা গদ্যভাষার যে রূপ হবে বা হয়েছে, বর্ণপরিচয়ের গল্পগুলি বিদ্যাসাগর সেই ভাষায় রচনা ক'রে গিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় এমন ভাষা বিদ্যাসাগরই যে তখন রচনা করেছিলেন, একথাও বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত। বর্ণপরিচয়ের উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠপ্রণালী যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত, তা বিচার করলেই বোঝা যায়। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমসাময়িক শিক্ষাজগতে বর্ণপরিচয় যুগান্তরের সাক্ষী। একশ' বছর পরে আজও পর্যন্ত, তার চেয়ে উন্নততর কোন প্রাথমিক পাঠপ্রণালী কেউ উদ্ভাবন করতে পেরেছেন বলে তো মনে হয় না।'[৩]

১ প্রমথনাথ বিশী—'ভূমিকা', বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার, পৃ. ॥৶০

২ 'বিদ্যাসাগরস্মৃতি', চারিত্রপূজা

৩ বিনয় ঘোষ—'শিক্ষক বিদ্যাসাগর', পরিচয়, বৈশাখ ১৩৬২

সেইজন্যেই 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে সমালোচকের চূড়ান্ত মন্তব্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, 'শিশুমনোরঞ্জক অনেক পুস্তিকা বাজার ছেয়ে ফেললেও এখনও বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র প্রয়োজন ফুরোয়নি।'[১] বিদ্যাসাগরের অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের সম্বন্ধেও অনায়াসেই এই একই মন্তব্য করা চলে।

আমরা বিদ্যাসাগর-আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার উপলব্ধি করেছি যে, দৈবপ্রেরণাজাত রসসাহিত্য সৃষ্টির আবেগ বা মানসিকতা কোনটাই বিদ্যাসাগরের ছিল না। আমরা সমালোচককথিত সেই মূল্যায়ণও উপলব্ধি করেছি যে, বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় বিদ্যাসাগর কোনদিনই কলম ধরেননি, তাঁর রচিত সাহিত্য তাঁর কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র।[২] কিন্তু এই প্রক্ষিপ্ত সাহিত্য সাধনাতেও মাঝে মাঝে চকিত বিদ্যুৎ চমকের মতো তাঁর সাহিত্য প্রতিভা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। বাংলা উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রকৃতি নির্ণয় তেমনি একটি দুর্লভ সম্পদ, যা নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তেই হয়তো বা বিদ্যাসাগর-মানসের মণিমঞ্জুষা থেকে ঝ'রে পড়েছিল। শকুন্তলা ও সীতার চরিত্রে যে নায়িকাচরিত্রের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে, বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখী-ভ্রমরের মধ্যে তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর জীবনজ্বালার প্রাখর্যের পাশে অশ্রুমুখী আশার মধ্যে তাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, শর্মিষ্ঠার মধ্যে তারই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য ক'রে পরাজিত ঊর্মিমালা গোপনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, আর শরৎচন্দ্রের সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবনটাই তো এই সর্বংসহা অমৃতময়ী অশ্রুমুখী নায়িকার জীবনবেদ রচনার একান্ত অভিনব সাধনাময়। সেইজন্যেই 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' পড়তে পড়তে রসজ্ঞ পাঠকহৃদয় বারবার হাহাকার ক'রে ওঠে,

'বাংলাদেশের শিক্ষাসংস্কারের জন্য তাঁকে বালকদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখতে হয়েছে, ইংরেজী থেকে নীতিগল্পের অনুবাদ করতে হয়েছে—এতে দেশের শিক্ষাবিস্তারেব বিস্তর সাহায্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে আমরা রস-সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরকে হারিয়েছি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা শিলনোড়ার কাজ চলতে পারে বটে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয়।'[৩]

আজ যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জীবনসাধনার কথা বাংলাদেশের

সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, গতযুগের মহামনীষীদের মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেই ছিল তার অবশ্যম্ভাবী পূর্বাভাস। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসাধনায় কি কর্ম-চেতনায় কোথাও ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রাধান্য ছিল না। তাঁর শিক্ষাস্বপ্নের মূলে ছিল ধর্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ পরিপূর্ণ বাঙালীজাতি সৃষ্টির প্রয়াস। তাই তিনি বাংলাভাষার জন্যে চিন্তা করেছিলেন, বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির পথ সুগম করেছিলেন, বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিধারার রুদ্ধ মুখ খুলে দিতে চেয়েছিলেন।

সহস্রবিধ বাধা অপসারণ ক'রে, পথের কাঁটা নিজের পায়ে মাড়িয়ে তিনি যে পথের নিশানা তৈরী ক'রে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চলার যোগ্যতা যেদিন আমরা অর্জন করবো সেইদিনই আমরা ঘরে ফেরার ঠিকানা খুঁজে পাবো, পরবাসী মন তখনই আমাদের ঘরে ফিরতে চাইবে। সেই ঘরে ফেরার আকুলতায় আমরা যতোটা 'বাঙালী' হ'য়ে উঠবো ঠিক ততোটাই 'মানুষ'-ও হ'য়ে উঠবো। আর সেই নবলব্ধ মানবচেতনায় আমাদের শিরায় উপশিরায় যে বিশিষ্ট চেতনাকে নিয়ত স্পন্দমান ব'লে উপলব্ধি করবো, তারই উৎসমুখ— আদিগঙ্গা হরিদ্বার হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পরিশিষ্ট ১

শিক্ষাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলী

পরিশিষ্ট : এক

শিক্ষাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলী

প্রসঙ্গ : সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগের কারণ বিশ্লেষণ

To

Baboo Russomoy Dutt,

Secretary to the Sanscrit College.

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April, I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit Language and Literature in the Government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive, I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

I was well aware of the causes which had conduced to render the scholarship examination of 1845 so unsatisfactory and on my appointment in April 1846, I found all these causes existing in full vigor. There was no rule or method for securing the course of reading necessary for the Junior Scholarships. One of the subjects is Grammer but the students of the Kavya and Alankar classes (in the Junior Department) were almost, without exception, utterly unfit to

stand the most superficial Examination on that subject. Again Arithmetic is another of the subjects : but the scheme then existing did not admit any of the Junior Department to the Jyotish class, of course they failed in Arithmetic. The students of the senior Department only were directed to study Jyotish ; this branch formed no part of their examination. Consequently with very few exceptions they paid no attention to this study. The badness of such an arrangement is self-evident. Again for Junior scholarship, it is necessary to make translations from Sanscrit into Vernacular and vice versa. But there were no proper arrangements for that constant and regular practice in these branches which is so absolutely......and Books fitted for the purpose were also entirely wanting. Again Kavya is another subject, but the late Professor, about for two years previously to his death which occured in May 1846, was quite unable from bodily infirmity to do justice to his class. He used to instruct three or four of his senior scholars and leave to them the duty of instructing the rest and the person whom he occasionally gave as a substitute sometimes for long periods was very deficient in the necessary qualifications. When I joined, the class was divided into 10 sections reading different lessons and such had been the state of things for a considerable period. These irregularities were no doubt the cause why the scholarship examination of the Junior Class for 1845 was so unsatisfactory.

The students of the senior class have always been through the efforts of the Professors well trained in the two branches which......the subjects of their immediate study viz., Smriti and Nyaya ; but in the other subjects for a senior scholarship, viz., General Literature, Essays and Translations, they

were generally with a few exceptions found deficient owing to the want of an arrangement for regular practice in these points. In short, from the above and other similar reasons the instruction given fell far short of the objects proposed. Therefore the necessity of a complete revision of the system struck me forcibly on my first joining my appointment, but as it only wanted five months to the annual examination I determined then to confine my efforts to those points alone which were most immediately concerned. I consequently commenced daily to give to the Senior Department Bengali Papers to be translated into Sanscrit. In the Cavya and Alankara classes of the Junior Department I .....to revise daily a fixed portion of grammer and by threatening to degrade into the grammar class those who were found deficient at examinations taken by me every fortnight, I induced them to pay so much attention to this subject as in a great degree to remove the deficiency in this subject as was apparent at the next examination. And as regards Jyotish I represented to you the state of thing and with your sanction directed the students of the Cavya and Alankara Classes to attend at fixed times the instruction of the Jyotish Pundits, thereby providing in some degree against the dificiency in this respect. The 10 sections of the Cavya class were also with your sanction rearranged and reduced to three sections. The appointment of well qualified and diligent professors to this class about that time finally removed all the impediments to effecting study which had previously existed. In addition to all these, two months previous to the examination I put a stop by authority to all new lessons and caused all the students of the Institution to employ themselves solely in revising their

former studies. In these two months the Cavya and Alankara classes went entirely through the two text-boooks of general Literature in the Junior Scholarship examination viz., "Roghu Vansha and Kummar Sambhava" and at the same time labored......at Translations, Arithmatic and Grammar. The Bengalee Books necessary for practising translation, I borrowed to the amount of about 50 copies from the College of Fort William and other sources and lent to the students. In all my efforts I was warmly supported by the able and zealous professors of these two classes and I felt confident that the next examination would show a marked improvement in the Junior Department. In the Senior Department the chief efforts were directed to remedy the deficiency of the students in the higher books of Poetry. A number of works were revised and to meet the want of Books I was again obliged to apply for copies of Magha and Bharavy to the College of Fort William and other sources referred to. The deficiency on this point was thus in a great degree provided for. But for want of leisure so much attention could not be spent to composition and translation. Thus from the day of my appointment I devoted all my energies to the object producing a marked improvement by the next examination and I had hoped that if such should prove to be the result that I should be thought deserving of approbation by my superiors. The Examination proved satisfactory and the Examiner reported favorably and I naturally looked for the praise, I thought I had deserved ; but from your letter no 239 dated 4th January 1847 to the address of the Secretary of the Council of Education forwarding the Draft of your General Report, it is clear that you were not satisfied with the degree of

commendation bestowed by the Examiner and in fact you considered his laudatory remarks on the progress of the students as altogether unfounded. My just hopes of commendation were thus atonce quashed ; but I can boldy affirm and I appeal to all the professors and students that the means and efforts which I employed in the four or five months which preceded the Examination of 1846 and the zeal and diligence with which these were seconded by the other parties concerned have never been equalled since the scholarships were first instituted and this I will also venture to assert that if the former system had not undergone such serious alterations the Examination of 1846 would certainly have proved worse than that of 1845.

I cannot expect······your approval of my conduct from your personal observation as your other heavy duties seldom allow of your visiting the college. I can therefore look only to the report of the Examiner, but this resource has been also cut off by the bad spirit in which you have received the favorable sentiments of that officer. It cannot however be denied that the method of instruction has in the course of the last year greatly changed for the better and that I have spared no exertions on my part in effecting this object. Every Pundit and student can bear testimony to these points. It must be inferred that the state of the college as to instruction before my arrival and the changes introduced by me must both have been hidden from your knowledge. I would submit if a person receiving such a return for his disinterested exertions had not just cause to be dissatisfied and if he can be expected again to take so much trouble upon himself.

I now advert to a second subject in which my well

meant endeavours have been similarly rewarded with disappointant. On my joining the college when I made provision for meeting the most pressing necessity of preparing the students for appearing with credit at the approching examination, I cherished designs for a more·········I know that a thorough and constant rearrangement of the whole system of study was necessary to develop and keep in permanent activity the resources of the Institution. Accordingly during the months of April, May and June, I watched and revolved in my mind the working of the whole system and when I was obliged by sickness to go home on leave for 3 weeks in July I took advantage of that leisure to commit my ideas and conclusions to writing. On my return I consulted·········five of the Pundits on the subject and obtained their entire approval of my plan. It was also approved of by Major Marshall who recommended me to transmit it to you for submission to the Council of Education. Thus encouraged I put the plan in an official form into your hands requesting you to bring the matter at once before the authorities, so that during the 3 weeks vacation then commencing from Durga Poojah the matter might be taken into consideration and the new scheme if approved of by the Council might be adopted when the College re-opened. You read the whole and observed there was no necessity to submit it to the Council as you could yourself adopt the new arrangements. After the vacation when I had often urged you to put in force the provisions of my new Plan you one day remarked that you felt at liberty to adopt the changes recommended on the subject of the Grammar Classes but you are not empowered to carry into effect the other proposals without the permission of the Council. On a

subsequent day you came to the College with my plan in your hand and observed to me it would not be advisable to make any change without consulting the Council and that you would apply for their sanction to the new scheme as far as it regarded the Grammar Classes. I suggested that as an application was to be made to the Council it might as well embrace the whole Plan, to which you replied that it was no use sending up so many subjects for consideration as they would not be attended to, not even read, the members would take fright at such a voluminous document and it would therefore be better to bring it forward in separate portions. After all this the only report made by you on the subject was one dated 16th October 1846 embracing only the Grammar classes and even as regards them you omitted mention of 3 class Books recommended by me which formed a prominent feature of the scheme and in fact without which one of the classes must be crippled and almost useless. Thus out of all my suggestions one only was submitted by you to the Council and that even in a mutilated form. All my other proposals have been treated as totally unworthy of consideration, but I nevertheless feel confident that each of them is calculated in no way to injure the College but on the contrary to promote its efficiency. Nay, I am enabled to say on the coinciding judgement of others highly qualified to give an opinion that if my scheme or someother very similar be not substituted for the present defective system, the Institution will not fully answer its two purpose, namely of imparting Sanscrit Literature primarily and of teaching English secondarily. At any rate it is highly unsatisfactory to find my evdeavours and labors frustrated without any due consideration of their merits.

There is another circumstance connected with this report of mine justly calculated I think to cause me much dissatisfaction.

Major Marshall at the close of his report on the Scholarship examinations recomended to the Council to adopt the suggestions made by me which has so often been alluded to. On this in the Annual Report of the Sanscrit College for 1846-47······you remark: "The report referred to by Major Marshall was prepared by direction of and mostly from data furnished by the Secretary to the College by whom the chief recommendations contained in it which accorded with his expressed views have already been submitted to and approved of by the Council of Education and are contained in the introductory portion of this Report." Now I respectfully deny even having received from you any data for the Preparation of that report and the only thing in the shape of direction I can remember was your instruction to devise a plan for reducing the number of sections in eaeh class and introducing·········into the Grammar Classes. As to my chief recommendations, 'having been submitted to and approved of by the Council' that is briefly answered by referring to what has been shown before, namely that out of the numerous subjects referred to in my long report only part of one has been thought by you worthy to be laid before superior authority.

From the length to which this paper extended I must bring it to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry into the subjects mentioned. I think I have brought forward sufficient to show that my labors have not met and are not likely to meet with due appreciation and this is the ground of my resignation.

I studied 12 years and 5 months in the Sanscrit College with some distinction. I was the next 5 years Head Pundit of the College of Fort William, during which period my time was wholly devoted to Sanscrit studies, and my assistance was every year required by Major Marshall for preparing questions for the Sanscrit College Scholarship Examinations as for Examining the Replies given in. In giving up that appointment for my present one, I was elevated by the hope that I was entering on a sphere where my acquirements in Sanscrit Literature added to my long experience in the affairs of the Sanscrit College would prove of great benefit but as I have already stated I consider my expectation to have been frustrated.

One point affecting the credit and comfort of the College I had almost omitted. I allude to the privilege assumed by the Principal of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular Examination for 3 or 4 days together. Some of our students are obliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interferance, yet you do not appear to have taken any such steps either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful

I have thus stated some of the principal reasons for

tendering my resignation. The assigning of such reason in detail did not appear to me to be at all necessary; but in compliance with your especial requests I have frankly submitted them.

I must therefore······that allowances will kindly be made for any expressions which may carry an appearance of undue freedom

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant

Sanscrit College. Ishwar Chandra Sharma.
3rd May, 1847. Assistant Secretary, Sanscrit College.

প্রসঙ্গ : সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য শিক্ষা-সংসদের কাছে প্রেরিত দীর্ঘ পরিকল্পনা

To

F. J. MOUAT, ESQ., M. D.,

Secretary to the Council of Education.

SIR,

I have the honour to submit for the information of the Council of Education, a report on the Sanscrit College, drawn up agreeably to the instructions conveyed in your letter No 3538, dated the 5th instant.

I beg leave to remark that it has long been in my contemplation to submit a report of the nature now furnished, but circumstances deterred me from such a step. I am now, however, happy to have an opportunity of carrying out my wishes, as a matter of duty, under the sanction of the Council.

Report

1. **Grammar Department.**—Under the present system this department consists of five classes.* The works studied are Mugdhabodha, Dhatupatha, Amarakosha and Bhatti Kavya ; the fifth class studying 17 pages of Mugdhabodha ; the fourth class, 42 pages of the same work ; the third class, 100 pages ; the second class, the remaining 90 pages of the same book, together with Dhatupatha and the first class, a few books of Bhatti kavya and a certain portion of Amarakosha.† Four years ‡ are the prescribed period for continuing in this dcpartment ; but five years are necessary to enable a student to pass through the five grades. For want of a better system, the advantage gained is very little compared with the length of time spent by students in this department.

Mugdhabodha is a very short compendium of grammar. The author Vopadeva seem to have had brevity simply in view. Having had this for his object, he has, consequently, made his work extremely difficult. The Sanscrit is in itself

* After t.e foundation of the College in 1824, only two Grammar classes, one of the Mugdhabodha and another of Panini. The Second Mugdhabodha Grammar class was established in January 1825 ; the third in November 1825 ; the fourth in May 1846 ; and the fifth in January 1847. The Panini class was dropped in January 1828.

† At first the Mugdhabodha Grammar and a few books of the Bhatti Kavya, were read from the beginning to the end in all these classos, Though called first,, second, third and fourth, the promotions from each of these classes, were to the Sahitya or Literature class, The present division of study of different parts in different classes, and the study of the Amarakosha and Dhatupatha were introduced by orders of the Council of Education, dated the 31st October 1846.

‡ The original period for study was 3 years—extended to 4 years in 1840.

a very difficult language, and to begin its study with a difficult grammar seems, in my opinion, not be a well-chosen plan. Experience shows what difficulties one has to surmount when studying his grammar in this style. Young lads, who begin to study Sanscrit, on account of the extreme difficulty of the Grammar Mugdhabodha, only learn by rote what their instructors say, without being able of themselves to understand the contents of the work they read. Thus 5 years pass in the study of grammar alone, without getting any essential introduction to the language itself. It seems to be an astounding fact that one should be studying a language for 5 years and scarcely understand a bit of it. Moreover, the Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries, which last, however, are not read in the college, is an imperfect grammar. So, under the present system, the first 5 years of a student of the Sanscrit College, is almost lost to useless purposes. After all his toil and trouble, his acquirements in grammar are very imperfect. Again, Dhatupatha, another of the works studied in this department, is a collection of Sanscrit roots in verse. Amarakosha, the third work of study, is a dictionary also in verse. These two works when mastered, I admit, are of some assistance to the study of literary works. But the advantage gained is not at all commensurate to the time and labour required to get them by heart. Besides, almost all the standard Sanscrit poetical works, which are the main part of Sanscrit literature, being accompanied by excellent commentaries by Mallinatha, supersede altogether the use of the study of the abovenamed two works, Dhatupatha and Amarakosha. I beg leave to say that this commentator is not like his brethren who "blanch the

obscure places and discourse upon the plain." Under the above considerations, I do not think it a good plan to spend the first 5 years of study in the Sanscrit College in reading Mugdhabodha, Dhatupatha and Amarakosha. Bhatti Kavya, the fourth and last work of study in this department, is a poem, the theme of which is Rama and his adventures. This work was purposely written to exemplify the rules of grammar. It is not altogether ill-adopted for the grammer department.

After all these considerations, I beg leave to propose the following remodelled system of study for the grammar department. Should the Council be pleased to adopt the suggestion, I do think, in my humble opinion, that in 4 years, the time prescribed now for grammer study, the students shall have a thorough knowledge of grammer, and tolerable proficiency in literature besides, and they will not experience the difficulty in the Sahitya class which they do now, being made all at once, just after finishing an imperfect grammer, to begin with the standard works, without having had an insight into the language.

The system I would propose is this : The boys instead of beginning the grammer at once in the Sanscrit language should learn some of the most fundamental rules dressed in the easiest Bengali ; then they should go on with two or three Sanscrit "Readers" to be compiled. These "Readers" should consist of easy selections from the Hitopadesha, Panchatantra, Ramayana, Mahabharata and from other works suited for the purpose. This will take the students some two years. After this they should begin with Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dikhshita the study of which they should continue to the highest class of the grammar

department. Of all the Sanscrit grammers this is decidedly the best and the highest authority on the subject. It is at once complete and simple. Along with Siddhanta Kaumudi the students also study Raghu Vansha and selections from both Bhatti Kavya, Dashakumara Charita, etc., etc.,* I beg leave also to propose that instead of five classes there should be four, and the fifth be considered as a section of the fourth, both studying the same books, and the promotions from foth the classes being to the third. By this arrangement a year will be conveniently saved, and the period for the grammer department instead of being five shall be four years.

2. **Sahitya or General Literature.**—The students coming from the grammer department have to study in this class for 2 years. Whilst here, they read the following works :

(1) Raghuvansha. (7) Shakuntala.
(2) Kumarsambhava. (8) Vikramorvashi.
(3) Meghaduta. (9) Ratnavali.
(4) Kiratarjuniya. (10) Mudrarakshasa.
(5) Shishupalabadha. (11) Uttara Charita.
(6) Naisadha Charita. (12) Dasakumara Charita.
(13) Kadambari.

They also practise translation from Bengali into Sanscrit and vice versa, and attend the mathematical class.

The first 6 of the 13 books above mentioned are the standard poetical works : the seventh, eighth, ninth, tenth and eleventh are dramas ; the last two are prose compositions. Raghu Vansha is an historical poem in 19 books. Its theme is the adventures of Rama, those of his four

* In a subsequent communication Pundit Eshwar Chandra Sarma recommends the introduction into the first Grammer class of the "Vritta-ratnakara", a highly esteemed work on prosody.

immediate ancestors, and the adventures of his descendants down to Agnivarna. Kumar Sambhava, from the name, would appear to be a poem all celebrating the birth of Kartikeya, the Mars of the Hindus. But the 7 books that are extant embrace a certain portion of the intended theme. The poem, as it stands, describes the birth of Parvati, the mother of Kartikeya, the burning of Kamadeva, the god of love, by Shiva, the Tapasya (austerities) of Parvati and her marriage with Shiva. Meghaduta is a poem in 118 slokas. A Yaksha or demi-god, having excited the wrath of his master Kuvera, the god of wealth, was doomed, by the curse of the master deity, to remain in a state of separation, away from his beloved wife, in a distant land, for the full length of one year. The lover in his distressed condition addresses a cloud, to bear his message to his wife at Alaka, the capital of Kuvera. The Shakuntala and Vikramorvashi are dramas ; the first has for its subject the story of Shakuntala, the adopted daughter of a sage named Kanwa, and Dushmanta, a king ; the plot of the second is the story of Pururava, a king, and Urvashi, a nymph. All these are very excellent productions. They are by the immortal Kalidasa. Every one of them bears the stamp of his great genius. Shishupalabadha, Kiratarjuniya and Naisadha Charita are epic poems, the first by Magha in 20 books, and the second by Bharavi in 17 books, the third by Shriharsha in 22 books. The death of Shishupala by the hand of Krishna, his cousin, is the theme of Magha's poem. The Kiratarjuniya contains the tapasya of Arjuna, his combat with Shiva in the disguise of a Kirata or barbarian, and finally his acquisition of certain weapons as rewards from Shiva, who was pleased with his military prowess. The adventures of Nalaraja form the

subject matter of Naisadha Charita. The first-mentioned two works possess all the attributes of good epics, only now and then there are some very tedious passages. The 7th, 8th, 9th, 10th and 11th books of Shishupalabadha, though the first specimens of poetry, and the 7th, 8th, 9th and 10th books of Kiratarjuniya have in many places very obscene passages. Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste ; there are occasional bursts, however, of fine passages. Uttara Charita by Bhavabhuti, is a drama, embracing the latter part of the career of Rama. Ratnabali is also a drama. Dhavaka is its author. He was paid by Rajah Shriharsha to write this work along with another, and attribute its authorship to him. The story of Rajah Udayana and Ratnabali is the plot of this drama. These two works are excellent in every respect. Mudrarakshasa, by Vishakhadatta, may be called a political drama. In its contents we find that Chanakya, the Prime Minister of Chandragupta, the Sandracottus of the Greeks is applying his diplomatic skill to consolidate the newly acquired empire of his master, by baffling all the efforts of Rakshasa, the royal Prime Minister of subverted Nanda family, to subvert in turn the new dynasty. This also is a good piece of composition. Dasakumara Charita and Kadambari are in prose. In the first a certain number of friends are relating to each other the history of their travels. The style is pure and chaste. There are, however, some objectionable passages. Dandi is its author. Kadambari is a novel, or rather an epic poem in prose. It is in 2 parts. The first part is a masterpiece of Sanscrit composition. The author, Vanabhatta, did not live to complete his admirable work.

His son wrote the second part. The production of the son is far inferior to that of the father.

Having laid all this before the Council, I beg leave to state there is not much alteration required in the purely literary studies of this class. With regard to mathematical studies I will speak hereafter, when I report on the Jyotisha class. The change I would propose is this ; Raghu Vansha, as I have proposed in my report of the grammar department, should be transferred to the first grammer class, and the Dashakumara Charita, instead of being read entire here, be studied in selections in one of the grammer classes, and that Shishupalabadha, Kiratarjuniya and Naisadha Charita, having many objectionable passages, as stated before, instead of being read entire, be studied in selections. The first part only of Kadambari should be read. All the other works should be read entire. In addition to this I beg leave to propose that two other works, Vira Charita and Santishataka, be studied in this class. The former is the first part of that drama of which Uttara Charita is the second, being in no way inferior to it. The Santishataka is an excellent didactic poem. The students should practise translating as before. They should also write essays in Sanscrit and Bengali.

3 Alankara or Rhetoric Class.—After Sahitya the students come to this class and continue in it for two years.* They read in this class the following on rhetoric :—

(1) Sahitya Darpana. (3) Kavya Darshan.
(2) Kavya Prakasha. (4) Rasagangadhara.

* Formerly the period of study in this class was one year, which was extended to two years by order of the Council, dated the 28th November 1846.

They also read those poetical works which from want of time they cannot go on with in the Sahitya class. Besides this, they have for their exercise, translations and compositions. They also attend the mathematical class.

With regard to this class I beg leave propose to the following change. The text-books should be Kavya Prakasha and Dasharupaka. Generally Sahitya Darpana is the work read ; butI prefer Kavaya Prakasha and Dasharupaka on the following grounds. Kavya Prakasha is a much more profound work than Sahitya Darpana, and is acknowledged to be the highest authority on the subject. The best commentators, such as Mallinatha, quote this work for their authority. The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of rhetoric. Besides this is the highest authority in its own department. Kavya Prakasha and Dasharupaka could be read in less time than Sahitya Darpana. So the former two have every claim to be preferred to the latter, and after reading the two first, to read the last also would be waste of time. The purely literary works, should my suggestions regarding the studies of the grammar and Sahitya departments be adopted, will not require to be studied as class books in this (rhetoric) class. The hours that will thus be saved from the immediate objects of the class should be devoted to the study of mathematics and other works, of which I will make mention afterwords.

4. **Jyotisha or Mathematical Class.**—The students of the sahitya and Alankara classes attend this class and study Lilavati and Vijaganita. Lilavati is a treatise on arithmatic

and mensuration by Bhaskaracharya. Vijaganita is a treatise on Algebra by the same author. Both of these works are very meagre. They are in a great measure without any method, and do not contain all that is contained in similar English books. From a curious taste they have been rendered needlessly difficult. The rules and questions are all in verse. On account of this the students take so great a length of time as four years to study these two books. The examples are too few.*

Great changes are required in this branch of study. For the present complete treatises on Arithmetic, Algebra and Geometry should be compiled from the best English works on those subjects. After studying these, the students will be able to read Lilavati and Vijaganita with great facility. The higher branches of Mathematics should be attempted to be translated afterwards, and when ready should be adapted as class books. I would now propose that a popular treatise on Astronomy, such as Herchel's, be compiled in Bengali, and be read in the mathematical class. These works might

* The chair of mathematics was first created in June 1826, down to 1835, the students of the Sahitya and Alankara classes attended this class as at present. In 1835 it was made a separate class, i.e., instead of the Sahitya and Alankara class students attending this class, the students of Alankara were promoted to this class, and studied here for one year. In 1839 this arrangement was set aside, and the Smriti and Nyaya class students were required to attend certain set hours. This arragement was again put aside in April 1846, and the students of the Sahitya and Alankara classes were again made to attend this class and that arrangement continues to the present day. From the very establishment of the class Lilavati and Vijaganita were the Text books. Ksetratattwa dipika, a Sanscrit translation of geometry, as contained in Hutton's Mathematics, was read in the class once for all in 1839. This book is not better than Lilavati and Vijaganita.

have been studied in English ; but their appearance in Bengali will be of great use also in the Vernacular schools. Besides the Sahitya and Alankara students, the students of the Smriti and Nyaya classes should attend the lectures of the Professor of Mathematics.

Here the junior department of the Sanscrit College is considered to terminate.

I beg leave to propose that the study of Bengali books, treating on useful and entertaining subjects, be introduced in the classes of the junior department. The works should treat of such subjects as the following :—

For the Fourth Grammar class.—Pretty stories about animals.

For the Third Grammar Class.—Rudiments of knowledge, as in Chambers's Educational course.

For the Second Grammar Class.—Moral Class Book, as in Chambers.

For the First Grammar Class.—Miscellaneous subjects, such as Art of printing, Loadstone, Navigation, Earthquake, Pyramids, Chinese Wall, Honey Bee, etc.

For the Sahitya Class.—Biography, as in Chambers, and miscellaneous reading on useful and entertaining subjects, selected and translated from Telemachus, Rasselas, Mahabharata etc.

For the Alankara Class.—Essays on Moral, Political, and Literary Subjects, and a popular treatise on the Elements of Natural Philosophy.

Should the Council be pleased to introduce these Bengali books, the students of the Sanscrit College will, with little difficulty, acquire great proficiency in Bengali, and through the medium of that language, derive useful information, and

thereby have their views expanded before they commence their English studies.

Of the abovementioned Bengali works, the biography is already published ; rudiments of knowledge and moral class book are in the press, and almost all the other works are in the course of preparation. The adoption of these books will entail on the Council no expense whatsoever.

I beg also to state that the preparation and the publication of the rudiments of Sanscrit grammar in Bengali and that of the Sanscrit selections shall need no pecuniary assistance of the Council.

The preparation of the works for the Mathematical class, namely, Arithemetic, Algebra, Geometry and a popular treatise on Astronomy, suitable for the use of the Sanscrit College, will need the patronage of the Council of Education when the state of the education funds will admit of this being afforded.

5. **Smriti or Law Class.**—After the Alankara the students come to this class, and continue in it for three years. The works read are—

(1) Manusanhita
(2) Mitakshara, 2nd Section
(3) Vivada Chintamani
(4) Dayabhaga
(5) Dattaka Mimansa
(6) Dattaka Chandrika
(7) Ashtavinshati Tattwas.

The institute of Manu is the highest authority on the subject of Hindu Law. It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a manner an index of Hindu society in ancient times. Mitakshara, by Vijnaneswara, is a commentary on Yajnavalkya's Code. The second section treats of civil and criminal laws, the former including the law of inheritance. Mitakshara is acknowledged to be

the highest authority in the North-Western Provinces. Vivada Chintamani, by Vachaspati Mishra, is a compilation of civil and criminal laws. This work is the authority in the province of Bihar. Dayabhaga, by Jimutavahana, is a treatise on inheritance. This work is the authority in Bengal. Dattaka Mimansa and Dattaka Chandrika are treatises on the adoption of children and their civil rights. The Mimansa is the authority in the North-Western Provinces and the Chandrika in Bengal. The Ashtavinshati Tattwas are by Raghunandana. With the exception of the Daya and Vyavahara Tattwas, the former on the laws of inheritance, the latter on the court procedure, the other 26 Tattwas are treatises on the forms of religious ceremonies.*

With regard to this class I beg leave to observe that the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued. Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course. The other works should be allowed to keep their place. Their study makes one conversant with the Hindu law of every part of India.

6. Nyaya Class.—The Nyaya system of philosophy principally treats of Logic and Metaphysics, and occasionally touches upon subjects relating to Chemistry, Optics, Mechanics, etc. The same description applies more or less to the other systems, excepting Mimansa and Patanjala, which treat of religious ceremonies and abstract contemplation of the deity respectively. The years of study in this class are four, † the works studied are the following :—

---

* The 28 Tattwas were introduced by order of the Council of Education dated the 10th June 1846.

† From 1824 to 1835, students from the Alankara class were promoted at their option either to the Nyaya or Smriti class. For the remaining 5 or 6 years they studied in either of the classes, or such as liked, studying

(1) Bhashaparichchheda.
(2) Siddhanta Muktavali.
(3) Nyayasutras with Vritti or commentary
(4) Kusumanjali
(5) Arumana Chintamani and Didhiti.
(6) Shabdashaktiprakashika
(7) Paribhasa.
(8) Tattwa kaumudi.
(9) Khandana.
(10) Tattwa Viveka. ‡

Bhashaparichchheda, by Vishwanatha Panchanana is an elementary treatise on all the departments of Nyaya. Siddhanta Muktavali is a commentary on the Bhashaparichchheda by the author himself. Nyaya Sutras are by Goutama, the founder of this school of philosophy. Kusumanjali treats of the existance of the deity and that of a future state. The line of argumentation on the whole is similar to what is to be found in modern European works on the same subject. The author is Udayanacharya. Anumana Chintamani is a work of the modern school of Nyaya Philosophy on deduction, by Gangeshopadhyaya. His reasoning is similar, to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a "cobweb of learning". In the study of this work insurmountable difficulties are to be met with, Anumana Didhiti is its commentary, by Raghunath Shiromani. He is the dictator of the modern Nyaya School of Philosophy. Shabdashaktiprakashika, by

1 or 2 years in the Nyaya class, joined that of Smriti. In 1835, it was compulsory on every one to study 2 years in the Nyaya class and the remaining portion in Smriti.* This continued up to 1846, when, by order of the Council of Education, dated the 28th November, the period was extended to 4 years.

‡ The books marked 5, 6, 7, 8, 9, 10 were introduced by order of the Council of Education dated the 17th February 1847.

Jagadisha, is a treatise on the import of words. Paribhasha, by Dharmaraja, is a short treatise on the Vedantic doctrines. Tattwa Kaumudi, by Vachaspati Mishra, is a short but comprehensive treatise on the Sankhya system of philosophy. Khandana is by Shriharsha. The object of the auother in this work is to refute all the then existing systems of philosophy, and to establish his favourite, the Vedantic. This work is of high repute. The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call "muddy metaphysics." Tattwa Viveka, by Udayanacharya, aims, at refuting the Bouddha or atheistical doctrine and proving the necessity of a maker of the universe. The style of this work has the opposite faults of being abstruse and diffuse.

After the above observations, I beg leave to suggest that this class, instead of being called the Nyaya or Logic class, be called the Darshana or Philosophy class, and that the study of Anumana Chintamani and Didhiti, Khandana and Tattwa Viveka be discontinued, and in their place be studied the following works on the other systems of philosophy, excluding the Mimansa or rule of religious ceremonies :—

(1) Sankhyapravachana. (3) Panchadashi.
(2) Patanjala Sutra. (4) Sarvadarsanasangraha.

The period of study in the Sanscrit College is 15 years. One is expected to have a perfect knowledge of Sanscrit learning in so long a period. But no one may be consedered to have such knowledge who is not familiar with all the systems of philosophy prevalent in India. True it is that the most part of the Hindu systems of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is

absolutely required. Should the Council be pleased to adopt the suggestions that I will submit in the succeeding part of my report regarding the English department, by the time that the students come to the Darshana or Philosophy class, their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of comparing the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of the western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of the ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of Philosophy in India, is that the students will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other, and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

7. **English Department***.—The present mode in which this very useful department is conducted is very unsatisfactory. There is no rule as to what students are expected to study English, but it is entirely left to their own option. They commence the study when they please, leave it off at their own option, and commence again when it suits their purpose. Many students on being attached to the grammar classes, at their first admission, immediately commence

* The English department who established in May 1827. It was abolished by the orders of the General Comittee of Public Instruction in November 1835. It has been re-established in October 1842 by the orders of the Council of Education.

English, but from the difficulty of the first principles of both languages, the greater part being unable to carry on both at once, some after a short time neglect their English and others the Sanscrit. It is the case with many to retire from the English class just before the examinations. The very same students come again to be admitted at the beginning of the next session. There is another circumstance which causes great confusion, which is that one English class is constituted of students of various Sanscrit classes. Take, for instance, the components of the third and fourth classes. The third class consists of 13 boys, 4 of whom belong to the Smriti class, 1 the Nyaya, 1 to the Alankara, 3 to the third Grammar class and 4 to the fourth Grammar class. The fourth class consists of 33 boys, 2 of whom belong to the Alankara class, 5 to the Sahitya, 2 to the first Grammar class, 6 to the second, 10 to the third, 6 to the fourth and 2 to the fifth Grammar class. From the circumstance of students of various Sanscrit classes coming to attend the English class, it becomes altogether a difficult affair to secure regular attendance in the latter. Again, the study of English being optional, some portions only of each Sanscrit class are students in the English department. Such students, particularly those from the lower classes, cannot go on with their Sanscrit studies with that degree of attention which the non-English reading students can. But the studies of the class being the same with all, the progress in both the languages is greatly impeded.

The English department, if continued to be conducted in their irregular style, is not expected to be productive of any satisfactory results. After the creation of the English department in this institution a similar irregular mode of con-

ducting it rendered it useless, which caused its abolition by the late General Committee of Public Instruction. If better arrangements be not made, the present English department will also become useless.

Under the above considerations, I beg leave to suggest the following arrangement, which, I am persuaded, if steadily pursued, will be productive of beneficial results. The arrangent I would propose is as follows :—

The students should not be allowed to commence English till they have acquired some proficiency in the Sanscrit language : the pupils of the same Sanscrit class shall go on with the same English studies : the study of English instead of being optional be compulsory ; should there be anyone very unwilling to be taught in English, he be given to understand that he will not be allowed to commence English at any subsequent stage of his Sanscrit study, as to create for him alone a separate class is altogether out of the question.

Under the proposed system of Sanscrit study, the students of the Sahitya class, it is assumed, will be well acquented with the Sanscrit language. Therefore I beg leave to propose that the study of English be commenced in the Alankara class. In that case the students will be able to devote to the study of English nearly double the time they do now ; and their minds, having received culture, they will not have to begin with such trite subjects as young beginners are obliged to commence with. From the Alankara class to the last year of study in the college is some 7 or 8 years and a diligent student in the course of that period will have ample opportunity of making himself familiar with English language and literature.

8. **Fifth Grammar Class.**—Another very important circumstance I beg to bring to the notice of the Council. The fifth Grammar Professor, Pundit Kasinath Tarka-panchanana is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his, Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.

From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, rupees 40 a month, and the present librarian, Pundit Girish Chandra Vidyaratna, a very distinguished ex-student of the institution, be appointed to the chair of the fiith Grammar Professor with his present salary rupees 30 a month, to be raised to rupees 40 when a favourable opportunity offers.

9. **Promotions.**—With regard to the promotion of boys from one class to another, the present practice of the college is to keep them in each class for the allotted number of years, and send them at the expiration of the time to the higher class, without any consideration as to the degree of their acquirements.

Under this arrangement it so happens that a student, notwithstanding he may have finished his course in the class, is not allowed to join the higher one if he has not finished his allotted years, whilst another, let him be how deficient soever in the studies of the class is promoted to the higher class, simply if he has merely completed the prescribed time. Therefore I beg leave to propose that promotions take place on the principle of merit, not years :

only with this limitation that no one will be allowed to remain in the college beyond the period prescribed by the scholarship rules. I am persuaded that under this arrangement all students above mediocrity will finish their collegiate course of study in less than the time now prescribed.

10. Discipline.—The laxity of general discipline in the institution at present is notorious. It is highly desirable that strict and steady attention should be paid to ensure regularity of attendance to put a stop to students constantly leaving their classes on trivial pretences, and to prevent needless noise, talking and general confusion. There is no inherent cause whatever why the discipline in this college should not be equal to that which obtains in any English institution. The same methods require only to be enacted and enforced.

In conclusion, I beg leave to observe that the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious consideration of the subject. They are extensive, but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results, under an efficient and steady supervision, will be, that the college will become a seat of pure and profound Sanscrit learning, and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.

I have the honour to be
Sir,
Yours most obedient servant
Ishwer Chundra Shurma
Professor, Sahitya in the Sanscrit College.

SANSCRIT COLLEGE.
The 16th December 1850.

প্রসঙ্গ : পূর্বতন শিক্ষা-সংস্কার পরিকল্পনার পরিশিষ্ট হিসেবে অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগর কর্তৃক শিক্ষাসংসদে প্রেরিত প্রতিবেদন

'NOTES' ON THE SANSCRIT COLLEGE

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of these who are entrusted with the superitendence of Education in Bengal.

2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanscrit their afterstudy, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature they will prove the best and oblest contributors to an enlightened engali Literature.

5. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit College is necessary for the purpose ?

7. The students of the Sanscrit College be thoroughly instructed in Grammar and Literature—the latter including poems, dramas and prose works.

8. In Rhetoric, they should be instructed in two or three

capital works, such as kavya Prakasha· ·and two or three chapters of Sahitya Darpana.

9. The study of these, that is Grammar, Literature and Rhetoric will enable the student to acquire a complete mastery of the Sanscrit Language.

10. In Law they should study the following works : The Institutes of Manu, Metakshara Sec. II Vivada · ·· Dayabhaga, Duttakamimunsa and Duttakachundrika. The study of these is sufficient to make one conversant with the Hindu Laws current in almost every part of India.

11. In mathematics Lilavati and Vijaganita are the text books. Lilavati treats of arithmetic and mensuration and Vijaganita of Algebra. These two works are very meagre and from a curious perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value and object of such studies the auther has made them so difficult by putting the rules and questions all in verse that the students cannot go through them in less than three or four years. The examples are very few. The fact is, the study of Sanscrit-Mathematics is not only nearly useless in itself, but it interfares largely with other studies and engrosses a great deal of time and labor which might be employed in far more useful pursuits.

12. Hence the study of mathematics in Sanscrit should be discontinued.

13. It is not to be understood from this that I undervalue a knowledge of Mathematics as an essential element of a complete education. Far from it. I wish to substitute the pursuit of it in English, whence in less than half the time now given to it an intelligent student will acquire more than double the amount of sound information that he could obtain

by the most perfect acquaintance of all that exists in the Sanscrit language in the subject.

14. There are six prominent schools in Hindu Philosophy namely Nyaya Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, Vedanta and Mimansa. The Nyaya system of Philosophy principally treats of Logic and Metaphysies and occasionally touches upon subjects of Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems respecting Mimansa and Patanjala which treat, the former of religious ceremonies and the latter of abstract contemplation of the Deity.

15. As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of my report dated the 16th, December 1850.

16. 'True it is that the most part of the Hindu system of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required.···By the time that the students come to the Darshana or Philosophy class their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ampler opportunity of comparing the System of Philosophy of their own, with the new Philosophy of Western World. Youngmen thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attecked each other and have pointed out each others errors and falacies. Thus he will

be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.'

17. Another advantage is, that students so prepared, wishing to transfer the philosophy of the West into a native dress will possess a stock of technical word, already in some degree familiar to intelligent natives.

18. A profound knowledge of these is not required. It will suffice if the students go through these works. In Nyaya, Aphorisms of Gotama and Kussumanjali. In Vaisheshika, Aphorisms of Kanada ; in Sankhya, Aphorisms of Kapila and Tutta Koumndi in Patanjala, Aphorisms of Patanjala ; in Vedenta the Vedantasara and the I and II books of the Aphorisms of Vyasa ; in Mimansa, Aphorism of Jaimini. In addition to this the students should read the Sarbadarshana Sangraha being review of all the Systems of philosophy presented in India. The study of these works will make one familiar with Hindu Philosophy without much loss of time.

19. The students of the Sanscrit College while they are in Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies devoting two-thirds of the time to the Sanscrit and one-third to the English When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two-thirds of the time to this important branch of Education.

20. At present the following are the subjects for the Senior Scholarship examination in the Sanscrit College ; Literature, Rhetoric, Mathematics, Law and Philosophy, Sanscrit Prose, Essays. These should be modified, Literature and Rhetoric should form our subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays should be dispensed with and

in their stead three branches in English namely, History, Mathematics and Natural Philosophy should form each a subject of Senior Scholarship Examination in the Sanscrit College. Moral and Mental Philosophy, Logic and Political Economy should form also subjects of the same examination being in turn selected every succeeding year.

21. The English Department consisting of two teachers is quite inadequate to fulfil the object in contemplation. Moreover, the present teachers are not sufficiently familiar with Mathematics and Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the class of teachers which the necessities of the Sanscrit College absolutely requirs. They would do well if transferred to other Institutions where they will not be required to teach more than the elementary portions of an educational course.

22. This department should therefore be remodelled and made to consist of four efficient teachers with salaries of Rupees 100, 90.60 and 50 respectively. With these remunerations the services of good teachers may be secured. This arrangement requires 300 Rupees per mensem for the English Department.

23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematics class and the transfer of the two present teachers there will be a saving of 250 Rupees per month, the remaining 50 Rupees should be supplied from the funds appropriated to the Institution which are Rupees 24,000 per annum and out of which only 19,000 and some odd hundreds are at present expended.

24. But if the state of the Education funds would not at present in anyway admit of this additional expense, the demand may be supplied in other ways. There are at present

two writers who copy manuscripts, one in Bengali and one in Nagree, each receiving 16 Rupees per mensem. The manuscripts which they copy are quite useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time they are copied the mistakes and omissions get at least doubled. Thus manuscripts copied by mere copyists become almost unitelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit College can copy in one month little more than 5 or 6 Rupees work while they draw 32 Rupees for mensem. Their sources therefore should be dispensed with and the 32 Rupees will be saved. There is a junior Scholarship of 8 Rupees per month alloted to the English Department. If History and other branches alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, there will be no use of allotting a separate scholarship for the English Department and the 8 Rs. thus saved together with the 32 Rs. saved by dispensing with the services of the two writers raises the amount to Rs. 40 per month. So only 10 Rs. will be required to be paid from the appropriated funds.

25. When I joined the Institution at the end of 1850 the views which I entertained respecting the course of studies to be adopted in the Sanscrit College I submitted to the Council of Education in report on the Institution. Since that time experience has made me modify my views on some few points. This will explain why these notes disagree in a few particulars with my report.

26. It appears to me that unless the Sanscrit College remodelled according to the principles now stated, there exists no prospect of material improvement or of fully carrying out the objects of the Institution.

Eshwar Chunder Sarma
12th. April, 1852.

পরিশিষ্ট ঃ ২

উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ :

২৬ সেপ্টেম্বর—হুগলী জেলার (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলায় বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১২ই আশ্বিন ১২২৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। অসমাপ্ত আত্মচরিতে নিজের জন্মকাল সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর লিখেছেন,

'শকাব্দা : ১৭৪২, ১১ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর প্রথম সন্তান।'

১৮২৪ :

২৫ জানুয়ারী—মধুসূদনের জন্ম

১৮২৫ :

বালক ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামস্থ পাঠশালায় প্রেরিত হন। এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নিজের সাক্ষ্য,

'আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম…। আট বৎসর বয়স পর্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলাম।'

১৮২৮ :

রামমোহন কর্তৃক 'আত্মীয় সভা' স্থাপন

নভেম্বর—বিদ্যাসাগরের প্রথম কলকাতা আগমন।

১৮২৯ :

১ জুন—বিদ্যাসাগরের কলকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ

৪ ডিসেম্বর—সতীদাহ নিবারক আইন প্রবর্তন

১৮৩০ :

২৪ জানুয়ারী—প্রাচীন পন্থীদের 'ধর্মসভা' স্থাপন

—রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা।

১৮৩৩ :

সেপ্টেম্বর—ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে রামমোহনের মৃত্যু

১৮৩৫ :

৭ মার্চ—ইংরেজি শিক্ষার অনুকূলে বড়োলাটের প্রস্তাব প্রকাশ

—ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিবাহ

১৮৩৬ :

১৭ ফেব্রুয়ারী—রামকৃষ্ণদেবের জন্ম

১৮৩৮ :

২৬ জুন—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম

১৮৩৯ :

২২ এপ্রিল—কমিটির পরীক্ষা দান ; ১৬ই মে প্রশংসাপত্রে তাঁর নামের শেষে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ব্যবহার লক্ষণীয়.

HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law officer in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. PRINSEP — President
J. W. J. OUSELY — Members of the Committee of Examination

This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee.

১৮৪১ :

৪ ডিসেম্বর—বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপন। কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রশংসাপত্র প্রদান,

Government Sanscrit College
Calcutta

We hereby certify that Ishwarchandar Bidiyasagur has

attended at the Government Sanscrit College for 12 years 5 months and studied the following branches of Hindoo Literature.

Grammar, Belles lettres, Rhetoric, Arithmatic, Logic, Theology and Law—that he has attained very Good proficiency on the subject of these Studies and that he conducted himse!f well.

Fort William
the 4th December 1841
Rossomoy Dutt Secty.

Signatures of Members, General Committee of Public Instruction

কলেজের প্রশংসাপত্রের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকগণেরও মিলিতভাবে বিদ্যাসাগরকে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র প্রদান,

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান

ব্যাকরণম্	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্	শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্	শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃ শাস্ত্রম্	শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীতলয়োপস্থিতৈস্তৈতৈস্তেতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা বুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutt, Secretary.
10 Decr. 1841.

২৯ ডিসেম্বর—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার ৯ই নভেম্বর পরলোক গমন করলে কলেজের সেক্রেটারী মেজর মার্শাল ওই পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়ে বাংলা সরকারকে লিখলেন,

I beg to recommend for the situation of Bengali Sherishtadar Iswarchandra Vidyasagar whose acquirements are similar to those of the late Sherishtadar as appears by the undermentioned certificates which he holds, viz. :

1st. A certificate from the Government Sanscrit College of very good proficieney in every branch of literature taught at that institution.

Dated 4th December, 1841

2nd. One from the Hindu Law Committee of eminent knowledge of Hindu Law and qualification to hold the situation of Law Pandit in any of the Court of Indicature, and

3rd. One from the Examiners of the College of Fort William of qualification to instruct the students in Sanscrit and Bengali.

Iswarchandra possesses also a moderate knowledge of English of which he acquired the rudiments in the English Class of the Sanscrit College but he was unable conveniently to improve his knowledge after the abolition of that class. He bears a high character for respectability of conduct and for industrions habits.

১৮৪৩ :

২৮ নভেম্বর—আত্মীয়ের অসুস্থতা হেতু কাজে যেতে পারবেন না ব'লে মার্শাল সাহেবের কাছে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় দরখাস্ত করেন,

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

সবিনয় নিবেদনং—

অদ্য আমার পিতৃব্যপুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারি বার ভেদ হইয়াছে। ২০ ড্রপ্ লডেনম দেওয়াতে আপাততঃ প্রায় এক ঘণ্টা ভেদ বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয় না অতএব তাঁহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না ক্রটিমার্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২৮শে নবেম্বর ১৮৩৩।

আজ্ঞাবর্তিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।

১৮৪৬ :

২৮ মার্চ—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের ২৬শে মার্চ মৃত্যু হ'লে বিদ্যাসাগর সেই পদের জন্যে ২৮শে মার্চ আবেদন পত্র পাঠালেন ইংরেজিতে। সে আবেদনপত্রের মূল বক্তব্য হোল,

Besides I have the honour to hold the office of Sheristadar of the Bengalee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the System of Sankhya Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of education afforded by your College. . .

This, together with my long connection with the College as a student has given me an intimate knowledge of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in any case my services are accepted I shall prove useful to the institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration,

and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

এই আবেদনপত্রের সঙ্গে মার্শাল সাহেবের একটি প্রশংসাপত্রও ছিল,

Certified that Iswar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengalee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since by private study acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of Fort William — G.T. Marshall
28th March, 1846 — Secretary, College

৬ই এপ্রিল—বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর—সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার কামনায় বিদ্যাসাগর এক দীর্ঘ পরিকল্পনা রচনা ক'রে সম্পাদকের কাছে অর্পণ করেন।

১৮৪৭ :

এপ্রিল—শিক্ষাপরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতবিরোধে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন।

১০ এপ্রিল—বিত্থাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করার জন্যে সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর যুক্ত আবেদন,

Respectfully Sheweth,

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning that Essur Chandra Biddasagore, Assistant Secretary to the Sanscrit College, has for reasons unknown to them resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the College is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interest.

The Assistant Secretary by his personal abilities, and industrions habits, and zeal in the welfare of the College, has as is already known to you, introduced several beneficial changes and proposed such salutary innovations in the system of Education hitherto pursued there, as your memorialists expect, will soon place that Institution on a very solid efficient footing. Your memorialists are of opinion that the appointment of the said Bidya Sagore does great credit to your judgement, who determined on the last occasion of filling up the vacant ···of your assistant upon nominating one, intimately acquainted with the Sanscrit and tolerably versed in the English language as they believe that the Assistant Secretary has been in a great measure enabled by the above qualifications to plan the revised system already noticed. Under these circumstances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered his resignation and they sincerely trust as his loss cannot easily be supplied that you will be pleased to adopt such measure as will induce Essur Chunder to continue his services at the College which will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our Institution.

In conclusion your memorialists beg to state for your information that the resignation referred to, being tendered to the Secretary to the Council of Education your memorialists have with a view to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in the hope that he may not take hasty steps to accept the resignation of an office, who might otherwise be induced to continue his services to the college if not for his own, atleast for the interest of the institution which he was appointed to look over.

And your memorealists as in duty bound shall ever pray :

Sanscrit College
10th April 1847.

শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য
„ জয়নারায়ণ শর্ম্মনঃ
„ ভারতচন্দ্র „
„ দ্বারকানাথ „
„ রামগোবিন্দ „
„ প্রাণকৃষ্ণ „
„ তারানাথ „
„ মদনমোহন „
„ প্রেমচন্দ্র „
„ গিরীশচন্দ্র „
„ যোগধ্যান্ „
Russick Lull Sen
Shama Churun Sircar

—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা

এপ্রিল—প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পাদক মার্শাল সাহেবের আদেশে হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত।

৩ মে—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ ক'রে সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে দীর্ঘ লিপি প্রেরণ। 'পরিশিষ্ট ১'-এ উল্লিখিত।

১৬ জুলাই— তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কার্যভার বুঝিয়ে দিয়ে সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় গ্রহণ।

১৮৪৮ :

—'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ।

১৮৪৯ :

১ মার্চ—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়ে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রত্যাবর্তন। মাসিক বেতন ৮০ টাকা।

৭ মে—ভারতহিতৈষী স্যার জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীঠন কর্তৃক 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপন। অন্যতম প্রধান সহযোগী বিদ্যাসাগর।

—'জীবনচরিত' প্রকাশ

১৮৫০ :

আগষ্ট—'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধ প্রকাশ।

৪ ডিসেম্বর—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মত্যাগ।

৫ ডিসেম্বর—সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান।

১৬ ডিসেম্বর—সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের জন্যে শিক্ষা সংসদে এক বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান। 'পরিশিষ্ট ১'-এ পরিকল্পাটি উদ্ধৃত হয়েছে। কয়েকদিন পরেই সম্পাদক রসময় দত্তের পদত্যাগ।

ডিসেম্বর—বীঠনের বালিকাবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ।

১৮৫১ :

৪ জানুয়ারী—পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ক'রে বিদ্যাসাগরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার জন্যে শিক্ষা সংসদের সম্পাদক কর্তৃক রসময় দত্তকে নির্দেশ দান,

'I am directed by the Council of Education to accept your resignation of the office of Secretary of the Sanscrit College and to return for the thanks for the long period during which you have conducted its duties. As the council are anxious to relieve you at once from the duties of your late office, they will feel obliged by your making over charge upon receipt of this communication to Pundit Ishwur

Chaunder Shurma pending the sanction of Govt. to the permanent changes proposed and adopted by the council.'

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরকেও জানিয়ে দেওয়া হোল,

'Copy forworded to Pundit Ishwur Chunder Shurma with directions to receive charge from Babu Rassomoy Dutt of the office of Secretary to the Sanscrit College and to conduct its duties, pending the receipt of further orders.'

সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে ১৫০ টাকা বেতনের অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করার মত কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে যোগ্য ব'লে মনে না হওয়ায় কাউন্সিল অফ এডুকেশন বাধ্য হ'য়েই বিদ্যাসাগরের নাম প্রস্তাব ক'রে বাংলা সরকারের অনুমোদন চাইলেন,

'Had there been an European officer available, as well acquainted with Sanscrit, as Dr. Sprenger is with Arabic, the Council would have preferred his appointment as Head of the Sanscrit College, but as this is out of the question the Council are compelled to adopt such means as are available.···

'For the office of Principal by far the fittest person known to the Council, or to those well acquainted with the subject whom they have consulted, is Pandit Ishwar Chandra Sharma who has been recently appointed to the Professorship of Sahitya. He is not only a first rate Sanscrit Scholar, but is well acquainted with English, and is considered the most elegant Bengali scholar in the Presidency'

২২ জানুয়ারী—কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সুপারিশ স্বীকার ক'রে বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিয়োগ পত্র প্রেরণ করেন,

'I am directed by the Deputy Governor of Bengal to inform you that His Honour has been pleased this day to

appoint you to be Principal of the Sanscrit College on a salary of Rs. 150 per mensem.'

এপ্রিল—বোধোদয় (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ) প্রকাশ। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য প্রকাশ ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

'বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে।...অল্পবয়স্ক সুকুমার মতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি।'

৯ জুলাই—ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সন্তানদেরও সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান। তার আগে ২৮শে মার্চ তারিখে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে আপন মতামত প্রেরণ করেন,

To,

Captain F. F. C. Hayes, M. A. Offg. Secretary, Council of Education.

Dated Fort William 28th March 1851.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of Secretary Dr. Mouat's letter No. 79 dated the 7th January last, requesting me to report on the subject of any other casts than Brahmanas and Vaidyas, being admitted to the Sanscrit College and to ascertain and submit to the Council the opinion of the Principal Professors of the Institution on the question.

2. In reply I beg leave to state that I see no objection to the admission of other castes than Brahmanas and Vaidyas or in other words, different orders of Sudras, to the Sanscrit College. But as a measure of expediency, I would suggest that at present Kayasthas only be admitted—they form a very respectable portion of the Hindu Community of Bengal. The prohibitions in the Shastras with regard to the Sudras do not apply in their full extent to the Kayasthas. The most

orthodox Brahmins do not hesitate to give them instructions and even those Brahmanas who perform the part of spiritual guides to Kayasthas are not held in disrepute, but rather are highly esteemed inspite of the Dictum of Manu, "Let him not give temporal advice to a Sudra; nor what remains from his table ; nor clarified butter of which part has been offered to Gods, not let him give spiritual counsil to such a man, nor inform him of the legal expiation for his sin."

3. In the days of Manu, the only duty prescribed for a Shudra was to serve the three superior orders, namely Brahmanas, Kayasthas and Vaishyas—but practice has now so far superseded precept that the Kayasthas, through considered to be of the Shudra class—not only perform almost all the duties of the higther classes, but are virtually the heads of the Religious Societies in Calcutta and its Suburbs.

4. There is no direct prohibition in the Shastras against the Shudras studying Sanscrit literature. The only portions of it, from the perusal of which they are excluded are the sacred writings. But there are not wanting authorities which allow this privilege. From certain texts of the Bhagabata Purana clear inferences may be drawn to show that they are privileged to read the above works i.e., acknowledged to be a divine Revelation and to be the essence of all the Upanisads, the most sacred portion of the Vedas.

ইদং ভগবতাপূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপংকজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥

B. XII, Ch. XIII, V. IX.

This (the Bhagavata) was first revealed by Vishnu to Brahma, situated in the Lotus (growing out) of his Naval and afraid of (being from into) the world.

সর্ববেদান্ত সারংহি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।

B. XII, Ch. XIII, V, XIII.

The Bhagabata, is admitted to be the essence of all the Vedantas (Upanishads)

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুযাৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যোনিধিপতিত্বং চ শূদ্রঃ শুদ্ধেত পাতকাৎ॥

By studying it (The Bhagavata), a Brahmana obtains wisdom, a Kshatriya territory, a Vaisya Wealth, a Shudra purification from sin.

5. Very lately a curious occurrence took place in this part of Bengal which to a certain extent, favors the admission of the Kayasthas to this Institution. An opulent Kayastha, the late Raja Rajnarayan Bahadur of Andool attempting to prove that the Kayasthas are Kshatriyas and therefore not subject to the restrictions enjoyed against the Shudras, insisted orthodox Pundits to give this opinion on the subject and a host of them have subscribed in the affirmative.

6. By the existing rules of the Sanscrit College Vaidyas are admitted to it, though Raghunandana, whose works are the sole authority for the prevalent religious observances in Bengal, classes them with the Shudras. I can therefore conceive no reason, why Kayasthas, who occupy the highest place among the Shudras should be excluded from sharing the boon with their brother—Shudras, the Vaidyas.

ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহমনুঃ শনকৈ
স্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বংগতা
লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপা
বৈশ্যানামপি তথা।' এবম শঠাদীনামপি॥

Shuddi Tattwa Page 150
Serampore Edn.

Manu has pronounced that the Kayasthas of the present age are become Shudras as "By degrees from the extinction of ceremonies and omission of the study of the Vedas, the Kshatriyas are become Shudras." So from the extinction of the ceremonies, the position of the Vaishyas, is the same, and also of the ambasthas, (or Vaidyas) and the like.

7. It would not be irrelevant to state here that in the years 1828 and 1829 during the time of Dr. Wilson, some students of the Hindu College were allowed to study Sanscrit in this Institution, among whom was a Kayastha named Baboo Amritalall Mitter, a near connection of Radhakanta Bahadur, who received instructions from our Pundits in Grammar and Literature, passed examinations in this branches and obtained prizes.

8. The reason why I recommend the exclusion of other orders of Shudra at present, is that they, as a body, are wanting respectablity and stand lower in the scale of social considerations, their admission, therefore, would I fear, prejudice the interests of the Institution.

9. In conclusion, I beg leave to submit the opinion of the Principal Professors of the College on the subject in original with its English translation from which it will be seen that they are averse to this innovation.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant,

ESHWAR CHANDRA SARMA

১২ আগষ্ট—বীঠন সাহেবের মৃত্যু

নভেম্বর—'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' প্রকাশ

'এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথম শিক্ষাপোযোগি মূল মূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশ সাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই।'

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

—'ঋজুপাঠ, প্রথম ভাগ' প্রকাশ

বাংলা ভূমিকাসহ নাগরী হরফে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান এবং মহাভারতের কিছু গল্প এই ভাগে সঙ্কলিত হয়েছিল। ভূমিকাতে বিদ্যা-সাগর নিপুণভাবে পঞ্চতন্ত্রের গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ ক'রে লিখেছিলেন,

'পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া ইহার রচনা অত্যন্ত সহজ। সংস্কৃত ভাষাতে এরূপ সহজ গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত, যাহারা প্রথম সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করে পঞ্চতন্ত্র তাহাদিগের অতি উপযুক্ত পুস্তক। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে; অনেক অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে, এবং কয়েকটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য নাই; কথা যোজনার চাতুর্য নাই।'

ডিসেম্বর—বীঠন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা

„ —'ঋজুপাঠ, তৃতীয় ভাগ' প্রকাশ

১৮৫২ :

মার্চ—'ঋজুপাঠ' দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ

'ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল।…বাল্মীকি-কাব্যে পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট পদ্য গ্রন্থ আর নাই।'

বিজ্ঞাপন, প্রথম সংস্করণ

১২ই এপ্রিল—'Notes on Sanscrit Collage' নামে বিখ্যাত প্রতিবেদন সরকারের কাছে প্রেরণ। পরিশিষ্ট ১-এ উল্লিখিত।

৩০ জুন—হ্যালিডে সাহেব নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ 'Note'টি সরকারকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন,

'The accompanying paper has been drawn up by the Sanscrit College at my request.

It is the result of several constitutions I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration.'

২৮ আগষ্ট—প্রতিষ্ঠাবধি সংস্কৃত কলেজ ছিল অবৈতনিক। তার ফলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা কলেজের কাজকর্ম ব্যাহত করতো। ছাত্ররাও নিয়মিত হাজিরা দিত না। এই বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ছাত্রদের দু'টাকা ক'রে প্রবেশ দক্ষিণা ধার্য করা হয়।

১৮৫৩ :

মার্চ—'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশ

বীঠন সোসাইটির অধিবেশনে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পঠিত হয়। পরে অনেকের অনুরোধে সভাপতি ডঃ ময়েটের অনুমতি নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে বিদ্যাসাগর দু'শো খণ্ড বিতরণ করেন।

—'ব্যাকরণ কৌমুদী, প্রথম ভাগ' প্রকাশ

—'ব্যাকরণ কৌমুদী, দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ

—বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন

জুলাই-আগষ্ট—শিক্ষা সংসদের আমন্ত্রণে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালাণ্টাইনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন ক'রে সুদীর্ঘ মতামত দান

৭ সেপ্টেম্বর--ডঃ ব্যালাণ্টাইনের মতামতের বিরুদ্ধতা ক'রে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র কাছে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ পত্র প্রেরণ

২২ সেপ্টেম্বর—ডঃ ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি কাউন্সিলের আদেশ প্রদান

৫ অক্টোবর—ডঃ ব্যালাণ্টাইনের চিন্তাধারার অসঙ্গতি প্রদর্শন ক'রে কাউন্সিলের কাছে বিদ্যাসাগরের পুনরায় দীর্ঘ পত্র প্রেরণ

১৮৫৪ :

জানুয়ারী—'বোর্ড অফ এগজামিনার্সে'র সদস্য মনোনয়ন

৭ ফেব্রুয়ারী—বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা প্রদান

২৪ মার্চ—বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা সমেত হ্যালিডের মিনিট প্রেরণ

১৯ জুলাই—চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক চার্টারে স্বাক্ষর দান

১৬ নভেম্বর—প্রথম লে: গভর্ণর হিসাবে হ্যালিডে কর্তৃক বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে বড়োলাটের কাছে অনুরোধ প্রেরণ

ডিসেম্বর—'শকুন্তলা' প্রকাশ

১৮৫৫ :

জানুয়ারী—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের প্রথম পুস্তক প্রকাশ

২৩ মার্চ—বাংলা শিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা গ্রহণের সুপারিশ ক'রে লেঃ গভর্নর হ্যালিডের পত্র প্রদান

১১ এপ্রিল—অস্থায়ীভাবে কোন পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগের বিরোধিতা ক'রে হ্যালিডের চিঠি প্রেরণ

২০ এপ্রিল—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়াও মাসিক দু'শো টাকা বেতন ও পথ খরচসহ বিদ্যাসাগরকে বাংলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিয়োগের জন্যে সরকারী সুপারিশ

এপ্রিল—'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ' প্রকাশ

১ মে—দক্ষিণ বাংলার জেলাসমূহের সহকারী পরিদর্শক পদে নিয়োগ

জুন—'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ

১৭ জুলাই—নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন ও প্রধান শিক্ষক রূপে অক্ষয়কুমার দত্তের নিয়োগ

আগষ্ট—সেপ্টেম্বর—নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন

আগষ্ট—অক্টোবর—বর্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন

আগষ্ট—সেপ্টেম্বর, নভেম্বর—হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন

৪ অক্টোবর—বিধবা-বিবাহ বিধি প্রণয়ণের জন্যে সরকারের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ

অক্টোবর—'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে'র দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশ

অক্টোবর—ডিসেম্বর—বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে সরকারের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ

১৮৫৬ :

১৪ জানুয়ারী—মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন

ফেব্রুয়ারী—'কথামালা' প্রকাশ

'Aesop's Fables'-এর নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের অনুবাদ এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে।

১ জুলাই—'চরিতাবলী' প্রকাশ

১৬ জুলাই—বিধবা-বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হয়

আগষ্ট—বীঠন স্কুলের সম্পাদক মনোনীত

৭ ডিসেম্বর—প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান। বর—প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; কন্যা—পলাশডাঙা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবাকন্যা কালীমতী।

১৮৫৭ :

২৪ জানুয়ারী—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

—সিপাহী বিদ্রোহ

৩০মে—বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

নভেম্বর-ডিসেম্বর—হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

১৮৫৮ :

জানুয়ারী—মে—বীরসিংহে একটিসহ হুগলী জেলায় মোট তেরোটি, বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

—'তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক

৩ নভেম্বর—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ

—টেকচাদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ

১৫ নভেম্বর – 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ

১৮৫৯ :

১ এপ্রিল—মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে ইংরেজি-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা

১৬ এপ্রিল—রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটীর বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনয়ের মহলা

২৩ এপ্রিল—মেট্রোপলিটান থিয়েটারে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের প্রথম অভিনয়।
মে—তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ায় সম্পাদকের পদ ত্যাগ

১৮৬০ :

জানুয়ারী—মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) প্রকাশ
—দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ
—মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশ
এপ্রিল—'সীতার বনবাস' প্রকাশ

১৮৬১ :

জানুয়ারী—মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ
এপ্রিল—কলকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারী
৮ মে—রবীন্দ্রনাথের জন্ম
জুন—'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ
ডিসেম্বর—'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র পরিচালন ভার গ্রহণ ও মাইকেল মধুসূদনকে সম্পাদনভার অর্পণ

১৮৬২ :

—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' প্রকাশ

১৮৬৩ :

১২ জানুয়ারী—স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জুলাই—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
নভেম্বর—'আখ্যানমঞ্জরী' প্রকাশ এবং ওয়ার্ড্‌স্ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শক মনোনীত

১৮৬৪ :

—'শব্দমঞ্জরী' (বাংলা অভিধান) প্রকাশ
নভেম্বর—'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্তে 'মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন' নামকরণ

১৮৬৫ :

—বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ

১৮৬৬ :

১ ফেব্রুয়ারী—বহুবিবাহ নিবারক আইন প্রণয়নের জন্যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দ্বিতীয়বার আবেদন পত্র প্রেরণ

১১ নভেম্বর—'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন

১৬ ডিসেম্বর—উত্তরপাড়ায় ঘোড়ার গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনায় পতন

১৮৬৭ :

এপ্রিল—বেলগাছিয়া ভিলাতে হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন

—শেষভাগে বাংলাদেশে অনাবৃষ্টিজনিত মন্বন্তর

১৮৬৮ :

'আখ্যানমঞ্জরী' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ

১৮৬৯ :

সেক্সপীয়ারের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রকাশ

১৮৭০ :

জানুয়ারী—ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্সে'র প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যাসাগর কর্তৃক এক হাজার টাকা সাহায্য প্রদান

১১ আগষ্ট—বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র বাইশ বৎসর বয়স্ক নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চৌদ্দ বৎসরের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ

১৮৭১ :

১২ এপ্রিল—কাশীতে জননী ভগবতী দেবীর মৃত্যু

১০ আগষ্ট—'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রকাশ

১৮৭২ :

এপ্রিল—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ

জুন—'হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফাণ্ডে'র অন্যতম ট্রাষ্টি নিযুক্ত

নভেম্বর—'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা

—তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ

১৮৭৪ :

—শিবনাথ শাস্ত্রীর 'সমদর্শী' পত্রিকা প্রকাশ

১৮৭৫ :

৩১ মে—বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পত্তির উইলকরণ

১৮৭৬ :

২১ ফেব্রুয়ারী—'হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্যুয়িটি ফাণ্ডে'র ট্রাষ্টিপদ ত্যাগ
১২ এপ্রিল—পিতা ঠাকুরদাসের কাশীতে মৃত্যু
—কলকাতা বাদুড়বাগানে গৃহ প্রবেশ
—শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিদ্যাসাগর গৃহে আগমন ও উভয়ের সাক্ষাৎকার
১৫ সেপ্টেম্বর—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম

১৮৭৭ :

এপ্রিল—ধনী সন্তানদের জন্যে গোপাললাল ঠাকুরের বাড়িতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ৫০ টাকা ছাত্র বেতন নির্ধারণ

১৮৭৮ :

১৫ মে—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা
—তরুণ ব্রাহ্মণদের 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্র প্রকাশ

১৮৮০ :

১ জানুয়ারী --সি. আই. ই. উপাধি লাভ

১৮৮১ :

ডিসেম্বর—'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ

১৮৮২ :

বড়োলাট লর্ড রিপন কর্তৃক 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে'র (Local Self Government) প্রস্তাব পেশ। শহরে 'কর্পোরেশন' ও মফঃস্বলে 'জেলা-বোর্ড' স্থাপন

১৮৮৩ :

—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত
ডিসেম্বর—এ্যালবার্ট হলে 'ন্যাশন্যাল কনফারেন্সে'র প্রথম অধিবেশন

১৮৮৫ :

—'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ

—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

—মেট্রোপলিটান স্কুলের বহুবাজার শাখা প্রতিষ্ঠা

১৮৮৭ :

জানুয়ারী—শঙ্কর ঘোষ লেনের নতুন বাড়িতে মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ

১৮৮৮ :

১৩ আগষ্ট—পত্নী দিনময়ী দেবীর মৃত্যু

—'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' প্রকাশ

১৮৮৯ :

—'সংস্কৃত রচনা' নামে বাল্যে রচিত সংস্কৃত রচনা সংগ্রহ প্রকাশ

১৮৯০ :

১৪ এপ্রিল—বীরসিংহে 'ভগবতী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা

—'শ্লোকমঞ্জরী', নামে উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ প্রকাশ

১৮৯১ :

২৯ জুলাই—বাংলা ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি প্রায় আড়াইটায় কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ

নির্দেশিকা

ভ

ম